আমার প্রয়াত অগ্রজ জ্ঞানতপস্বী

অধ্যাপক বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের

স্মৃতির উদ্দেশে

ও

আমার অগ্রজপ্রতিম সহকর্মী ও জীবনরসিক

দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক

শ্রীকেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের করকমলে

অনুবাদকের কথা

আঁরি বেয়র্গসোঁ (১৮৫৯-১৯৪১) বিংশ শতকের ফরাসি দার্শনিকদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিমান্। তাঁর পরবর্তী ফরাসি চিন্তাবিদ্ জঁ্য পোল সার্ত্ (১৯০৫-১৯৮০)-এর কীর্তিকে হেয় না করেও একথা বলা যায়। বেয়র্গসোঁর দার্শনিক মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অন্যান্য চিন্তাবিদ্‌দের মধ্যে মার্কিন মনীষী উইলিয়ম জেম্‌স্ (১৮৪২-১৯১০) এবং ইংরাজ গণিতবিদ্ ও দার্শনিক আলফ্রেড নর্থ হোয়াইটহেড (১৮৬১-১৯৪৭) উল্লেখযোগ্য।

বেয়র্গসোঁর দার্শনিক চিন্তা মূলত রক্ষণশীল ও ভাববাদী। তৎসত্ত্বেও জর্জ বার্নার্ড শ'এর মত যুক্তিবাদী ও বাস্তবতাবাদী চিন্তাবিদ্‌ও যে তাঁর চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তা তাঁর ব্যাক টু মেথুসেলাহ্ *(Back to Methuselah)* নাটক থেকেই বোঝা যায়। রুসোর নিছক যুক্তিবিরোধী ও অনুভূতি-প্রবৃত্তিভিত্তিক মনন তাঁর উত্তরকালের ফরাসি দার্শনিকদের মধ্যে বিস্তারলাভ করেছে এবং বেয়র্গসোঁর মতবাদকে তারই পরিণত রূপ বলে ধরা হয়েছে।

অনেকে বেয়র্গসোঁকে ব্যবহারিক দর্শন (Practical Philosophy)-এর সফল প্রবক্তা হিসেবে অভিনন্দিত করেছেন। বলা চলে যে তাঁর দার্শনিক অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র জ্ঞানান্বেষণ বা নানা বিচিত্র মানুষী বৃত্তির বিশ্লেষণধর্মী অনুশীলন নয়; তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষের অন্যান্য হিতকর ক্রিয়াকাণ্ডের মত তার দর্শনচিন্তার শেষ উদ্দেশ্য হবে মানবজাতির কল্যাণ ও আনন্দবর্দ্ধন। প্লেটো-প্রমুখ গ্রীক দার্শনিকরা দর্শনকে যে মূলত তাত্ত্বিক জ্ঞানার্জনের উপায় হিসেবে দেখেছিলেন, বেয়র্গসোঁর দর্শনচিন্তা তার একেবারে বিপরীত।

বের্গসোঁর দার্শনিক মত দ্বৈতবাদী (dualistic)। তাঁর বিশ্বাস, এই বিশ্বচরাচর দুটি পরস্পরবিরোধী শক্তির পারম্পর্য ও বিরোধ-মৈত্রী সম্বন্ধের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি একদিকে দেখেছেন মানুষের আত্মার জীবনীশক্তি, অন্যদিকে লক্ষ করেছেন তার শারীরিক জাড্য, যাকে বুদ্ধি ও যুক্তিবোধ নিষ্প্রাণ পদার্থ হিসেবে দেখে। সারা প্রাকৃত জগতে এই দুই জিনিসের মধ্যে তিনি অবিরাম দ্বন্দ্ব-বিগ্রহ ক্রিয়াশীল দেখেছেন। জীবন উর্ধ্বমুখী, পদার্থ নিম্নগামী। জীবন এক প্রাণপ্রাচুর্যময় সম্মুখগামী শক্তি (élan vital) যা সৃষ্টির আদি থেকেই স্পন্দিত থেকে জড়ের জাড্যকে ধ্বংস করতে সচেষ্ট। জড়পদার্থসম্ভূত যাবতীয় অন্তরায়কে অতিক্রম ও অপসারণ করে এই জীবনশক্তি নিরন্তর আত্মপ্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী। কিন্তু এই সুস্থ জীবনশক্তির পরাক্রম জড়ের জাড্যের দ্বারা অন্তত আংশিকভাবে প্রভাবিত না হয়ে পারে না। কিন্তু আংশিক পরাজয়ের মধ্যেও জীবন নতুনভাবে তার মুক্তির পথ করে নিতে তৎপর, জড়দেহের মধ্যে বন্দী থেকেও স্বাধীন ভাবে নিজেকে প্রকাশিত করার অনলস চেষ্টা এই জীবনীশক্তির বৈশিষ্ট্য।

• • •

কৌতুকহাস্য সম্বন্ধে বের্গসোঁর বিখ্যাত বই *Le Rire* (হাস্যরস) তাঁর দর্শনচিন্তার এই দিকটি নিয়েই রচিত। বিষয়টি ফরাসি পত্র *Revue de Paris*-তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হ'বার পর ১৯০০ সালে তিনটি দীর্ঘ প্রবন্ধের সঙ্কলিত রূপ নিয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। দার্শনিক অন্বীষা ও গভীরমননঋদ্ধ এই প্রবন্ধগুলিতে কৌতুকহাস্যের বিভিন্ন শ্রেণী নির্ধারণ, তাদের উৎস হিসাবে ক্রিয়াশীল নানা তথ্যের অন্বেষণ এবং সেই অন্বেষণের ফলে প্রাপ্ত তত্ত্বকে বিশেষ সূত্রের সাহায্যে গ্রন্থন এই বইটির বৈশিষ্ট্য। এই পদ্ধতি অনুসরণ করে বের্গসোঁ যে-সব সূত্র খুঁজে পেয়েছেন সেগুলির দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি প্রধানত মোলিয়েরের এবং লাবিশের মত ফরাসি কৌতুকনাটক রচয়িতাদের রচনা থেকে উদাহরণ দিয়েছেন। মূলত ফরাসি নাটক থেকে নেওয়া হলেও উদাহরণগুলি এমন সব মানবিক ও সামাজিক পরিস্থিতি ও

প্রতিক্রিয়াকে কেন্দ্র করে কল্পিত যেগুলির রসগ্রহণে কোনো রসিক পাঠকেরই ব্যর্থ হ'বার কথা নয়।

• • •

অবশ্যই কৌতুকহাস্য ও হাস্যরসাত্মক নাটকের পেছনে আরও যে-সব মানসিকতা ও সামাজিক পরিস্থিতির অস্তিত্ব সম্ভবপর—যে-সব পরিস্থিতি আমরা শেক্সপীর, বেন জনসন, অস্কার ওয়াইল্ড, জেম্‌স্ ব্যারি বা বার্নার্ড শ'র রচনায় দেখি তার অনেকগুলিই বেয়র্গসোঁর রচনায় আলোচিত হয় নি। সেই কারণেই বোধহয় *Le Rire* বইটিকে কৌতুকহাস্য সম্বন্ধে 'শেষ কথা' বলা যাবে না। তবু সাহিত্যের ছাত্র হিসেবে বইটির মূল ফরাসি সংস্করণ পড়ার সময় আমার মনে হয়েছে যে কৌতুকহাস্যের উৎস, চরিত্র ও প্রকাশভঙ্গী সম্বন্ধে এমন সব মৌলিক চিন্তা যুক্তির সাহায্যে এই বইটিতে তুলে ধরা হয়েছে যেগুলি ছাত্র, শিক্ষক ও রসিকচিত্তকে আকৃষ্ট করবেই। সেই সঙ্গে আমার আশ্চর্য লেগেছে যে বইখানির কোনো বাংলা অনুবাদ আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নি। তবে, রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চভূত' নামক প্রবন্ধ সঙ্কলনে কৌতুকহাস্য সম্বন্ধে প্রবন্ধটিতে যে মনন চোখে পড়ে তার সঙ্গে বেয়র্গসোঁ অনুসৃত চিন্তাপদ্ধতির সাদৃশ্য অবশ্যই লক্ষ করার মতো।

বইটির এই বাংলা অনুবাদ সম্বন্ধে আমার নিবেদন এই যে এটি সরাসরি ফরাসি সংস্করণ *Le Rire* থেকে করা। যে বিশেষ সংস্করণটি থেকে এটি অনূদিত হয়েছে সেটি ১৯২০ সালে *Librairie Felix Alcan* (108, Boulevard Saint-Germain) থেকে প্রকাশিত। অনুবাদের কাজে যখনই কোনো সমস্যা দেখা দিয়েছে তখনই ম্যাকমিলান কোং লিমিটেডের ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত Brereton এবং Rothwell-এর প্রামাণ্য ইংরাজি সংস্করণ *Laughter*-এর সাহায্য নেওয়া হয়েছে। যে-সব জায়গায় বেয়র্গসোঁর মূল ফরাসি এবং উল্লিখিত ইংরাজি অনুবাদটির মধ্যে কোনো চিন্তা বা ভাষাগত গরমিল দেখা গেছে সেখানে বেয়র্গসোঁর ভাষা ও চিন্তাকেই অনুসরণ করা হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে আমার বিশ্বাস *Le Rire*-এর বাংলা অনুবাদের বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

• • •

এই অনুবাদ গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যাপারে প্রথমেই আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের বাংলা আকাডেমিকে আমার কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। বিশেষ করে আকাডেমির সদস্য-সচিব শ্রীঅমিতাভ মুখোপাধ্যায়ের সাহায্য ছাড়া এই বইটির প্রকাশ সহজ হোত না। সেই সঙ্গে 'অনুষ্টুপ'-এর সম্পাদক শ্রীঅনিল আচার্যকে বইটি প্রকাশনার দায়িত্ব নেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাই। টেক্‌নোপ্রিন্ট মুদ্রণ সংস্থার শ্রীমান্ অরিজিৎ কুমার হাসিমুখে বইটি ছাপার সময় যাবতীয় সাহায্য দিয়ে আমাকে ঋণী করেছেন, তাঁকেও আমার সাধুবাদ দিই। সেই সঙ্গে আমার সহকর্মী ও সাহিত্যরসিক শ্রীঅশোককুমার পালিত মহাশয় মুদ্রণকালে অনুবাদের সাবলীলতা ও প্রাঞ্জলতা আয়ত্তীকরণের জন্য আমাকে যে-সব পরামর্শ দিয়েছেন সে জন্য তাঁকেও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

৩৭ নং বেলগাছিয়া রোড
নন্দবাগান সরকারি আবাসন
কলকাতা ৭০০ ০৩৭

দেবীপদ ভট্টাচার্য
ইংরাজি বিভাগ,
শ্রীরামপুর কলেজ

সূ চি

প্রথম পরিচ্ছেদ

কৌতুকহাস্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য—
আকৃতি ও গতিবিধিসংক্রান্ত কৌতুকহাস্য—
কৌতুকহাস্যের প্রসরণ ক্ষমতা

কৌতুকহাস্যের মানে কি? কোনো হাস্যোদ্দীপক ব্যাপারের মূলে কোন্ গভীর তাৎপর্য লুকিয়ে থাকে? নাটকের বিদূষকের বাক্‌চাতুর্য, সার্কাসের জোকারের উদ্ভট মুখভঙ্গী দিয়ে লোকহাসানো, প্রহসনের অদ্ভুত সব হাস্যোদ্দীপক ঘটনাবিন্যাস, কিংবা কোন উচ্চকোটির কৌতুকনাটক বা কমেডির দৃশ্যবিশেষ—এই সব আপাত পৃথক ব্যাপারগুলির মধ্যে সাদৃশ্য বা ঐক্য কোথায়? এগুলি থেকে কোন্ পদ্ধতিতে নির্যাস বের করলে আমরা সেই মূল গন্ধটির সন্ধান পাব যা আসলে এক হয়েও কখনও হালকা প্রহসনের ভাঁড়ামো, কখনও আবার উঁচুদরের রুচিসম্মত কৌতুকরসের আস্বাদনে আমাদের সাহায্য করবে? আরিস্তত্‌ল[১] থেকে শুরু করে অনেক বড় বড় মনীষী এই আপাততুচ্ছ সমস্যাটির সমাধানের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু প্রায় সব সময়েই তাঁদের চেষ্টাকে ফাঁকি দিয়ে এই সমস্যার সমাধান পিছলে পালিয়েছে, স্পর্দ্ধার সঙ্গে তাঁদের দার্শনিক অনুসন্ধানের প্রয়াসকে তুড়ি মেরে নিজের রহস্যকে অনুদ্ঘাটিত রেখেছে।

আমরা যে আবার নতুন করে সেই রহস্যের মোকাবিলা করতে উদ্যত হয়েছি তার কারণ কোন সঙ্কীর্ণ সংজ্ঞা বা লক্ষণের চৌহদ্দির মধ্যে আমরা তাকে বন্দী করে রাখতে চাই না। তার মধ্যে আমরা গোড়া থেকেই জীবনের কিছু লক্ষণ বা ধর্ম খুঁজে পেতে আগ্রহী। হাস্যরস আপাতদৃষ্টিতে যতই চটুল বা লঘু হোক না কেন, আমরা তাকে জীবনের গুরুত্ব ও গভীরতা দিতে চাই। আমরা আমাদের চটুলতাকে সংযত করব, দেখব কিভাবে

হাস্যরসের গূঢ় রহস্য নিজেকে নানা দিকে ব্যাপ্ত করে। আমরা দেখতে পাব প্রায় আমাদের অলক্ষ্যে হাস্যরস কত বিচিত্রভাবে এক রূপ থেকে অন্য আর এক রূপ ধরে। এই আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের কাছে যে সব জিনিষ প্রকট হবে তার কোনটিকেই আমরা মূল্যহীন বা অপাংক্তেয় বলে উড়িয়ে দেব না। হাস্যরসের সঙ্গে এই নিবিড়তর পরিচয়ের ফলে হয়তো আমরা এমন কিছু সূক্ষ্ম তত্ত্ব এবং গূঢ় সত্যের সন্ধান পাব যা শুধুমাত্র তাত্ত্বিক মানসিকতা নিয়ে উপলব্ধি করা সম্ভবপর নয়। এই আলোচনার ফলে হয়তো আমাদের এমন একটা জীবনভিত্তিক জ্ঞান হবে যা শুধু বহুদিনের আন্তরিক ঘনিষ্ঠতা আর বন্ধুতা থেকেই আসতে পারে। কিংবা হয়তো লক্ষ করবো যে সচেতন প্রয়াস ছাড়াই আমরা খুব দামি আর জরুরি জ্ঞান এই-ভাবে অর্জন করে ফেলেছি। দেখতে পাব যে প্রকাশগত বৈচিত্র্যসত্বেও কৌতুকহাস্যের নিজস্ব একটা যুক্তি আছে, তার আপাত পাগলামোর পেছনেও একটা নিয়ম এবং নীতি কার্যকর, আর তার আপাত মত্ততার ভেতর দিয়ে এমন সব সর্বজনীন সত্যের প্রকাশ ঘটে যার মাধ্যমে একটা পূর্ণ সমাজচিত্র ফুটে ওঠে এবং যা সমাজের সকলের দ্বারা স্বীকৃত। তাই প্রশ্ন ওঠে, এমন কি কোন হাস্যরস আছে যা মানুষের কল্পনাশক্তির প্রকাশ পদ্ধতি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান দিতে পারে না, পারে না আমাদের সামাজিক, গোষ্ঠীগত এবং সর্বজনীন কল্পলোকে নিয়ে যেতে? বাস্তব-জীবন থেকে উদ্ভূত অথচ শিল্পসম্মত হাস্যরসকে জীবন ও শিল্প এই দুই জগতেই স্বীকার না করে আমরা পারি কি করে?

• • •

প্রথমেই আমরা যে তিনটি মন্তব্য করব সেগুলির প্রত্যেকটিকে মৌল ও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বলে আমরা মনে করি। এই মন্তব্যগুলি হাস্যরসের চরিত্রের চেয়ে তার উৎস সম্বন্ধে আমাদের অনেক বেশি জ্ঞান দেবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

। এক ।

যথার্থই মানুষের জীবনকেন্দ্রিক ব্যাপারের বাইরে হাস্যরসের কোন স্থান নেই, এই সত্যটির প্রতি প্রথমেই আমরা পাঠকদের মন দিতে বলি। একটা নিসর্গদৃশ্য সুন্দর, সুষ্ঠু, মহান, সাধারণ কিংবা কুৎসিৎ হতে পারে, কিন্তু কখনই হাস্যকর হতে পারে না। কোন পশু তখনই আমাদের হাসির উদ্রেক করে যখন তার মধ্যে আমরা মানুষী কোন ভাবভঙ্গী বা আচরণ দেখতে পাই। একটা তুচ্ছ টুপিও যখন আমাদের হাসির কারণ হয় তখন নিশ্চয়ই যে খড় বা পশম দিয়ে তা তৈরি তা দেখে আমাদের হাসি পায় না। খড় বা পশমের তৈরি প্রাণ ও চেতনাহীন ঐ মস্তকাবরণ কোন লোকের ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে যখন একটা বিশেষ আকৃতি পায়, অর্থাৎ মানুষের চরিত্র বা খেয়ালখুশি যখন তার ব্যবহার করা জিনিষের মধ্যে খানিকটা প্রকাশ হয়ে পড়ে তখনই ঐ জীবনহীন বস্তুটি আমাদের কৌতুকবোধকে জাগিয়ে তোলে। সহজ, সরল অথচ গভীর মানবিক তাৎপর্যপূর্ণ এই ব্যাপারটি দার্শনিকদের কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসাকে আজ পর্যন্ত তেমন প্রবলভাবে কেন আলোড়িত করে নি এই প্রশ্ন সত্যই আমাদের বিস্মিত করে। মানুষের পরিচয় দিতে গিয়ে অনেকে বলেছেন, "হাসতে পারে এমন এক জীব"। মানুষের বর্ণনা হিসেবে তাঁরা একথাও বলতে পারতেন 'দেখলে হাসি পায় এমন এক প্রাণী।' অন্য কোন জীব বা জীবনহীন বস্তু আমাদের ওপর তখনই ঐ ধরনের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে যখন তার সঙ্গে মানুষের কোন সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়, যখন মানুষ তার ওপর কোন ছাপ রাখে কিংবা কোন বিশেষ ঢং-এ তাকে ব্যবহার করে।

কৌতুকহাস্যের আর একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হলো তার মধ্যে অনুভূতি এবং আবেগের অনস্তিত্ব। মন নিরুদ্বেগ ও চাঞ্চল্যমুক্ত না হলে কৌতুকহাস্য তার ওপর তার বিশেষ প্রতিক্রিয়াটির সঞ্চার করতে পারে না। আবেগহীনতা এবং নিস্পৃহতা হোল কৌতুকহাস্যের স্বাভাবিক আর স্বকীয় পরিবেশ। বিপরীতপক্ষে, আবেগ ও অনুভূতির প্রাবল্য হাস্যরসের সবচেয়ে বড় শত্রু। অবশ্য তার মানে এই নয় যে যে-লোক আমাদের মনে

করুণা, এমন কি স্নেহের উদ্রেক করে সে আমাদের কৌতুকহাস্য জাগাতে পারে না। শুধু আমাদের বক্তব্য, কিছুক্ষণের জন্য করুণরস ভুলে এবং স্নেহকে স্তব্ধ রেখেই আমরা কৌতুকহাস্যকে যথার্থ উপভোগ করতে পারি। নির্ভেজাল বুদ্ধি আর যুক্তিবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সমাজে বোধ হয় চোখের জলের কোন অবকাশ থাকবে না, কিন্তু সেখানে হাসির কোন অভাব হবে না। কিন্তু যে সমাজে আবেগ জোরালো এবং যেখানে জীবনের ছন্দ মানুষের অনুভূতির সঙ্গে বাঁধা, যেখানে সমস্ত ঘটনা অনেকদিন ধরে মানুষের হৃদয়তন্ত্রীতে অনুরণিত হয় সেখানে মানুষ হাসতে জানে না, হাসির মর্ম বোঝাও সেখানে সহজ নয়। একবার মুহূর্তের জন্যও মানুষের যাবতীয় ব্যাপারে কিংবা সমাজের সমস্ত ঘটনায় আগ্রহ দেখাবার চেষ্টা করুন; যারা কাজ করে তাদের সব কাজে, যারা অনুভব করে তাদের সমস্ত অনুভূতিতে কল্পনার সাহায্যে অংশ নেবার চেষ্টা করুন, চেষ্টা করুন আপনার সহানুভূতি ও সমবেদনাকে যতটা সম্ভব বৃহত্তম পরিধির মধ্যে ব্যাপ্ত করে দিতে; দেখবেন, যেন যাদুকরের যাদুদণ্ডের ছোঁয়ায় নিমেষের মধ্যে পৃথিবীর যাবতীয় লঘু আর চটুল ব্যাপার গুরুগম্ভীর হয়ে উঠেছে, সব কিছুর ওপর একটা বিষাদের বিবর্ণতা ছড়িয়ে গেছে। এইবার, নিজেকে সব ঘটনা থেকে গুটিয়ে নিয়ে জীবনের রঙ্গমঞ্চের সামনে শুধু একজন নিরাসক্ত দর্শক হিসেবে উপস্থিত করুন, দেখবেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জীবনমঞ্চের বহু গুরুগম্ভীর দৃশ্য লঘু প্রহসনে পরিণত হয়েছে। কোন নাচের অনুষ্ঠানে গিয়ে নাচের সঙ্গে বাজনার শব্দ যদি আমরা কাণে ঢুকতে না দিই তা হলে নর্তকের সঙ্গতবর্জিত অঙ্গভঙ্গী আমাদের চোখে হাস্যকর মনে হবেই। প্রশ্ন করা যায়, পৃথিবীতে মানুষের করা এমন কটি কাজ আছে যা এই পদ্ধতিতে পরীক্ষা করলে আমাদের কৌতুকবোধকে জাগিয়ে তুলবে না? আবেগ আর অনুভূতির স্পন্দনকে আমরা যদি যাবতীয় ঘটনা থেকে বিচ্ছিন্ন করি তবে সব কিছুই যে হাস্যকর লঘু ব্যাপারে পর্যবসিত হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বলা চলে, তার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির জন্যে কৌতুকহাস্য মানুষের হৃদয়-বৃত্তিগুলির ওপর সাময়িক ভাবে এক ধরণের বিক্রিয়ার

(anesthésie) প্রলেপ লাগায়। মূল কথা, হাস্যরসের আবেদন পুরোপুরি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির ওপর, অনুভূতি বা আবেগের ওপর নয়।

কিন্তু এই বুদ্ধিবৃত্তিকে আমাদের মস্তিষ্কের অন্যান্য বিভিন্নমুখী প্রক্রিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংসর্গে থাকতে হবে। এইটেই সেই তৃতীয় যুক্তি যার দিকে আমরা পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। যিনি নিজেকে একান্তে রাখতে চান, নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে করেন তাঁর পক্ষে কৌতুকহাস্যের আস্বাদন সম্ভবপর নয়। মনে হয়, কৌতুকহাস্য অপরের হাসিতে নিজের প্রতিধ্বনি শুনতে চায়। কান পেতে শুনলে বোঝা যাবে এই হাসি ঠিক উচ্চারিত (articulé), পরিচ্ছন্ন কোন নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বাঁধা (terminé) নয়। পাহাড়ী অঞ্চলে বাজপড়ার শব্দ যেমন সজোরে শুরু হয়ে গুরু গুরু মন্দ্রে ক্রমশ কাছ থেকে দূরে নিঃসীম ছন্দে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে, কৌতুকহাস্যও তেমনি আমাদের মধ্যে প্রবল শব্দে ফেটে পড়ে, তারপর শব্দতরঙ্গের মত কাছ থেকে দূরে প্রতিধ্বনি তুলতে থাকে, হঠাৎ শেষ হয়ে যায় না। যদিও এই হাসির রেশ অনন্তকাল চলতে পারে না, তবুও মনের জলাশয়ে কম্পমান বৃত্তাকার (cercle) লহরীর মত তা যতদূর সম্ভব ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এই হাস্যবৃত্ত একটা বিশেষ পরিবেশ ও পটভূমিতে সীমিত। আমাদের কৌতুকবোধ সবসময় কোন বিশেষ সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর চেতনা থেকে উদ্ভূত। ট্রেনের কামরায় বা অন্য কোন যায়গায় দেখা যায় কিছু যাত্রী নিজেদের মধ্যে খোসগল্প করতে করতে উচ্ছলভাবে হাসি ঠাট্টা করছে, গল্পের মধ্যে বিশেষ কোন ব্যাপার তাদের কৌতুকবোধকে জাগিয়ে তুলছে। ঐ দলে থাকলে আপনিও সহজভাবে তাদের হাসি তামাশায় যোগ দিতে পারতেন। কিন্তু যেহেতু আপনি ঐ গোষ্ঠীর একজন নন, তাদের ঐ মজায় অংশীদার হতে আপনার কোন ইচ্ছা জাগে না। এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল এক পাদ্রীর ভাষণ শুনে সভার অন্য সবাই যখন কেঁদে ভাসাচ্ছিল তিনি একটুও চোখের জল ফেলেন নি কেন। তিনি জবাব দিয়েছিলেন, "আমি তো ঐ গির্জের পাড়ার (paroisse) বাসিন্দা নই যে কাঁদব"। ঐ ব্যক্তি কান্না সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন হাসি সম্বন্ধেও ঐ একই

কথা বলতে পারতেন। আসল কথা হোল, কৌতুকহাস্য আমাদের কাছে যতই স্বতঃস্ফূর্ত বলে মনে হোক না কেন, তার মধ্যে প্রায় গোপন ষড়যন্ত্রের মত একটা রহস্য থাকে যাতে প্রকৃত বা কাল্পনিক কিছু লোকের অংশগ্রহণ অত্যাবশ্যক। একথা অনেক সময় বলা হয় যে কৌতুকনাটক বা প্রহসনের অভিনয়কালে প্রেক্ষাগৃহ যত বেশি ভর্তি থাকে, দর্শকদের অট্টহাসির প্রকোপ তত বাড়ে। একথাও আমরা বহুবার শুনেছি যে কৌতুককর কোন ব্যাপার বা প্রতিক্রিয়া ভাষান্তরিত হ'বার নয়। মানুষের নীতিবোধের মতই তা পটভূমি ও পরিবেশ সাপেক্ষ, একটা বিশেষ সমাজ ও গোষ্ঠীর চিন্তা ও ধারণার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাই কেউ যখন কৌতুকহাস্যের পেছনে শুধু মানুষের মনের সহজ কৌতুকপ্রিয়তা ও রসবোধকেই গুরুত্ব দিতে চান তখন বুঝতে হবে কৌতুকবোধের মধ্যে দুটো আলাদা ব্যাপারের যুগপৎ অস্তিত্ব বুঝতে তিনি অক্ষম হয়েছেন। তিনি কৌতুকহাস্যকে একটা উদ্ভট ব্যাপারের চেয়ে বেশি কিছু ভাবতে পারেন না, বুঝতে পারেন না যে কৌতুকহাস্য মানুষের জীবনের আর সব যাবতীয় ঘটনা ও কার্যকলাপের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত একটা গভীর ব্যাপার, জীবনভূমি থেকে উৎপাটিত ছিন্নমূল কোন জিনিষ নয়। উপলব্ধির এই ত্রুটি থেকেই কৌতুকহাস্যের সেই সব সংজ্ঞা বা লক্ষণের জন্ম হয়েছে যার মধ্যে বাস্তবজীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন কতকগুলি চিন্তা প্রকট হয়ে পড়ে। যেমন, 'বুদ্ধিগোচর বৈপরীত্য" (contrast intellectuel), 'প্রকট নির্বুদ্ধিতা বা অযৌক্তিকতা' (absurdité sensible), ইত্যাদি। এই সব লক্ষণ যদি যাবতীয় হাস্যকর ঘটনার বর্ণনায় প্রযুক্ত হতেও পারে, তবু কেন বিশেষ কোন উক্তি, মানুষ আর ঘটনা আমাদের হাসায় তার কোন পরিষ্কার ব্যাখ্যা দেয় না। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, যখন অন্য সমস্ত ব্যাপার আমাদের সত্তাকে নিষ্ক্রিয় আর অনুত্তেজিত রাখে, তখন কতকগুলি বিশেষ শ্রেণীর কাজ ও ঘটনাপরম্পরা দেখামাত্র আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেন কখনও সঙ্কুচিত, কখনও বিস্ফারিত আবার কখনও বা কম্পিত হয়? কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্য আমরা এই বিশেষ দিকটি থেকে ব্যাপারটি অনুধাবন করব না। কৌতুকহাস্যের স্বরূপ

বুঝতে হলে তাকে তার স্বাভাবিক পরিবেশে অনুশীলন করতে হবে, এবং সেই পরিবেশটি হলো কোন বিশেষ সামাজিক বাতাবরণ। সর্বোপরি মনে রাখতে হবে যে কৌতুকহাস্যের একটা বিশেষ উপযোগিতা আছে এবং এই উপযোগিতা সমাজের সঙ্গে একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে যুক্ত। এখন আমরা বলতে পারি, কৌতুকহাস্য আমাদের জীবনের কোন্ সর্বজনীন প্রয়োজন মেটায় তারই অনুসন্ধানে আমাদের এই আলোচনা প্রযুক্ত হবে। আমাদের বুঝতে হবে যে হাস্যরসের একটা সামাজিক তাৎপর্য অপরিহার্য।

প্রথমেই আমরা যে তিনটি মন্তব্য করেছি সেগুলির প্রত্যেকটিই যে লক্ষ্যে গিয়ে মিলছে এবারে তা পরিষ্কার করে বুঝে নেওয়া দরকার। যখন কিছু লোক গোষ্ঠীবদ্ধ হয় এবং যখন ঐ গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ তাদের মধ্যে একজনের আচার-ব্যবহার সমস্ত আবেগ-অনুভূতিকে রুদ্ধ রেখে শুধু বুদ্ধি-বৃত্তির সাহায্যে বিচার করে তখনই হাস্যরসের উদ্ভব হয়। এখন প্রশ্ন হলো, মানুষের ব্যবহারবিধির কোন্ বিশেষ দিকটির মূল্যায়নে এই গোষ্ঠী তার বিশ্লেষণ ক্ষমতাকে প্রয়োগ করে থাকে? তাদের বুদ্ধিবৃত্তিই বা তখন কোন্ বিশেষ কর্তব্যটি সম্পাদন করবে? এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে হলে আরও কাছ থেকে সমস্যাটির মোকাবিলা করতে হবে। কিন্তু তার আগে কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেওয়া জরুরি হয়ে উঠেছে।

। দুই ।

একটি লোক পথে চলতে চলতে হোঁচট্ খেয়ে পড়ে গেল; দেখে পথিকরা হেসে উঠল। আমার ধারণা লোকটি যদি খেয়ালবশে মাটির ওপর বসে পড়ত তা দেখে কেউ হেসে উঠত না। কিন্তু লোকটি যে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘটনাক্রমে পড়ে গেছে, এই কারণেই পথিকদের হাসি পেয়েছে। লোকটির অবস্থানের আকস্মিক পরিবর্তন হাসির কারণ নয়, হাসির কারণ এই অবস্থানগত পরিবর্তনে তার নিজের ইচ্ছের অভাব। হয়তো রাস্তায় একটা পাথর ছিল; কিন্তু সে অবস্থায় লোকটির উচিত ছিল তার গতিপথ বদলানো কিংবা পথ থেকে পাথরটিকে সরিয়ে দেওয়া। কিন্তু শারীরিক নমনীয়তার অভাবেই হোক,

অথবা অন্যমনস্কতা বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আড়ষ্টতা বা অনিয়ন্ত্রিত গতিবেগের ফলেই হোক লোকটির শরীরের পেশীগুলি গতির দিক প্রয়োজনমত না বদলে আগের মতই আচরণ করেছে। ফলে লোকটির আকস্মিক পতন হয়েছে এবং সেই কারণেই অন্য পথিকদের কাছে ঘটনাটি হাস্যকর বলে মনে হয়েছে।

এবার এমন কোন ব্যক্তির কথা ভাবা যাক্ যিনি তাঁর প্রতিদিনের ছোটখাট কাজও যন্ত্রের মত নিখুঁত নিয়মে করে থাকেন। আরও মনে করা যাক যে কোন দুষ্টবুদ্ধি রহস্যপ্রিয় লোক এই ভদ্রলোককে ঠকাবার মতলবে তাঁর কাজের জিনিষগুলো একটু এদিক ওদিক করে সরিয়ে রেখেছে। ফলে, ভদ্রলোক দোয়াতে কলম ডুবিয়ে দেখেন তাতে কালির জায়গায় কাদা রাখা হয়েছে। কিংবা কোন মজবুত চেয়ারে বসতে গিয়ে তিনি মেঝেতে পড়ে যান ; মোটকথা, তাঁর সমস্ত কাজকর্ম ওলট-পালট হয়ে যায়। কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রে কারণ হিসেবে রয়েছে ভদ্রলোকের তৎপরতা এবং ঝটতি কাজ করার প্রবণতা। অভ্যাস তাঁকে কর্মতৎপর করেছে। কিন্তু উল্লিখিত প্রতিটি ক্ষেত্রে ভদ্রলোকের উচিত ছিল তাঁর অভ্যাসসুলভ তৎপরতাকে একটু সংযত করা। মোটেই তা না করে তিনি যন্ত্রের মত চিন্তাহীন ভাবে তাঁর অভ্যস্ত কাজে এগিয়ে গেছেন। দুষ্টলোকের মস্করার শিকার এই ভদ্রলোক, আর একটু আগে উল্লিখিত চলমান লোকটি মূলত একই পরিস্থিতির শিকার। দুজনেই আসলে একই কারণে আমাদের হাসির পাত্র হয়ে পড়েন। উভয় ক্ষেত্রেই আমাদের কৌতুকবোধের কারণ ভদ্রলোকদের আচরণে এক-ধরণের যন্ত্রসদৃশ অনমনীয়তা (raideur)। যেখানে বুদ্ধিমান্ মানুষ অবস্থা বা পরিস্থিতির সঙ্গে কাজের সামঞ্জস্য আশা করে থাকেন, সেখানে এই দুই ব্যক্তিই বুদ্ধিহীন জড়যন্ত্রের মত আচরণ করেছেন। দুটো ঘটনার মধ্যে শুধু তফাৎ হোল, প্রথমটি নিজের থেকে ঘটেছে, দ্বিতীয়টির পেছনে ছিল অন্য এক নেপথ্যচারী ব্যক্তির দুষ্টবুদ্ধি। প্রথম ঘটনাটিতে পথিক পাথরটিকে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখেও সতর্ক হন নি, দ্বিতীয় ঘটনাটির পেছনে রয়েছে কোন পাজী লোকের চক্রান্ত।

তবুও দুটি ক্ষেত্রেই দুর্ঘটনা ঘটেছে বাহ্য পরিস্থিতির দরুন। তাই হাস্যকৌতুকের পেছনে আকস্মিকতা ও অপ্রত্যাশিতত্বের একটা বড় ভূমিকা আছে। বলা যায়, উল্লিখিত হাস্যকর দুটি ঘটনায় মানুষের ভূমিকাতেও একটা গভীরতার অভাব আছে। তা হলে প্রশ্ন ওঠে, মানুষের সত্তার অন্তঃস্থলে কি ভাবে ঢোকা যায়? যখন মানুষের চরিত্রের যান্ত্রিক অনমনীয়তা ও বুদ্ধিবৃত্তির স্থিতিস্থাপকতার অভাব অবস্থানুসারে নিজের থেকেই প্রকাশ পাবে; পথের পাথর বা দুষ্টলোকের দুষ্টামি যখন এই চারিত্রিক ত্রুটিগুলির প্রকাশের জন্য দরকার হবে না, তখন সুযোগ পেলেই নিজের থেকেই নানাভাবে চরিত্রের যান্ত্রিকতা মানুষের আচারব্যবহারে প্রকাশ হয়ে পড়বে। এবার এমন একটি লোকের কথা ভাবা যাক্ যে একটু আগে যে কাজটি করেছে শুধু তাই নিয়েই চিন্তা করে, বর্তমানের কর্তব্য নিয়ে তার এতটুকুও ভাবনা নেই—যেন সংগতের তাল থেকে পিছিয়ে থাকা একটি গান। অনুভূতি আর বুদ্ধিবৃত্তির এমন একটা সহজ অভাব, যার ফলে যা দেখা যায় না, একটি চরিত্র শুধু তাই দেখতে থাকে, যা শোনা যায় না তাই শুনতে থাকে, যা বলার দরকার নেই ক্রমাগত তাই বলতে থাকে; অর্থাৎ, চরিত্রটি শুধু অতীতকে নিয়ে মেতে থাকে, এক কল্পজগতের মধ্যে ডুবে থাকে; অথচ জীবনে মানুষকে বর্তমান এবং বাস্তবজগতের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে নিজের কাজকর্মকে নিয়ন্ত্রিত করতে হয়। এই ধরণের চরিত্রের মধ্যে হাস্যকৌতুকের বীজ নিহিত থাকে। চরিত্রটি নিজের থেকেই তার হাবভাব, কাজকর্ম ইত্যাদির সাহায্যে অনবরত দর্শকদের হাসির খোরাক জুগিয়ে যায়। তাই এই ধরণের 'ভাবুক' বা 'অন্যমনস্ক' চরিত্র যে বিভিন্ন প্রহসন বা কৌতুকধর্মী নাটকে স্রষ্টার সৃষ্টিপ্রয়াসকে উদ্বুদ্ধ করে তাতে বিস্মিত হ'বার কিছু নেই। যখন লা ব্রুইয়ের[২] (La Bruyère) এই বিশেষ ধরনের চরিত্রের দেখা পেলেন তিনি তাকে বিশ্লেষণ করে বুঝলেন নানা ধরনের হাস্যোদ্দীপক পরিস্থিতি সৃষ্টি করার উপযোগী মালমশলা (recette) তাঁর আয়ত্তে এসে গেছে। বরঞ্চ বলা চলে এ নিয়ে তিনি একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন, যার ফলে *Menalque* নাটকে তিনি অতিশয় দীর্ঘ আর বেশি

খুঁটিনাটি বর্ণনাসমন্বিত একটা পরিস্থিতির অবতারণা করেছেন — এই বৈশিষ্ট্যটি নিয়ে তিনি প্রায় সীমাহীন একটা আলোচনায় নেমে পড়েছেন। আসলে ব্যাপারটির সহজতা তাঁকে মুগ্ধ করেছে। হয়তো অন্যমনস্কতাই কৌতুক-হাস্যের একমাত্র উৎস নয়, কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যটিকে ঘিরে এমন অনেক ঘটনা ও পরিস্থিতি কল্পনা করা যায় যেগুলি এর থেকে সরাসরি বেরিয়ে আসে। সন্দেহ নেই যে চরিত্রের এই অন্যমনস্কতা হাস্যরসের একটি অত্যন্ত স্বাভাবিক উৎসমুখ।

অন্যপক্ষে, অন্যমনস্কতার ফলও কৌতুকহাস্যের একটি শক্তিমান্ কারণ হতে পারে। একটি সাধারণ নিয়ম আছে যার প্রথম দৃষ্টান্ত আমরা এই-মাত্র লক্ষ করেছি এবং নিয়মটিকে এইভাবে সাজানো যেতে পারে : বিশেষ কোন কারণে যখন কৌতুকপ্রদ কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, তখন কারণটিকে আমরা যত সহজ আর স্বাভাবিক মনে করব আমাদের ওপর তার প্রতিক্রিয়া তত বেশি হাস্যোদ্দীপক হবে। অন্যমনস্কতা যখন সাধারণ আর সরল ব্যাপার হিসেবে প্রকাশ পায় তখনই তা বেশি মজার বলে মনে হয়। যে অন্যমনস্কতার কারণ আমরা জানি, যার উৎপত্তি আর স্ফুরণ আমাদের চোখের সামনে ঘটে, যার পুরো ইতিহাস আমাদের নখদর্পণে তা বিশেষ করে কৌতুককর বলে আমাদের ধারণা হয়। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। এক ব্যক্তি প্রেম আর বীরত্বের কাহিনী ছাড়া অন্য কিছু পড়ে না। ঐ সব কাহিনীর নায়ক-নায়িকাদের দ্বারা সে এতই মুগ্ধ আর আকৃষ্ট যে তার চিন্তা-ভাবনা শুধু তাদের কেন্দ্র করেই আবর্তিত হ'তে থাকে। শেষে লোকটি সম্মোহিতের মত হাবভাব দেখায়। তার সমস্ত কাজকর্ম আনমনা আর এলোমেলো হয়ে পড়ে। এ-ক্ষেত্রে লোকটির অন্যমনস্ক ভাবুক অবস্থার বিশেষ কারণটি আমাদের জানা আছে। এই এলোমেলো ভাব কিন্তু লোকটির মনে চিন্তার অভাব থেকে আসে নি। বরঞ্চ লোকটির চিন্তায় কাল্পনিক হলেও বেশ জীবন্ত আর অতিরঞ্জিত কিছু পরিস্থিতি আর চরিত্রের উপস্থিতিই তার এই অন্যমনস্কতার আসল কারণ। পতন যে সব সময়েই পতন তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সামনের দিকে চোখ না রেখে

অন্যদিকে তাকানোর ফলে পথের মধ্যে কুয়োতে পড়ে যাওয়া এক কথা, আর আকাশের নক্ষত্র গুণতে গুণতে কুয়োর মধ্যে পড়ে যাওয়া অন্য এক ব্যাপার। ডন কিহোটে[৩] (*Don Quixote*) নির্ঘাৎ নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে পথ চলছিলেন। স্বর্ণযুগের পেছনে ধাবমান কল্পনাবিলাসী চরিত্রকে নিয়ে যে কৌতুকহাস্যের সৃষ্টি হয় তার গভীরতা অনেক বেশি। কিন্তু এই অন্যমনস্কতাকে কেন্দ্রীয় শক্তি হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা দিয়ে যদি নানা পরিস্থিতির সূচনা করা যায় তা হলে দেখা যাবে গভীর শ্রেণীর হাস্যরসের এই উপাদানটি কিভাবে লঘু ও চটুল হাসির বাহকও হতে পারে। বাস্তবিক, এই খেয়ালী আর উজ্জ্বল উৎসাহীর দল, এই অদ্ভুত যুক্তিবাদী পাগলগুলো আমাদের বুদ্ধির তারে বিভিন্ন সুরের ঝঙ্কার তুলে আমাদের হাসাতে পারে। কখনও সেই দুষ্টবুদ্ধি লোকটির শিকার হিসেবে, কখনও সেই স্খলিতপদ পথচারীর রূপ নিয়ে সে আমাদের কৌতুকবোধকে সক্রিয় করে, আবার কখনও জীবনের পথে বাস্তবতার পাথরে ধাক্কা খাওয়া পথিক শিশুর মত স্বপ্নবিলাসী মানুষ হিসেবে এই হাসির চরিত্র আত্মপ্রকাশ করে; আর এই সব আদর্শবাদী কল্পনাপ্রবণ মানুষগুলোকে ধরাশায়ী করার জন্য জীবনের যত কঠিন সমস্যা তাদের পাথরগুলো জীবনের পথে যেখানে সেখানে ছড়িয়ে রেখেছে বলে মনে হয়। কিন্তু শেষোক্ত চরিত্রের মানুষের মধ্যে প্রথম দু'ধরনের চরিত্রের চেয়ে অনেক বেশি উঁচু জাতের অন্যমনস্কতা রূপ পায়। তার অন্যমনস্কতার পেছনে একটা বিশেষ কারণ আছে, কোন একটি আদর্শ ও বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে তার অন্যমনস্কতা আবর্তন করে। তার জীবনের উদ্ভট সব ক্রিয়াকলাপ আর দুর্ঘটনাও তাদের নিজস্ব একটা সামঞ্জস্য নিয়ে চলে। তার কারণ, বাস্তব জীবন স্বপ্নবিলাসের পেছনে কার্যকর ভ্রান্তিকে শোধরাবার জন্য তার অমোঘ যুক্তি প্রয়োগ করে, এবং তার ফলে এইসব ঘটনার পারম্পর্য স্বাভাবিক প্রবণতায় মানুষ ও দর্শকদের মধ্যে অসীম সম্ভাবনাপূর্ণ কৌতুক-বোধের সঞ্চার করে।

এবারে আর একটু এগোন যেতে পারে। একটি মাত্র চিন্তাকে আঁকড়ে থাকার প্রবৃত্তি মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে যে ভাবে প্রভাবিত করে, তার চারিত্রিক

দোষও তার চরিত্রকে অনুরূপভাবে ত্রুটিপূর্ণ করবে, এটাই স্বাভাবিক। নৈতিক ত্রুটি বা মানসিক কুটিলতা—যে-ভাবেই চরিত্রের দোষ প্রকাশ পাক না কেন, মানুষের সত্তায় একটা বক্রতা এনে দেয়। অবশ্যই এমন অনেক দোষ আছে যার মধ্যে মানুষের বুদ্ধি এবং চেতনা গভীরভাবে অনুপ্রবিষ্ট থাকে। আমাদের উপলব্ধি, বুদ্ধি ও বিবেকের মধ্যে সৃষ্টিধর্মী যা কিছু শক্তি আছে তা দিয়ে নানা বৈচিত্র্যের সমন্বয়ে নতুন নতুন পরিবেশে এই সব দোষ প্রকাশ পায়। এই সব দোষ অনেক সময় ট্র্যাজেডির কারণ হয়। কিন্তু যখনই আমাদের ব্যবহারে অসঙ্গতি বা ত্রুটি ধরা পড়ে তখনই আমরা হাস্যাস্পদ হই। তখনই আমরা যেন পূর্বনির্দ্ধারিত একটা সীমার মধ্যে ধরা পড়ি। পালাবার কোন পথ থাকে না। বেড়া দিয়ে ঘেরা একটা অলঙ্ঘনীয় পরিসীমার মধ্যে আমরা বন্দী হয়ে পড়ি, আমাদের বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব যেন সাময়িকভাবে হারিয়ে যায়। আমরা কিন্তু নিজের দোষে ঐ বন্দীদশাকে জটিল করে তুলি না; বরং ঐ অবস্থাই আমাদের মধ্যে সক্রিয় একটা দৃঢ়মূল বৈশিষ্ট্যকে প্রকট করে তোলে। এই আলোচনার শেষের দিকে আমরা দেখাবার চেষ্টা করব কিভাবে কৌতুকহাস্য (কমেডি) এবং বিয়োগান্ত (ট্র্যাজেডি) ব্যাপারের মধ্যে তফাৎ এরই মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে। এদের বৈশিষ্ট্য ও স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা আরও খুঁটিয়ে আলোচনা করার অবকাশ পাব। ট্র্যাজিক নাটক নায়ক বা নায়িকার চরিত্রের মূল প্রবণতা বা ত্রুটির ছবি তুলে ধরে চরিত্রটির দোষ-ত্রুটি, আবেগ-অনুভূতি, গুণ-ধর্মের জীবন্ত রূপ হয়ে ওঠে। সেখানে চরিত্রটির অন্যান্য সামান্য বা সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি অন্তর্হিত বা গৌণ হয়ে যাওয়ার ফলে চরিত্রটিকে তার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে আলাদা করে কল্পনা করা আমাদের পক্ষে কঠিন হয়ে ওঠে—আমরা ঐ চরিত্রবিশেষের অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য হিসেবেই ঐ দোষগুলির কথা ভাবতে পারি। বোধ হয় ঐ কারণেই বিয়োগান্ত বা ট্র্যাজিক নাটকের নাম ঐ বিশেষ চরিত্রের নামানুসারে হয়ে থাকে। বিপরীত পক্ষে, কোনো কৌতুক নাটক বা প্রহসনের নামকরণ হয় বর্গনাম (nom générique) অনুসারে, যেমন কৃপণ (*L'Avare*), জুয়াড়ি

(*Le Joueur*), ইত্যাদি। যদি ঈর্ষ্যাপরায়ণ বা হিংসুটে (*Le Jaloux*) নামের কোন নাটক কল্পনা করা যায় তা হলে সঙ্গে সঙ্গে স্গানারেল (Sganarelle)[৪] কিংবা জর্জ দাঁদ্যার (George Dandin)[৫]-এর মত কোন চরিত্রের কথা মনে পড়বে, কিছুতেই ওথেলোর কথা মনে আসবে না। 'হিংসুটে', এই ধরনের শিরোনাম প্রহসন ছাড়া অন্য কোন জাতের নাটকের হতে পারে না। এর কারণ কৌতুককর দুর্বলতা হিসেবে কোন দোষ যত ঘনিষ্ঠভাবেই ব্যক্তিচরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাক না কেন, অদৃশ্যভাবে হলেও ঐ দোষটিই নাটকের প্রধান চরিত্র বা কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করতে থাকে, আর মনুষ্যদেহী চরিত্রটি শুধু ঐ দোষটির রূপায়ণের উপায় হিসেবে কাজ করে। কখনও আবার এই মূল দোষটি নিজের প্রয়োজনমত মানুষরূপী পুতুলগুলোকে ব্যবহার করে ও নিজের প্রবণতা অনুযায়ী কোন বিশেষ পথে তাদের বিবর্তন দেখায়। যন্ত্রী যেমন বাদ্যযন্ত্র বাজান, কিংবা পুতুলনাচের শিল্পী যেমন আঙুলের কসরতে, আপন ইচ্ছামত পুতুলগুলোকে নাচান, তেমনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঐ চারিত্রিক দোষত্রুটিগুলি চরিত্রের আচার-আচরণ, কথাবার্তা প্রভৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করে। আরও কাছ থেকে লক্ষ করলে দেখা যাবে হাস্যরসের শিল্পীর কাজ হোল নাটকে সক্রিয় প্রধান চারিত্রিক দোষটিকে এমন পরিপূর্ণ আর ঘনিষ্ঠভাবে দর্শকদের সামনে মেলে ধরা এবং দর্শকদের সেই দোষের অন্তঃস্থলে এমন নিপুণভাবে অনুপ্রবিষ্ট করা যাতে শেষ পর্যন্ত নাটকের চরিত্ররূপ পুতুলগুলো আর দর্শকদের মধ্যে এমন একটা ঘনিষ্ঠ বোঝাপড়া গড়ে ওঠে যার ফলে নাট্যকার যে সুতোগুলি দিয়ে ঐ পুতুলগুলোকে নাচাচ্ছেন তার কয়েকটি দর্শকদেরও আয়ত্তে এসে যায়, তাঁরাও যেন ইচ্ছে হলে ঐ সুতোগুলির সাহায্যে পুতুলগুলিকে খেলাতে পারেন। প্রহসন থেকে আমরা যে আনন্দ পাই তার পেছনে এটাও একটা কারণ। এই চরিত্রগুলির আচার-ব্যবহারে যথার্থ চিন্তাশীল মানুষের চরিত্রবিরোধী পুতুলসুলভ যান্ত্রিক স্বয়ংক্রিয়তা আমাদের কৌতুকের কারণ হয়। এর আগে আমরা যে যান্ত্রিকতার উল্লেখ করেছি, তার সঙ্গে অন্যমনস্কতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যযুক্ত যান্ত্রিকতার অস্তিত্বও লক্ষ করার বিষয়। আরও ভাল-

ভাবে ব্যাপারটাকে বুঝতে গেলে লক্ষ করতে হবে যে কোনো হাস্যকর চরিত্র নিজের সম্বন্ধে যত বেশি অনবহিত বা অজ্ঞ ঠিক সেই অনুপাতে সে হাস্যোদ্দীপক। হাস্যকর কোনো চরিত্রের বিশেষত্ব হোল অনেক ব্যাপারে তার সচেতনতার অভাব। সে যেন সারা পৃথিবীর কাছে স্পষ্টত পরিদৃশ্যমান হয়েও নিজের কাছে একেবারে অদৃশ্য। অন্যপক্ষে একজন ট্র্যাজিক নায়ক তাঁর আচার-ব্যবহার ও চরিত্রকে সামান্যমাত্রও বদলাবেন না কারণ তিনি জানেন অপরে কি ভাবে তাঁর বিচার করে; তিনি নিজে কি এবং তাঁর চরিত্রের দোষত্রুটি দর্শকের মনে কি ধরনের ত্রাস সঞ্চার করেছে তা জেনেও তিনি তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে অটুট থাকেন। কিন্তু বাস্তবতঃ দেখা যায় যে হাস্যকর কোন চরিত্র নিজের চারিত্রিক-ত্রুটি সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে শুধরে নিতে অন্তত চেষ্টা করে। তার কার্পণ্য ও লালসা সম্বন্ধে আমাদের বিদ্রূপাত্মক মনোভাব সম্বন্ধে আরপার্গোঁ (Harpagon)[৬] যদি সচেতন হোত, তাহলে সেই সব দোষ থেকে নিজেকে সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত করতে না পারলেও, অন্তত নির্লজ্জভাবে তার লোভ সে আমাদের সামনে কম প্রকাশ করার চেষ্টা করত, কিংবা তা অন্যভাবে তার চরিত্রে প্রকাশ পেত। অন্তত এই ভাবে কৌতুকহাস্য মানুষের আচরণের ত্রুটি সংশোধনে সাহায্য করে, একথা বলা যায়। আমাদের যে রকম হওয়া উচিত কৌতুকহাস্য আপাতরূপে আমাদের সেই-রকম হতে সচেষ্ট করে, আর শেষ পর্যন্ত আমরা হয়তো ঐ রকমের আদর্শ আচরণে সফলও হ'তে পারি।

এই বিশ্লেষণে আর বেশি দূর এগোবার দরকার নেই। কৌতুকহাস্যের নানা পরিস্থিতি আমরা লক্ষ করেছি। হঠাৎ পড়ে-যাওয়া দ্রুতগতি পথিক থেকে শুরু করে দুষ্টুবুদ্ধি লোকের শিকার মানুষটি পর্যন্ত, তার থেকে আবার ভাবে-ভোলা অন্যমনস্ক লোকটির দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করে আমরা চলে গেছি অবাধ উদ্ভাবতার ক্ষেত্রে; পরিশেষে আমরা চরিত্র, আচরণ ও মানসিকতার নানা বিকৃতির উদাহরণ লক্ষ করেছি। এই বিবর্তনের অনুসরণ করতে গিয়ে আমরা দেখেছি কৌতুকহাস্য কি ভাবে ক্রমশ বেশি পরিমাণে মানুষের

চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে আমরা এও দেখেছি কি-ভাবে অতিসূক্ষ্ম প্রকাশপদ্ধতির মধ্যেও কৌতুকহাস্য তার অপেক্ষাকৃত মোটাদানার বা কিছুটা কম সুরুচির প্রকাশভঙ্গীর কিছু বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে। এই বৈশিষ্ট্য হলো মানুষের চরিত্রের যান্ত্রিকতা আর অনমনীয়তা। এখন দূর থেকে একটু অস্পষ্ট আর অগোছালো হলেও মানুষের চরিত্রের হাস্যকর দিকের কিছুটা ধারণা আমরা পেতে পারি, আর সেই সঙ্গে কৌতুকহাস্যের সাধারণ ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে খানিকটা উপলব্ধিও আমাদের আসতে পারে।

জীবন আর সমাজ আমাদের প্রত্যেকের কাছে একটা অতন্দ্র সচেতনতা দাবী করে। আমাদের এই চেতনাই কোন একটা পরিস্থিতির সামগ্রিক রূপ লক্ষ করে। আমাদের দেহের ও মনের নমনীয়তা আর স্থিতিস্থাপকতার সঙ্গে এই চেতনা একাত্ম হয়ে ঐ পরিস্থিতির পরিণতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলতে আমাদের সাহায্য করে। টানা-পোড়েন ও স্থিতিস্থাপকতা (tension et élasticité) আমাদের দেহ ও মনের পক্ষে অত্যাবশ্যক এবং পরস্পর পরিপূরক। এই দুটি ধর্মকে জীবন অনুক্ষণ কাজে লাগায়। আমাদের শরীরে যখন এই দুটি শক্তির অভাব প্রকট হয়, আমরা যাবতীয় অসুস্থতা আর দুর্বলতার শিকার হই, নানা দুর্ঘটনা আমাদের বিপদ ডেকে আনে। যখন মনের দিক থেকেও এই দুই শক্তির দৈন্য আমাদের পীড়া দেয়, আমরা বিবিধ মানসিক দুর্বলতা ও বিকারের দৃষ্টান্ত হয়ে উঠি। অবশেষে, আমাদের চরিত্রের মধ্যেই যখন এই দুই গুণের ঘাটতি পড়ে, তখন আমরা সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেবার অক্ষমতাজনিত একটা গুরুতর ত্রুটির শিকার হয়ে পড়ি এবং এই ত্রুটি শুধু আমাদের নিজের দুর্দশার নয়, অনেক অপরাধেরও কারণ হয়ে পড়ে। আমাদের জীবনের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সবদিকের ওপর প্রভাবশালী এই মানসিক ত্রুটি যখন কেটে যায়, জীবনসংগ্রামে আমরা যত বেশি অংশ নিই, এই হীনতা তত বেশি সংশোধিত আর বিদূরিত হয়—আর তখনই আমরা অন্য দশজন মানুষের সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে সমাজজীবনে অংশ নিতে পারি। সমাজ অবশ্য আমাদের

কাছ থেকে আরও একটা বড় জিনিষ চায় ; মানুষের বেঁচে থাকাই সমাজের পক্ষে যথেষ্ট নয়, সমাজ চায় মানুষ ভাল করে বাঁচুক। আমাদের প্রত্যেকে শুধু অত্যাবশ্যক পার্থিব প্রয়োজনগুলো মিটে গেলেই সন্তুষ্ট হয়ে যাবে—এই ভেবে সমাজ ভয় পায়। সমাজ চায় না মানুষ জীবনের নানা ক্ষেত্রে শুধু অভ্যাসের দাস হয়ে তার গতানুগতিক ব্যবহার বিধিতে অনুগত থেকে যন্ত্রের মত বেঁচে থাকুক। আরও একটা জিনিষকে সমাজ ভয় পায়—যাদের নিয়ে সমাজ গঠিত তাদের মনন প্রক্রিয়া যদি ক্রমশ সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়ে পরস্পরের সঙ্গে অতি সূক্ষ্মের ও গভীরস্তরে যোগসাজসের চেষ্টা না করে, যদি শুধু কতকগুলো মামুলি বোঝাপড়াতেই তুষ্ট হয়, সেটাও সমাজের কাছে একটা বড় রকমের ভীতির কারণ হতে পারে। সামাজিক মানুষদের মধ্যে শুধু কতকগুলো একেবারে পার্থিব প্রয়োজনভিত্তিক সমঝোতাই সমাজচেতনাকে সন্তুষ্ট করতে পারে না ; সমাজ চায় পারস্পরিক সমন্বয় সাধনের জন্য মানুষ অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাক। তাই মানুষের আচরণে, চরিত্রে, এমনকি দৈহিক ক্রিয়াকর্মেও স্থিতিস্থাপকতার যাবতীয় অভাবকে সমাজ সন্দেহের চোখে দেখে, কারণ এই অভাবের ফলে যেমন মানুষের যত রকমের কাজকর্ম কেমন দুর্বল আর ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে বোঝা যায়, তেমনি তার থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে কিভাবে স্থিতিস্থাপকতাহীন চরিত্রে সমাজজীবন থেকে বিচ্ছিন্নতার প্রবণতা ক্রমশ বেড়ে উঠছে ; ফলে যে বিন্দুকে কেন্দ্র করে সমাজ আবর্তিত হয় চরিত্রটি তার থেকে বিচ্যুত অন্য একটা পথে চলে যায়। এক কথায়, এই শারীরিক, মানসিক ও চারিত্রিক স্থিতিস্থাপকতার অভাব ব্যক্তি চরিত্রে উৎকেন্দ্রিকতা এনে দেয়। তবুও এই অবস্থায় ঐ রকম কোন চরিত্রের ক্রিয়াকলাপ, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি ব্যাপারে সমাজ কার্যত কোন বাধার সৃষ্টি করতে পারে না। তার কারণ বাস্তবিক চরিত্রটিও এককভাবে সমাজ-জীবনকে তেমন উল্লেখযোগ্য ভাবে প্রভাবিত করতে পারে না। সমাজ এই চরিত্রকে নিয়ে শুধু অস্বস্তিকর একটা পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। কিন্তু সমাজ থেকে চরিত্রের এই উৎকেন্দ্রিকতা একটা লক্ষণ বা ভঙ্গী নিয়ে আত্ম-প্রকাশ করে—এবং চরিত্রটির এই 'অসামাজিকতা' সমাজের পক্ষে তেমন

কোন ক্ষতি বা হানির কারণ হয় না। এর ফলে সমাজও এই পরিস্থিতির জবাব দেয় কতকগুলো আকার-ইঙ্গিতের সাহায্যে। কৌতুকহাস্যকে তাই এক ধরনের সামাজিক সংকেত (une espèce de geste social) হিসেবে কাজ করতে হয়। তাই ব্যক্তির ব্যবহারিক অসঙ্গতি বা উৎকেন্দ্রিকতাকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য কৌতুকহাস্য তার মনে ভয় বা উদ্বেগের সঞ্চার করে, তাকে অনুক্ষণ তার আচরণের ক্রটি সম্বন্ধে সজাগ করে তোলে, আর তার অনেক গৌণ এবং আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকলাপকে পারস্পরিক ব্যবহারের মধ্যে করে রাখে, অন্যথায় যে-সব ব্যবহারিক আচরণ অভ্যাসের অভাবে সুপ্ত থাকে এবং হয়তো লুপ্ত হয়ে যেতে পারত। এক কথায়, সামাজিক রীতি-নীতির বহিরঙ্গেও যা কিছু যান্ত্রিক এবং নিষ্প্রাণ তাকেও কৌতুকহাস্য মসৃণ ও সৌজন্যমণ্ডিত মানুষী বৈশিষ্ট্য দেয়। কৌতুকহাস্য তাই শুধুই শিল্প বা নন্দনতত্ত্বের সঙ্গে জড়িত নয়, কারণ অজান্তেই (অনেক ক্ষেত্রে নীতিবিগর্হিত ভাবেও বটে) তার দ্বারা সাধারণ সামাজিক উন্নতিসাধক হিতবাদী উদ্দেশ্যও (but utile de perfectionnement général) সাধিত হয়। তবুও কৌতুকহাস্যের মধ্যে কিছুটা নন্দনতাত্ত্বিক বা শিল্পগত বৈশিষ্ট্য অবশ্যই আছে। কারণ, যখন জীবনধারণের যাবতীয় জাগতিক উদ্বেগ থেকে মুক্ত সমাজ ও ব্যক্তি নিজেদের সৌষ্ঠবমণ্ডিত শিল্পকর্মের বিষয় হিসেবে দেখতে চায় শুধু তখনই কৌতুকহাস্যের সৃষ্টি হতে পারে। এক কথায়, সমাজজীবন ও ব্যক্তিসত্তার মধ্যে অন্তর্লীন এই সব ক্রিয়াকলাপ ও মানসিকতাকে কেন্দ্র করে একটা বৃত্ত আঁকা যেতে পারে যার পরিধির মধ্যে স্বাভাবিক কার্য-কারণভিত্তিক পরিণতি থেকেই তাদের শাস্তির সূত্রপাত হয়। অনুভূতি আর দেহমনকে কেন্দ্র করে যে সংগ্রাম তার গণ্ডীর বাইরে একটা নিরপেক্ষ জগৎ আছে যেখানে মানুষ মানুষের কাছে তার দুর্বলতা প্রকাশ করে। এই দুর্বলতার উৎস তার দেহ, মন ও চরিত্রের একটা যন্ত্রসদৃশ অনমনীয়তা। কিন্তু সমাজ চায় তার সদস্যদের মধ্যে এই অনমনীয়তা থাকবে না, কারণ তা থাকলে তাদের কাছে আশানুরূপ মানসিক সাযুজ্য বা সামাজিক মানসিকতা পাওয়া যাবে না। দেহ, মন আর

চরিত্রের এই অনমনীয়তাই কৌতুককর এবং তার নিরাময়ের ওষুধ হোল কৌতুকহাস্য।

তবুও এই সূত্রকেই কৌতুকহাস্যের প্রধান লক্ষণ বলে আমরা ধরে নেবো না। কৌতুকহাস্যের তাত্ত্বিক এবং অবিমিশ্র দৃষ্টান্তগুলির বিশ্লেষণেই সূত্রটিকে প্রয়োগ করা যাবে। তা ছাড়া এই সূত্রটিকে কৌতুকহাস্যের ব্যাখ্যা হিসেবেও আমরা হাজির করতে চাই না। বরঞ্চ আমরা এই সূত্রটিকে কৌতুকহাস্যের যাবতীয় ব্যাখ্যার মূল সুর হিসেবে ব্যবহার করতে চাই, যেভাবে একজন যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ কোন দ্বন্দ্বযুদ্ধে দৈহিক দিক থেকে অনুক্ষণ লিপ্ত থেকেও সমরবিদ্যা শিক্ষার সময় পাওয়া তরবারি ব্যবহার করার যাবতীয় কৌশল মনে রেখে সেগুলিকে প্রয়োজন অনুসারে কাজে লাগান। এবার আমরা সার্কাসের জোকারের ভাঁড়ামো থেকে শুরু করে হাস্যরসের সূক্ষ্মতম শিল্পকর্ম পর্যন্ত কৌতুকহাস্যের যাবতীয় রূপ আমাদের চোখের সামনেই গড়ে তুলবো এবং দেখব এই সূত্রকে কাজে লাগিয়ে আমরা কৌতুকহাস্যের কোন্ কোন্ অচিন্তিত আর অদৃষ্টপূর্ব অলিগলিতে গিয়ে পড়ি। মাঝে মাঝে আমাদের যাত্রাপথের আশেপাশে আমরা চোখ বুলিয়ে নেব এবং যদি পারি এই সূত্রের দোদুল্যমান শেষ-প্রান্ত পর্যন্ত যাব—যে প্রান্তে গিয়ে জীবন আর শিল্পের মধ্যে অপরিহার্য সাধারণ সংযোগ সম্বন্ধে আমরা সচেতন হবো; কারণ আমাদের বিশ্বাস কৌতুকপ্রদ ঘটনাগুলিও জীবন আর শিল্পের মধ্যে একধরনের সেতুবন্ধন করে।

। তিন ।

কৌতুকহাস্যের সরলতম রূপ নিয়েই আরম্ভ করা যেতে পারে। প্রশ্ন করা যাক, কেমন চেহারা দেখলে আমাদের হাসি পায়? কিংবা, কোন মুখাবয়বের কৌতুককর ভাব আসে কোথা থেকে? আরও প্রশ্ন, এইসব ক্ষেত্রে হাস্যকর আর কুৎসিৎ এই দুইয়ের মধ্যে তফাৎটা ঠিক কি রকম? এইভাবে যদি প্রশ্নগুলো রাখা যায় তা হলে প্রত্যেক উত্তরদাতা নিজের

ধারণামত উত্তর দেবেনই। তাই প্রশ্নগুলি শুনতে সরল হলেও, এ-পর্যন্ত সেগুলির সরাসরি কোন নির্ভরযোগ্য উত্তর পাওয়া যায় নি। প্রথমে, অসুন্দর বা কুৎসিৎ কাকে বলে তার একটা সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা খুঁজে বের করতে হবে, তারপর আবিষ্কার করতে হবে কুৎসিৎ কোন জিনিষে আরও কি সংযোজিত হলে তা হাস্যকর হয়ে ওঠে। কিন্তু সমস্যা হোল, সুন্দরের সংজ্ঞা দেওয়ার চেয়ে অসুন্দরের লক্ষণ নিরূপণ করা সহজতর কোন কাজ নয়। যাই হোক্, এই লক্ষণ নিরূপণের চেষ্টায় আমরা এমন একটা উপায় বের করব যা আমাদের প্রায়ই কাজে লাগবে। বলা চলে, সমস্যাটাকে আমরা একটু বাড়িয়ে দেখব, কারণ অসুন্দরের প্রভাবটাকে একটু অতিরঞ্জিত করে দেখলে তার পেছনে নিহিত কারণগুলো সহজে আমাদের নজরে আসে। যেমন ধরা যাক্, কুৎসিৎকে বাড়িয়ে বিকলাঙ্গ করা হোল, তারপর দেখা যাবে বিকলাঙ্গ থেকে কোন্ বিবর্তনের সাহায্যে তাকে হাস্যকর পরিণতি দেওয়া যায়।

কিন্তু, দুঃখজনক হলেও একথাটা সত্য যে মানুষের শরীরের কোন কোন বিকৃতির অন্য কিছু মানুষের মনে কৌতুকবোধকে জাগিয়ে তোলার ক্ষমতা থাকে। যেমন, কোন কোন কুঁজওয়ালা লোককে দেখলেই হাসি পায়। আমরা অঙ্গবিকৃতির অনাবশ্যক খুঁটিনাটি ব্যাপারের মধ্যে যেতে চাই না। পাঠকদের শুধু বিভিন্নরকমের বিকলাঙ্গতার কথা ভাবতে বলবো এবং তাঁদের অনুরোধ করব এই বিকৃতিগুলিকে দুটো শ্রেণীতে ভাগ করতে। এক শ্রেণীতে থাকবে সেই বিকৃতিগুলো যেগুলোকে প্রকৃতিদেবী নিজেই কৌতুকপ্রদ করেছেন ; অন্য শ্রেণীতে থাকবে সেই সব বিকলাঙ্গতা যাদের সঙ্গে কৌতুকহাস্যের কোন সংস্রব নেই। আমার বিশ্বাস এই শ্রেণীবিভাগ থেকে পাঠক এই ধরনের একটি নিয়ম আবিষ্কার করবেন : যে অঙ্গবিকৃতি কৌতুকপ্রদ তা স্বাভাবিক, এবং সুস্থ শারীরিক গঠনসম্পন্ন মানুষ তা অনুকরণ করতে পারেন।

তাহলে কি বলা যায় না যে কুঁজো লোকটিকে দেখলে মনে হয় যে সে ঠিকমত দাঁড়াতে অক্ষম এবং তার পিঠ একটা কুৎসিৎ বক্রতা নিয়েছে?

দেহের একধরনের একঘেঁয়েমির ফলে—যাকে অনমনীয়তা বলা যায়—লোকটি এই বিকৃতিতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। লোকটিকে শুধু দেখার চেষ্টা করুন, এবং বিশেষ করে এই দেহগত বিকৃতির পেছনে কারণ অনুসন্ধান করার চেষ্টা থেকে বিরত থাকুন। আপনার পুরানো সমস্ত সংস্কার এবং পক্ষপাতযুক্ত ধারণা বা চিন্তা ত্যাগ করুন; চেষ্টা করুন একটা সম্পূর্ণ নূতন, সরল অথচ আদিম উপলব্ধিকে আয়ত্ত করার। এর ফলে যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী আপনি অর্জন করবেন, দেখবেন তার চরিত্র হ'বে এই ধরনের: চোখের সামনে এমন একটি লোককে আপনি দেখবেন যে একটা অনমনীয় অঙ্গভঙ্গীতে অবিচল রয়েছে, যার দেহটি হয়ে উঠেছে একটা মূর্তিমান কৌতুক।

যে সমস্যাটির আমরা সমাধান করতে চাই এবারে সেখানেই ফিরে যাওয়া যাক্। একটা হাস্যকর অঙ্গবিকৃতিকে কিছুটা লঘু করে দেখে আমরা একটা কৌতুকপ্রদ অসুন্দরতার সন্ধান পেতে পারি। মানুষের মুখের কোন হাস্যোদ্দীপক ভঙ্গী আমাদের মনে এমন একটা স্থায়ী এবং অপরিবর্তনীয় ভঙ্গীর ছবি এঁকে দেয় যেটা মুখের স্বাভাবিক আর সাবলীল অভিব্যক্তিপূর্ণ চেহারার সঙ্গে একেবারেই বেমানান। একটা দৃঢ়মূল অসুন্দর ব্যাপার, প্রায় চিরস্থায়ী একটা 'ভেংচি' আমাদের সেখানে চোখে পড়ে। আমরা কি বলতে পারি যে মানুষের মুখের যাবতীয় ভাব ও ভঙ্গী সুন্দর আর শোভন হলেও আমাদের ঐ একই ধরনের একঘেয়েমির ধারণা দেয়? কিন্তু এ-ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা দরকার। যখন আমরা কোন অভিব্যক্তিপূর্ণ সৌন্দর্য, এমন কি কোন বিশেষ ভাবব্যঞ্জক অসুন্দর জিনিষ নিয়ে আলোচনা করি, অর্থাৎ কোন মুখকে কোন অনুভূতি বা ভাবের দ্যোতক বলে বর্ণনা করি, হয়তো তারও মধ্যে তখন কোন স্থায়ী জিনিষের সন্ধান পাই—কিন্তু সেখানে আমরা একধরনের গতিময়তার (mobilité) অস্তিত্বও অনুভব করি। তাই সেই স্থিরতার (fixité) মধ্যেও এমন একটা প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হয় যা ব্যক্তিবিশেষের মনের মধ্যে জীবন্ত ও সক্রিয় বিচিত্র নানা অনুভূতি ও চিন্তার অস্তিত্বকে প্রকট করে তোলে। যেমন আগামী দিনের আবহাওয়ার ক্রমবর্দ্ধমান উত্তাপ কখনও কখনও বসন্তের

সকালের কুয়াশার মধ্য দিয়ে সূচিত হয়। কিন্তু হাস্যকর মুখভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য হোল সেখানে যা দৃষ্টিগোচর তার চেয়ে বেশি কিছুর প্রতিশ্রুতি তার থেকে দর্শক পান না। এই মুখভঙ্গী এক বিশেষ রকমের অনন্ত মুখব্যাদানের মত। এখানে আমরা একথাও বলতে পারি যে কোন ব্যক্তির সমগ্র নৈতিক আর মানসিক সত্তা যেন ঐ মুখভঙ্গীর মধ্যে স্থায়ীভাবে ধরা পড়েছে। সেই-জন্যই কোন মুখ যত বেশি এবং সরাসরি এমন কোন যান্ত্রিক ভাব দেখাতে পারে যার মধ্যে ব্যক্তিটির চরিত্র স্থায়ীভাবে ধরা পড়ে, তা ততই হাস্যকর বা কৌতুকাবহ হয়ে ওঠে। কোন কোন মুখভাব দেখলে মনে হয় মুখের মালিক অবিরাম কেঁদেই চলেছে, কোন মুখে আবার সদা-প্রসন্নভাব, কোন মুখ দেখলে মনে হয় লোকটি অনবরত হুইস্‌ল্ বাজাচ্ছে, কোন মুখ আবার সবসময়ে ভেঁপুতে ফুঁ দিচ্ছে বলে মনে হয়। এইসব ক্ষেত্রে সেই নিয়মটি স্বতঃপ্রকাশিত আর প্রমাণিত। অর্থাৎ যে কাজের পেছনে ক্রিয়াশীল কারণকে আমরা যত সহজে আর স্বাভাবিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারব, তা আমাদের কাছে তত বেশি হাসির বলে মনে হবে। যান্ত্রিকতা, জড়তা কিংবা স্থায়ী বক্রতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের ফলেই মানুষের মুখের চেহারা আমাদের মনে কৌতুক জাগায়। কিন্তু কৌতুকহাস্যের পেছনে আমরা যত গভীর কারণ খুঁজে পাই, তার তাৎপর্য তত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে—তখন বোঝা যায় মৌলিক কোন বিষয়ে অনবধাবনতা মানুষের চরিত্রকে কৌতুকহাস্যের ব্যাপার করে তুলেছে, যেন মানুষের মন কোন অতি সাধারণ ঘটনার বস্তু-গত দিক্ দেখে নিজেকে মুগ্ধ, এমন কি সম্মোহিত হ'তে অনুমতি দিয়েছে।

এবারে আমরা ক্যারিকেচার (caricature) বা উপহাসের উদ্দেশ্যে আঁকা বা বর্ণিত কোন ত্রুটির চিত্ররূপের পেছনে ক্রিয়াশীল কৌতুকহাস্যের চরিত্র বুঝতে চেষ্টা করব। কোন মুখের গঠন আপাতভাবে যতই নিখুঁত, তার প্রতিটি রেখা যতই সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং ভাবপ্রকাশের ভঙ্গী যতই সজীব হোক না কেন তা কখনই আসলে ত্রুটিহীন এবং সুসমঞ্জস হতে পারে না। ঐ আপাতসামঞ্জস্যের ভেতর থেকেই কোন একটা বিশেষ প্রবণতা ধরা পড়বে, একটা সম্ভাব্য মুখভঙ্গীর আভাষ চোখে পড়বে এবং ধরা যাবে শেষ

পর্যন্ত এক ধরনের বিকৃতি, যার মধ্যে মানুষের চারিত্রিক আর মানসিক বৈশিষ্ট্য মোটামুটি একটা রূপ নেয়। মুখের এই বৈশিষ্ট্য যতই সূক্ষ্ম আর বাইরে থেকে ধরা কঠিন হোক্ না কেন, তাকে রেখার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলাই কার্টুন শিল্পীর কেরামতি—সেই বৈশিষ্ট্যকে কিছুটা বাড়িয়ে তুলে তিনি সাধারণের কাছে প্রকট করে দেন। কার্টুন বা ক্যারিকেচার শিল্পী তাঁর মডেলের মুখে এমন ভাব বা হাসি দেন যেটা তার মুখে ফুটে উঠত যদি সে মুক্তভাবে মুখভঙ্গী করত এবং তার মনের ভাবকে প্রকাশের শেষ সীমায় নিয়ে যেত। চেহারার আপাত প্রশান্তির পেছনে যে গভীর বিদ্রোহ চাপা থাকে তাকে ঠিকমত রূপ দেওয়াই কার্টুন শিল্পীর লক্ষ্য। প্রকৃতির খেয়ালিপনার মধ্যে যে অসামঞ্জস্য ও বিকৃতি প্রচ্ছন্ন থাকে তাকে তিনি স্পষ্ট করেন—এই বিকৃতি সাধারণতঃ প্রবলতর একটা শক্তির কাছে অবদমিত থাকার ফলে স্বাভাবিক অবস্থায় পুরোপুরি আত্মপ্রকাশ করতে পারে না। তাই কার্টুন শিল্পের মধ্যে দানবীয় (diabolique) একটা ব্যাপার আছে; মানুষের চরিত্রের মধ্যে যে-দানব দেবতার কাছে স্বভাবতঃই হার স্বীকার করে তাকে জাগিয়ে তোলাই কার্টুন শিল্পীর কাজ।

অবশ্যই এই শিল্প অতিরঞ্জনের আশ্রয় নেয়, কিন্তু অতিরঞ্জন করাই তার উদ্দেশ্য একথা বলা ঠিক হবে না। এমন অনেক কার্টুন ছবি আছে যেগুলি চিত্রিত চরিত্রের বাস্তব ঢং-এ আঁকা প্রতিকৃতির চেয়ে তার চরিত্র ও ব্যক্তিত্বকে অনেক বেশী প্রকৃত করে তোলে। এমন অনেক কার্টুন ছবি আছে যার মধ্যে অতিরঞ্জনের ব্যাপারটা প্রায় ধরাই যায় না। আবার অন্যপক্ষে অতিরঞ্জনের আশ্রয় নেওয়া সত্ত্বেও অনেক ছবিতে চিত্রিত ব্যক্তির চরিত্রের আসল কৌতুককর বৈশিষ্ট্য শিল্পীর অনায়ত্ত থেকে যায়। অতি-রঞ্জনের সাহায্যে কোন ব্যাপার বা চরিত্রকে হাস্যোদ্দীপক করে তুলতে হ'লে দেখতে হবে যেন অতিরঞ্জন প্রক্রিয়াটিই শিল্পীর কাজের মূল উদ্দেশ্য বলে মনে না হয়। শিল্পী 'অতিরঞ্জন' পদ্ধতিটিকে একটি সাধারণ উপায় হিসেবে কাজে লাগাবেন—যাতে মানুষের চরিত্র ও আচরণের মধ্যে লক্ষিত বিকৃতি খুব স্পষ্টভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরা যায়। এই চারিত্রিক

বিকৃতির উপস্থাপনাই প্রধান উদ্দেশ্য, ঐ চারিত্রিক অসামঞ্জস্যই চিত্রিত মানুষটি সম্বন্ধে আমাদের আগ্রহকে জাগিয়ে তোলে।

এই কারণেই আমাদের শরীরের যে অঙ্গগুলির স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ গতিশীলতা নেই শিল্পী তাদের মধ্যেই তাঁর অতিরঞ্জনের উপাদান খোঁজেন—কারুর নাকের বাঁকা গড়নের মধ্যে, কারুর আবার কানের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে। কোন বস্তুর আকৃতি সব সময়েই একটা গতিশীলতা আর সাবলীলতার আভাষ দেয়। যে কার্টুন শিল্পী তাঁর শিল্পের সূত্রানুসারে একজনের নাকের আয়তন বাড়িয়ে আঁকেন, অর্থাৎ প্রকৃতিদেবী নিজে যে-ভাবে ঐ নাকটিকে আয়তনে বাড়াতে পারতেন কিন্তু বাড়ান নি, শিল্পীও যদি সেই নিয়ম অনুসরণ করে নাকটিকে বাড়িয়ে আঁকেন তাহলে তিনি ঐ অঙ্গটিকে একটি হাসির জিনিষ করে তোলেন। ঐ কার্টুন ছবিটি দেখার পর আমাদেরও মনে হবে যে আসল নাকটি একটু বেড়ে উঠে ঐ একই ঢং-এ মুখভঙ্গী করছে। ঠিক ঐ অর্থে বলা যায় কার্টুন শিল্পীর সাফল্য অনেক সময়ে প্রকৃতির নিজের কাজকে প্রভাবিত করে। যে নিয়মে প্রকৃতি স্বয়ং মানুষের ঠোঁটে খাঁজ দেন বা কোন লোকের গালকে রোগা ও লম্বা করেন, কখনও বা আবার কারুর চিবুককে গোলগাল করে তোলেন, তা দেখে মনে হয় মানুষের মুখাবয়বকে বিকৃত করার পথে তিনি নিজেও অনেকটা এগিয়েছেন, যেন কোন কোন ব্যক্তির শরীরকে গড়ে তোলার সময় ঠিকমত তদারকি করতে তিনি নিজেই ভুলে গেছেন। কোন কোন মানুষের স্বাভাবিক চেহারাকেই অনেক সময় তার নিজের কার্টুন বলে মনে হয় এবং তখন অতিরঞ্জন ছাড়াই চেহারাটি আমাদের হাসির কারণ হয়।

মোট কথা, আমাদের এই বিশ্লেষণ কৌতুকহাস্য সম্বন্ধে যে চরম সিদ্ধান্তেই পৌঁছুক না কেন, আমাদের মনে এ সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ও ছিমছাম দার্শনিক উপলব্ধি আছে; সমস্ত মানুষী আকৃতির মধ্যে আমাদের কল্পনাশক্তি আমাদের সত্তা বা আত্মার এমন একটা প্রকাশ দেখতে পায় যার দ্বারা আমাদের চেহারার বৈশিষ্ট্য নির্দ্ধারিত হয়। এই সত্তার নমনীয়তার যেমন সীমা নেই, তার চাঞ্চল্য ও গতিময়তাও তেমনি অবিরাম; এই শক্তি

মাধ্যাকর্ষণের কোন নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, কারণ পার্থিব কোন শক্তি তাকে আকর্ষণ করে না। এই আত্মা যে দেহকে সজীব করে তোলে তাতে তার নিজস্ব লঘুতাও সে কিছুটা সঞ্চারিত করে। এইভাবে কোন জড়-বস্তুর মধ্যে বস্তুনিরপেক্ষ একটা শক্তির অনুপ্রবেশ ঘটে, যাকে বলা হয় সৌষ্ঠব বা লাবণ্য। কিন্তু দেহরূপ জড়পদার্থ এই শক্তির বিরোধিতা করে নিজের স্থূলতাকে আঁকড়ে থাকতে চায়। একদিকে যেমন আত্মার অতন্দ্র সচেতনতাকে জড়দেহ আকর্ষণ করে, অন্যদিকে তেমনি এই গরীয়ান আত্মিক সক্রিয়তাকে সে আপন জাড্যের দ্বারা ব্যাহত করে তাকে একটা যন্ত্রসুলভ স্বয়ংক্রিয়তার স্তরে নামিয়ে আনতে চেষ্টা করে। জড়বস্তু চায় দেহের নানা বুদ্ধিদীপ্ত গতিবিধি ও কাজকর্মকে কতকগুলি বুদ্ধিবিহীন গতানুগতিক চাল-চলনের খাতে ফেলে দিতে, চেষ্টা করে মুখাবয়বের নানা অনুভূতিব্যঞ্জক ভাবকেও কতকগুলো একঘেয়ে মুখভঙ্গীতে সীমিত রাখতে—এককথায় মানুষের সমস্ত সত্তায় সে এমন একটা ভাব আরোপ করতে চায় যা দেখলে ধারণা হতে পারে মানুষ মননপ্রক্রিয়াশূন্য কোন যান্ত্রিক-জড়তার মধ্যে ডুবে আছে, অনুক্ষণ চেষ্টা করেও ভেতরের জীবন্ত আদর্শের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধকে প্রাণবন্ত করে জীবনীশক্তির নবায়নের কাজে সে বিফল হয়েছে। দেহের জড়ত্ব যখন এইভাবে আত্মার দেহগত বহিঃপ্রকাশকে নির্জীব করে দিয়ে দেহের চালচলনের মধ্যে একটা প্রাণহীন পাথুরে ভাব এনে তার লাবণ্যকে ম্লান করে দিতে পারে, তখনই সে শরীরের সজীবতাকে নষ্ট করে তার জায়গায় কতকগুলো হাস্যকর বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসে। তা হলে, কৌতুকহাস্যকে ঠিক তার উল্টো জিনিষের সঙ্গে তুলনা করে তার লক্ষণ নির্ণয়ের চেষ্টা করতে হবে, প্রয়োজন হবে সৌন্দর্যের চেয়ে লাবণ্য ও সৌষ্ঠবের সঙ্গে বেশি করে তার তুলনা করার। তাই কৌতুকহাস্যের মধ্যে কুৎসিৎ আর অসুন্দরের চেয়ে জড়ত্ব বা গতিহীনতার প্রভাব অনেক বেশি। অনমনীয়তা সেখানে সৌন্দর্যহীনতার চেয়ে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ।

। চার ।

এবারে আকৃতিগত কৌতুকহাস্যের প্রসঙ্গ থেকে আমরা বিভিন্ন আচার-আচরণ ও গতিবিধিসাপেক্ষ কৌতুকহাস্যের অবতারণা করব। যে-নিয়ম এই ধরনের যাবতীয় ঘটনাকে নিয়ন্ত্রিত করে বলে আমার ধারণা প্রথমেই তার কথা বলি। অবশ্য এর আগে যা কিছু বলা হয়েছে বর্তমান বক্তব্যটি তার থেকেই সহজে অনুমান করা যায়:

> মানুষের দেহের ভাবভঙ্গী, চালচলন আর গতিবিধি আমাদের মনে যত বেশি যান্ত্রিকতার কথা জাগাবে আমাদের কাছে তা তত বেশি কৌতুককর বলে মনে হবে।

এই সূত্রের সরাসরি প্রয়োগ দেখিয়ে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ এখনই আমি করছি না, যদিও এই সূত্রকে প্রয়োগ করার মত অসংখ্য ক্ষেত্র পাওয়া যায়। সরাসরি তাদের পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করতে হলে খুব কাছ থেকে কৌতুকপ্রদ ছবির শিল্পীদের কাজ একটু খুঁটিয়ে অনুশীলন করলেই কাজ হবে। তার জন্যে অবশ্য কার্টুন জাতীয় ছবিকে এখনকার মত একপাশে সরিয়ে রাখতে হবে, কারণ তার বিশেষ একটা ব্যাখ্যা আমরা একটু আগেই দিয়েছি। সেই সঙ্গে চিত্রশিল্পের সঙ্গে সাদৃশ্য নেই এমন কোন হাস্যকর ব্যাপারকেও আমরা এখন আলোচনার মধ্যে আনব না। ভুললে চলবে না যে কোন ছবিতে যে-ধরনের হাসির উপাদান থাকে তা প্রায়ই ধার করা এবং সাহিত্যিকও এ-ধরনের হাসিকে প্রায়ই তাঁর শিল্পে ব্যবহার করেন। আমার বক্তব্য চিত্রশিল্পী একজন বিদ্রূপাত্মক শিল্পের স্রষ্টা হিসেবে তাঁর নিজের আঁকা ছবি ব্যবহার করতে পারেন, এবং শুধু ছবি হিসেবে দেখলে অর্থাৎ অঙ্কন শিল্পে দক্ষতার নিরিখে ছবিগুলির বিচার করলে সেগুলির হাস্যকরতা কম বলে মনে হতে পারে। অপরপক্ষে, আমরা যদি শিল্পীর আঁকবার ক্ষমতার দিকে মন না দিই, তা হলে ঐ ছবির মধ্যে শিল্পী যত পরিষ্কার-ভাবে এবং জ্ঞানতঃ চিত্রিত মানুষটির মাধ্যমে একটি সবাক এবং চলন্ত পুতুলের ধারণা সৃষ্টি করতে সমর্থ হবেন আমরা তাতে তত বেশি কৌতুক-হাস্যের খোরাক পাব। অর্থাৎ এখানে 'পাপেট্' বা পুতুলনাচের পুতুলের

ভাবটা চিত্রিত চরিত্রের মধ্যে প্রকট হওয়া দরকার। যেন চরিত্রটির মধ্যে যন্ত্রের জোড়ালাগানো ভাবটি বেশ পরিপাটি আর স্বচ্ছভাবে আমাদের চোখে ধরা পড়ে। মানুষটির মধ্যে ক্রিয়াশীল কতকগুলি যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য যেন আমাদের কাছে খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেন কাচের মত স্বচ্ছ একটা আবরণ ভেদ করে তার ভেতরকার বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা সহজে লক্ষ্য করতে পারি। কিন্তু সেই সঙ্গে দৃষ্টি রাখতে হবে যেন ঐ যান্ত্রিকতার ইঙ্গিত খুব সূক্ষ্মতা ও সংযমের সঙ্গে প্রকাশ পায়, যেন তার বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের প্রকাশ সাবলীলতা ও স্বাচ্ছন্দ্যবর্জিত হলেও চরিত্রটি একটা পুরোপুরি জীবন্ত আর স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। একদিকে একজন স্বাভাবিক মানুষের চরিত্র আর অন্যদিকে আভ্যন্তরীণ স্বাচ্ছন্দ্যবর্জিত যান্ত্রিকতা—এই দুই বিরোধী জিনিষের ইঙ্গিত যতই পরস্পরের সঙ্গে ওতপ্রোত ও একাত্ম হয়ে মিশে যাবে তার থেকে উদ্ভূত কৌতুকহাস্যের চরিত্র ততই আমাদের কাছে প্রীতিপ্রদ হয়ে উঠবে এবং শিল্পকর্মটি ততই আমাদের কাছে গ্রহণীয় বলে মনে হবে। প্রত্যেক কৌতুকাবহ চরিত্রের স্রষ্টার শিল্পীহিসেবে অভিনবত্ব এবং মৌলিকতা নির্ণীত হয় পুতুলের মধ্য দিয়ে তিনি জীবনের কোন বিশেষ দিককে কতখানি সাফল্যের সঙ্গে আমাদের কাছে হাজির করতে পেরেছেন তার দ্বারা।

এই সূত্রের তাৎক্ষণিক প্রয়োগের ব্যাপারটা আমি সরিয়ে রাখছি, এখন শুধু তার সুদূরপ্রসারী ফল আর প্রভাব সম্বন্ধে কিছু অনুসন্ধানের চেষ্টা করব। চরিত্রের মধ্যে সক্রিয় যান্ত্রিকতা (automatisme) এমনই একটি ব্যাপার যা অসংখ্য হাস্যকর প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিতে পারে। কিন্তু বেশির-ভাগ সময়ে মাত্র নিমেষের জন্য এই যান্ত্রিকতার দেখা পাওয়া যায়, এবং তার ফলে যে হাসির উদ্রেক হয় মুহূর্তের মধ্যে তারও বিলোপ ঘটে। তাকে স্থায়ী করতে গেলে বিশ্লেষণ ও মননের সাহায্য নিতে হয়।

কোন পেশাদারি বক্তার মুখের কথার সংগে সমানে চলে তার অঙ্গভঙ্গী। যেন তার বক্তৃতার ক্ষিপ্রতায় ঈর্ষ্যান্বিত হয়ে তার বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গী তার চিন্তার পেছনে ধাওয়া করে এবং বক্তার মানসিক অবস্থাকে বিশদ করতে চায়। কিন্তু চেষ্টা সত্বেও বক্তার চিন্তার জটিল বিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্যে

প্রবেশ করা কি অঙ্গভঙ্গীর পক্ষে সম্ভবপর ! বক্তৃতাকালে বক্তার চিন্তাস্রোত স্বতঃবর্দ্ধমান একটা ব্যাপার—তা ফুল থেকে ফলে, ফল থেকে রসাল পক্বতার দিকে ভাবণের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নানা স্তর ভেদ করে বিবর্তিত হতে থাকে। বক্তৃতা দেওয়ার সময় বক্তার চিন্তার প্রবাহ কখনও থামে না, কখনও পুনরাবৃত্তির চক্রে বাঁধা পড়ে না। তার ধর্মই হোল মুহূর্তে মুহূর্তে বদলানো, আর এই পরিবর্তন থেমে যাওয়া মানেই হোল তার জীবনের অবসান ঘটা। তাই বক্তার অঙ্গভঙ্গীও চায় তার চিন্তার স্রোতের মত নিজেকে সজীব করে রেখে প্রতিষ্ঠা দিতে। সেও চায় জীবনের মৌলিক নিয়ম অনুসারে কোন বিশেষ অঙ্গভঙ্গীর পুনরাবৃত্তি না করতে। কিন্তু বাস্তব-ক্ষেত্রে দেখা যায় বক্তার মাথার বা হাতের কয়েকটি ভঙ্গী বারবার একই-ভাবে ফিরে ফিরে আসে। শ্রোতা হিসেবে যদি আমরা এই ব্যাপারটি লক্ষ করি, ব্যাপারটি যদি বক্তার বক্তব্য বিষয় থেকে আমাদের মনকে বিক্ষিপ্ত করে, যদি বক্তৃতা চলা কালে আমরা ঐ অঙ্গভঙ্গী বা হাত নাড়ার পুনরা-বৃত্তির অপেক্ষা করি এবং অপেক্ষা করার সময় ঐ অঙ্গভঙ্গী বা হস্তচালনার আবার যদি আবির্ভাব হয় তাহলে নিজের থেকেই আমাদের হাসি আসে। কেন হাসি আসে ? আসে কারণ আমাদের সামনের মানুষটির মধ্যে আমরা একটা যন্ত্রের অস্তিত্ব দেখতে পাই। মানুষটির আচরণে যান্ত্রিক কিছু বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। এখানে কোন জীবন্ত মননশীল মানুষের বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে না, শুধু দেখা যায় জীবন্ত রক্তমাংসের তৈরি একটা মানুষের মধ্যে স্থাপিত একটা যন্ত্র জীবনের অনুকরণ করছে। এই ব্যাপারটিই হোল আমাদের হাসির কারণ।

এই একই কারণে যে-সব অঙ্গভঙ্গীকে আমরা সাধারণতঃ হাস্যকর মনে করি না, সেগুলিও আমাদের কাছে হাসির হয়ে ওঠে, যখন দেখি কেউ অন্য একজনের স্বাভাবিক অঙ্গভঙ্গীর অনুকরণ করছে। এই অতি সরল ব্যাপারের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনেক সময় বহু জটিল তত্ত্বের আশ্রয় নেওয়া হয়। কিন্তু একটু ভাবলেই বোঝা যায় যে প্রতি মুহূর্তেই আমাদের মনের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং যদি দেহের ভাবভঙ্গী মনের এই সদা পরিবর্তনশীল

অবস্থার অনুসরণ করে এবং যদি এই মানসিক অবস্থা আমাদের শারীরিক চালচলনেও সঞ্চারিত হয় তাহলে এই সব অঙ্গভঙ্গী কখনও যান্ত্রিকভাবে একই জিনিষের পুনরাবৃত্তি করবে না। ফলে যাবতীয় অনুকরণ সব সময়ে পরিবর্জিত হবে। কিন্তু যে মুহূর্তে আমরা আমাদের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে স্বকীয়তাবর্জিত হয়ে উঠি, তখনই আমরা হাসির পাত্রে পরিণত হই। আমার বক্তব্য হলো আমাদের প্রত্যেকের যে অঙ্গভঙ্গীতে যান্ত্রিক একঘেয়েমি বা পুনরাবৃত্তির স্পর্শ আছে সেইটুকুই অপরের দ্বারা অনুকৃত হতে পারে। আর সেই ভাবভঙ্গীগুলিই আমাদের ব্যক্তিত্বের জীবন্ত স্পর্শ থেকে বঞ্চিত। মানুষের চরিত্রে যতটুকু যান্ত্রিকতার অনুপ্রবেশ ঘটেছে, ঠিক ততটুকুই অনুকরণ করা যায়। ঐ কারণেই বলা যায় যে তার চরিত্রের ঐ যান্ত্রিকতা-দুষ্ট অংশটুকুই হাস্যোদ্দীপক। তাই, অনুকরণ দেখলে যে আমাদের হাসি আসে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

আমরা বলতে চাই যে আমাদের যে সব হাবভাব আর অঙ্গভঙ্গীর মধ্যে যন্ত্রের বৈচিত্র্যহীনতা ও একঘেয়েমি আছে সেগুলিকেই আমরা কৌতুক-সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অনুকরণ করতে পারি, কারণ ঐ একঘেয়েমি ব্যাপারটাই আমাদের জীবন্ত ব্যক্তিত্বের একেবারে বিরোধী। কাউকে অনুকরণ করার মানেই হোল ঐ অনুকৃত লোকটি তাঁর চরিত্রের মধ্যে যে যান্ত্রিকতা ঢুকতে দিয়েছেন তাকেই আলাদা করে দেখানো। এবং যেহেতু এই ব্যাপারটাই যে কোন লোকের হাস্যকরতার গোপন রহস্য সেই জন্যই অনুকরণ ব্যাপারটাই যে আমাদের কৌতুকবোধকে জাগায় তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

তবুও, অপরের অঙ্গভঙ্গী বা মুদ্রাদোষের অনুকরণ যদি স্বভাবতই হাস্যকর হয়, তা হলে সেই ভঙ্গীকে একেবারে বিকৃত না করে শুধু সামান্য একটু অতিরঞ্জনের সাহায্যে তার মধ্যে যান্ত্রিকতার আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে যদি অনুকরণ প্রযুক্ত হয় তবে তা আরও বেশি হাসির খোরাক জোগায়—যেমন করাত দিয়ে কাঠ কাটা, কিংবা কামারের নেহাই-এর ওপর অবিরাম হাতুড়ির আঘাত, কিংবা কাল্পনিক কোন ঘণ্টার দড়ি ধরে এক নাগাড়ে টানা, ইত্যাদি। স্থূল ভাঁড়ামো বা অশালীন ক্রিয়াকলাপ হাস্যরসের একমাত্র

উৎস নয়, যদিও নিশ্চিতরূপে তার থেকে হাস্যরসের কিছু উপাদান পাওয়া যায়। বরঞ্চ কোন ভঙ্গী কোন অতি সরল ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত থেকেও যদি ইচ্ছাকৃতভাবে যান্ত্রিক বলে মনে হয় তবে তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাসির উদ্রেক করতে পারে। এই ধরনের যান্ত্রিকতার ব্যাখ্যা প্যারডি (parodie) জাতীয় বিদ্রূপাত্মক রচনার একটি অতি প্রিয় পদ্ধতি হতে পারে। আমরা অনুমানের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে এসেছি, কিন্তু আমার বিশ্বাস নাটকের বিদূষক কিংবা সার্কাসের জোকার তার স্বভাবলব্ধ ক্ষমতা দিয়েই এই সত্য বোঝে।

পাসকাল[৭] (Pascal) তাঁর চিন্তাবলী (Pensées)[৮] নামক রচনায় যে ছোট্ট ধাঁধাটির প্রস্তাব করেছিলেন আমার মনে হয় এইটেই তার সমাধান। "একই দেখতে দুটি মুখের কোনটি এককভাবে আমাদের হাসি জাগায় না, কিন্তু দুটিকে যখন একই সঙ্গে দেখা যায়, তাদের সাদৃশ্য আমাদের হাসায়।" ঠিক একইভাবে আমরা বলতে পারি, "কোন বক্তার বক্তৃতা দেবার সময় নানা অঙ্গভঙ্গীর মধ্যে কোনটিই আলাদাভাবে দেখলে হাস্যকর না হলেও, যখন বক্তৃতার সময় কতকগুলি ভঙ্গী ফিরে ফিরে আসতে থাকে, তখন সেগুলি আমাদের কাছে হাসির বলে মনে হয়"। এর কারণ হোল, যেখানে প্রকৃত জীবন আছে সেখানে পুনরাবৃত্তি নেই। কিন্তু যেখানে পুনরাবৃত্তি থাকে, একই জিনিষ যেখানে অনুকৃত হয় সেখানেই আমাদের সন্দেহ হয় আপাতরূপে জীবন্ত মানুষের মধ্যেও কোন যান্ত্রিকতা সক্রিয়। একই দেখতে দুটো মুখের সামনে দাঁড়িয়ে আপনার প্রতিক্রিয়া কেমন হয় তা নিরূপণ করার চেষ্টা করুন। দেখবেন, মনে হবে দুটো মুখই যেন কোন ছাঁচে ফেলে তৈরি; নয়তো বা মনে হবে একই শীলমোহরের দুটো ছাপ; কিংবা একই নেগেটিভের দুটো প্রিন্ট। মোটকথা তাদের মধ্যে সাদৃশ্যের আতিশয্য দেখে কোন একটা যান্ত্রিক শিল্পপদ্ধতির কথা আপনার মনে আসবে। যান্ত্রিকতার দিকে জীবনের এই প্রবণতাই এখানে আমাদের কৌতুকবোধের আসল কারণ।

যদি পাসকাল-বর্ণিত একই চেহারার মাত্র দুজন লোকের জায়গায় একই ঢং-এর বেশি সংখ্যায় মানুষকে মঞ্চের ওপর জড়ো করা যায়, যদি অবিকল

এক চেহারার অসংখ্য লোক একই সঙ্গে চলাফেরা, নাচানাচি, ঝগড়া-মারামারি করে, আবার কখনও এক সঙ্গে একই ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থাকে বা হাত নাড়ে, দেখা যাবে আমাদের হাসি আরও প্রবল হয়েছে। এ-ক্ষেত্রে ওদের দেখে আমাদের মনে পড়বে পুতুলনাচের পুতুলগুলোর কথা। আমাদের মনশ্চক্ষে ভেসে উঠবে অদৃশ্য সুতোয় বাঁধা কতকগুলো পুতুলের ছবি—তারা হাত ধরাধরি করে, পায়ের তালে তাল মিলিয়ে, একজনের মুখের পেশীর সঙ্গে, অন্যসকলের মুখের পেশীর হুবহু সাদৃশ্য বজায় রেখে নড়ছে-চড়ছে। তাদের মধ্যে এই অদ্ভুত সাদৃশ্য সম্ভব হয় কারণ তারা সকলেই একটা অদৃশ্য সুতোর সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। তাদের মধ্যে এই অপরিবর্তনীয় সাদৃশ্য আমাদের চোখের সামনেই তাদের প্রত্যেকের আকৃতি-গত স্থিতিস্থাপকতাকে (elasticité) নষ্ট করে তাদের কয়েকটা অনমনীয় (raide) স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক পুতুলে রূপান্তরিত করে। খানিকটা মোটা জাতের প্রমোদের (divertissement un peu gros) পেছনে এই ধরনের পদ্ধতি কাজ করে বলে আমার ধারণা। যাঁরা এই জাতের প্রমোদ পরিবেশন করেন তাঁরা পাসকালের রচনা পড়েছেন কিনা জানি না, কিন্তু পাসকালের উক্তির মধ্যে যে ব্যঞ্জনা রয়েছে তাঁদের প্রমোদ পরিবেশন পদ্ধতির মধ্যে তা পরিপূর্ণ-ভাবে বাস্তবায়িত হয়। সন্দেহ নেই যে এই দ্বিতীয় উদাহরণটিতে যান্ত্রিক-তার উপলব্ধির মধ্যেই হাসির কারণ নিহিত, এবং আর একটু সূক্ষ্মভাবে হলেও প্রথম দৃষ্টান্তগুলিতেও আমাদের কৌতুকবোধের কারণ ঐ একই, অর্থাৎ মানুষের ব্যবহারে যন্ত্রসুলভ চিন্তাহীনতার প্রভাব।

তা হলে অনুসন্ধানের এই পথ অনুসরণ করে একটু অস্পষ্টভাবে হলেও আমরা এর আগে উল্লেখ করা নিয়মটির গুরুত্ব বুঝতে পারি। শুধু মানুষের অঙ্গভঙ্গীর মধ্যে নয়, তার অন্যান্য অনেক কাজকর্ম ও চিন্তাপদ্ধতির মধ্যেও এই যান্ত্রিকতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা সচেতন হই। আমরা বুঝতে পারি যে কৌতুককর কোন কাহিনী বা নাটকে ব্যবহৃত নানা ধরনের শৈলী, যেমন নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে কোন বিশেষ সংলাপ বা দৃশ্যের ব্যবহার; ঠিক সামঞ্জস্য রেখে কোন ঘটনা বা চরিত্রের বিপরীতধর্মী অবতারণা; কিংবা

প্রায় জ্যামিতিক পরিস্থিতির সঙ্গে প্রহসনধর্মী কোন ঘটনার ব্যবহার ইত্যাদি —এ-সবের দ্বারা উদ্ভূত কৌতুকবোধ ঐ একই উৎস থেকে বেরিয়ে আসে। হাস্যরসের সৃষ্টি করতে গিয়ে নাট্যকার যেন আমাদের বোঝাতে চান যে আমাদের সমাজজীবনে সুস্পষ্ট একটা যান্ত্রিকতা অনুক্ষণ কাজ করে চলেছে, যদিও সেই সঙ্গে ঘটনা ও চরিত্রগুলির বহিরঙ্গে তিনি সম্ভাব্যতার একটা প্রলেপ লাগিয়ে রাখেন যাতে এই সব হাস্যকর পরিস্থিতির মধ্যেও জীবনের সাবলীলতা ও স্বাভাবিক প্রবাহবোধ অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু বিশ্লেষণের দ্বারা যে ফল আমাদের আয়ত্তে আসবে, আগে থেকেই পাঠকদের তার আঁচ দেওয়া বোধ হয় ঠিক হবে না।

। পাঁচ ।

আর বেশিদূর এগোবার আগে একটু থেমে চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক। এই অনুসন্ধানের শুরুতেই আমরা বলেছি যে শুধু একটা মাত্র সহজ ও সরল কারণের মধ্যে বিভিন্ন জাতের কৌতুকহাসির উৎস খোঁজা মায়ামৃগের পেছনে ছোটার সামিল হবে। এক অর্থে কৌতুকহাস্যের একটা মৌল নীতি বা সূত্র অবশ্যই আছে, কিন্তু তার বিবর্তন এবং প্রসরণ নিশ্চয়ই একটি মাত্র সোজা বা ঋজু পথে সম্ভবপর হয় না। অর্থাৎ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমাদের মাঝে মাঝে থামতে হবে, দেখতে হবে ঐ পর্যন্ত আমরা কোন্ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি এবং তাকে কেন্দ্র করে সমকেন্দ্রিক, অনুরূপ অথচ অভিনব কোন্ কোন্ চিন্তাবৃত্ত আমাদের অনুসন্ধানের পথে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই নতুন ভাবনাগুলো একই মৌল সূত্র থেকে না বেরোলেও সেগুলিও কৌতুকপ্রদ, কারণ সেগুলিও কৌতুকহাস্যের কেন্দ্রীয় সূত্রের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। পাসকাল থেকে আর একবার উদ্ধৃতি দিয়ে বলা যায় যে এই পদ্ধতিকে জ্যামিতির সেই বক্ররেখার সঙ্গে তুলনা করা যায় যাকে তিনি roulette বা cycloid বলে বর্ণনা করেছেন। সরলরেখায় ধাবমান কোন চাকার পরিধিতে অবস্থিত একটি বিন্দু যে বক্ররেখার সৃষ্টি করে তারই সঙ্গে এই অনুসন্ধান পদ্ধতির তুলনা হ'তে পারে। বিন্দুটিও চাকার সঙ্গে

আবর্তন করে, যদিও সেই সঙ্গে সারা শকটটির মত সেও সামনের দিকে সরলরেখায় এগুতে থাকে। কিংবা আমরা ভাবতে পারি প্রশস্ত আর দীর্ঘ একটা রাজপথের কথা, যে-ধরনের রাজপথ ফোঁত্যানব্লোর[১] (Fontainbleau) অরণ্য মধ্যে দেখা যায়, যার মাঝে মাঝে চৌমাথা চোখে পড়ে। এই রকম প্রত্যেকটি চৌমাথায় পৌঁছে তার দুপাশের রাস্তাগুলো একবার ভাল করে লক্ষ করে আমরা আবার সামনের দিকে অগ্রসর হবো। বলা যায়, এতক্ষণ আলোচনার পর আমরা আমাদের মূল চিন্তাপথের একটা চৌমাথায় পৌঁছেছি—এই চৌমাথায় এসে আমরা দেখতে পাচ্ছি জীবন্ত মানুষের চরিত্রের ওপর যান্ত্রিক অনমনীয়তার একটা আবরণ। এখানে আমাদের কিছুক্ষণ থামতে হবে—কারণ এটা একটা মৌলিক ও কেন্দ্রীয় চিত্রকল্প (image centrale) যার থেকে আমাদের চিন্তা আর কল্পনাবৃত্তি নানা দিকে প্রসারিত হয়। এখন প্রশ্ন, এই নানা দিকগুলি কি ? আমার ধারণা তিনটি প্রধান পথে আমাদের চিন্তা পরিচালিত হয়। একটির পর একটি সেই তিনটি চিন্তাপথের আমরা অনুসরণ করব, তারপর আবার সামনের প্রশস্ত রাজপথ ধরে এগুবো।

এক : প্রথমে যান্ত্রিক ও জীবন্ত এই দুই পরস্পরবিরোধী শক্তির একের অপরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হওয়ার ব্যাপারটি আমাদের মনে অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট একটা চিত্রকল্পের সৃষ্টি করে। সেটি হোল, জীবনের গতিময়তা ও স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে কৃত্রিমতার উদ্ভবকারী যে-কোন ধরণের অনমনীয়তা। কিংবা অপটু বা আনাড়ি ভাবে (maladroitement) জীবনরেখাকে অনুসরণ আর তার সাবলীলতাকে অনুকরণের চেষ্টা। এখন আমরা বুঝতে পারি মানুষের ব্যবহার করা কোন পোষাক কত সহজে হাস্যকর হয়ে উঠতে পারে। এমন কথাও বলা যেতে পারে যে যে-কোন ফ্যাশন (toute mode) কোন না কোন দিক থেকে হাসির ব্যাপার হ'তে পারে। শুধু, যখন আমরা চলতি পোষাক-পরিচ্ছদের কথা ভাবি তখন আমরা তার সঙ্গে এত একাত্ম হয়ে পড়ি যে পোষাক ও পরিধাতাকে আমরা স্বাভাবিক এবং অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কযুক্ত বলে মনে করি। আমাদের কল্পনাও তাদের আলাদা করতে

পারে না। একদিকে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন পোষাকের নিষ্প্রাণ জাড্য এবং অন্যদিকে তার পরিধানকারীর শরীর ও ব্যক্তিত্বের সাবলীলতার মধ্যে বিরোধের চিন্তা ঐ মুহূর্তে আমাদের মনে আসে না। ফলে হাসির সম্ভাবনা ঐ সময় অনেকটা সুপ্ত অবস্থায় থাকে। যখন পোষাকের আবরণ এবং তার দ্বারা আবৃত মানুষের দেহের মধ্যে স্বাভাবিক অসামঞ্জস্য তাদের দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠতা সত্বেও প্রকট হয়ে ওঠে তখনই এই সুপ্ত কৌতুকবোধ জেগে ওঠে। আমাদের মাথার টুপিও এই তত্ত্বের একটা বাস্তব দৃষ্টান্ত। কিন্তু এমন কোন খেয়ালি মানুষের কথা ভাবা যাক্ যিনি আজকের যুগেও পুরানো যুগের পোষাক পরে চলাফেরা করতে চান। এক্ষেত্রে স্বভাবতঃই আমাদের দৃষ্টি তাঁর পোষাকের দিকে আকৃষ্ট হবে, এবং পোষাক ও তার ভেতরের মানুষটির মধ্যে প্রকট হয়ে পড়া বিরোধ দেখে আমরা বলব যে ভদ্রলোক এক উদ্ভট ছদ্মবেশ ধরেছেন (যে-কোন পোষাকই কি এক ধরনের ছদ্মবেশ নয় ?) এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিচ্ছদের মধ্যে হাস্যকর ব্যাপারটা প্রচ্ছন্ন অবস্থা থেকে বুদ্ধির আলোকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

এইভাবে আমরা কৌতুকহাস্যের তত্ত্বের পেছনে নিহিত দুরূহ নানা সমস্যার মধ্যে কতকগুলোর মুখোমুখি হতে শুরু করি। যে কারণগুলো কৌতুকহাস্যের উৎস সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ও অসম্পূর্ণ তত্ত্বের জন্ম দিয়েছে তার একটা হোল, অনেক জিনিস আসলে হাস্যকর হয়েও বাস্তবক্ষেত্রে আমাদের কৌতুকবোধ জাগায় না কারণ বহুদিনের অভ্যাস ও অন্তরঙ্গতার ফলে সেই ব্যাপারগুলো আমাদের কাছে আর অদ্ভুত বা বিকট বলে মনে হয় না। সেই ব্যাপারগুলোর মধ্যে যে হাস্যকরতা আছে তাকে প্রকট বা স্পষ্ট করে তুলতে হলে ব্যবহারিক বা ফ্যাশনের জগৎ থেকে তাদের আবার সরিয়ে ফেলতে হবে। তাই যদিও অনেকের ধারণা ব্যবহারিক জগৎ থেকে বিচ্ছেদই হোল হাস্যকৌতুকের কারণ, প্রকৃতপক্ষে এই বিচ্ছেদ শুধু বস্তুবিশেষের হাস্যকর স্বরূপকে আমাদের চোখে প্রকট করে তোলে, তার চেয়ে বেশি কিছু করে না। হয়তো অনেকে অপ্রত্যাশিত কারণজনিত বিস্ময় (la surprise) কিংবা তারতম্যগত তুলনার (le contraste) ভিত্তিতে কৌতুকহাস্যের উৎস নির্ণয়

করতে চাইবেন ; কিন্তু বিস্ময় ও তারতম্য এই জিনিস দুটি হাস্যোদ্দীপক নয় এমন অনেক ব্যাপারেরও ব্যাখ্যা করতে পারে। আসল কারণটা তাই এত সহজ ও সরল নয় বলেই আমার বিশ্বাস।

এর আগে আমরা ছদ্মবেশের উল্লেখ করেছি, এবং দেখা গেছে যে তার মধ্যে আমাদের হাসাবার একটা সহজ ক্ষমতা আছে। কি কি উদ্দেশ্যে ছদ্মবেশ ধারণ করা হয় তা খুঁটিয়ে দেখার চেষ্টা নিরর্থক বা অপ্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে হয় না।

প্রশ্ন করা যায়, কারুর হালকা রং-এর চুল হঠাৎ কালো কিংবা ঘন খয়েরি রং ধরলে আমাদের হাসি আসে কেন ? খুব লাল রং-এর নাক দেখলেই বা কেন আমরা কৌতুক বোধ করি ? কিংবা কোন নিগ্রোর চেহারাই বা কেন আমাদের কৌতুকবোধকে জাগায় ? প্রশ্নগুলো সত্যিই একটু অস্বস্তিকর কারণ একার (Hecker)[10] ক্র্যাপ্‌লাঁ (Kraepelin)[11] এবং লিপ্‌স্ (Lipps)[12] এর মত বাঘা বাঘা মনস্তত্ত্ববিদ্ ঘুরে ফিরে এই প্রশ্নগুলোই তুলেছেন এবং তাঁদের প্রত্যেকেই সেগুলোর আলাদা আলাদা উত্তর দিতে চেয়েছেন। তবুও আমার বিশ্বাস যে একজন অতি সাধারণ কোচম্যান এই প্রশ্নগুলির মধ্যে অন্ততঃ একটির সদুত্তর দিয়েছিল যখন সে এক নিগ্রো আরোহীকে 'না ধোয়া' আরোহী বলে বর্ণনা করেছিল। 'না ধোয়া' কথাটা শুনলেই কি আমাদের ধারণা হয় না যে নিগ্রোর কৃষ্ণবর্ণ মুখে কালি কিংবা ঝুলের একটা আস্তরণ রয়েছে ? তেমনি খুব বেশি লাল রং-এর কোন নাক দেখলে আমাদের মনে হতে পারে ঐ নাকের ওপর কেউ একপোঁচ সিঁদুর মাখিয়ে দিয়েছে। এইভাবে যেখানে সত্যিকারের ছদ্মবেশের কোন অবকাশ নেই, অর্থাৎ নিগ্রোর স্বাভাবিক কালো রং কিংবা স্বাভাবিক্ লাল রং-এর নাকবিশিষ্ট মুখ, তাও আমাদের মনে ছদ্মবেশ থেকে উদ্ভূত কৌতুকহাস্যের অনুরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। তাই আগের দৃষ্টান্তগুলিতে দেখা যায় যে মানুষ ও তার বেশভূষা পরস্পরের থেকে আলাদা হলেও আমরা তাদের অবিচ্ছেদ্য মনে করি কারণ মানুষকে ঐ বেশে দেখতে আমরা অভ্যস্ত। এবার কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে নিগ্রোর গায়ের কালো রং এবং উল্লিখিত

নাকের লাল রং ত্বক্ থেকে অনপনীয় হলেও আমাদের ধরণা হয় দুটো রংই যেন কৃত্রিম। তাদের যেন বাইরে থেকে চামড়ার ওপর লেপে দেওয়া হয়েছে, এবং চোখ ঐ রং দেখতে অনভ্যস্ত হওয়ার ফলে যে বিস্ময়ের সঞ্চার হয় তার থেকেই আমাদের কৌতুকবোধ জেগে ওঠে।

সত্যি এর থেকেই হাস্যরসের সূত্র (Theorie) সম্বন্ধে আরও কয়েকটি অভিনব সমস্যা আমাদের সামনে এসে পড়ে। যেমন ধরুন 'আমাদের অভ্যস্ত পোষাক আমাদের দেহের অংশ বিশেষ', এই ধরনের কোন বক্তব্য যুক্তির দিক থেকে দেখলে একেবারেই অর্থহীন। কিন্তু কল্পনার চোখে দেখলে কথা-টাকে সত্যি বলেই মনে হয়। যে যুক্তি আমাদের বিচার করতে শেখায় তার কাছে 'লাল রং-এর নাক মানে লাল রং করা নাক', কিংবা 'একজন নিগ্রো আসলে একজন ছদ্মবেশী শ্বেতাঙ্গ' এ-ধরনের চিন্তা একেবারেই উদ্ভট; কিন্তু সাদামাটা কল্পনার কাছে কথাগুলো প্রায় অকাট্য সত্য। অর্থাৎ কল্পনার নিজের একটা যুক্তি আছে যেটা বুদ্ধিবৃত্তির কাছে যুক্তিসম্মত বা গ্রাহ্য নয়; এই কল্পনার যুক্তি কখনও কখনও শুদ্ধ যুক্তিরও বিরোধিতা করে; কিন্তু তাই বলে দর্শনশাস্ত্র তাকে উড়িয়ে দিতে পারে না। শুধু কৌতুকহাস্যের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নয়। ঐ ধরনের যে-কোন অনুসন্ধানের কাজে এ-কথা প্রযোজ্য। এ যেন খানিকটা স্বপ্নের জগতের যুক্তির মত; কিন্তু এই স্বপ্নের জগৎ কোন ব্যক্তিগত খেয়ালখুশির ওপর নির্ভর করে না, তাও দাঁড়িয়ে আছে পুরো একটা সমাজের অভিজ্ঞতার ওপর। এই অন্তর্লীন যুক্তিকে নতুন করে গড়ে তুলতে হলে একটা বিশেষ ধরনের প্রয়াসের দরকার যাতে আমরা আমাদের অনেক দিনের চেষ্টায় সঞ্চিত এবং স্তরীভূত নানা বিচারবোধ এবং ধারণার বাইরের আবরণটা তুলে ফেলে দেখতে পাই অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত প্রবহমান একটা অবিচ্ছেদ্য আর অবিচ্ছিন্ন চিত্রকল্পের প্রবাহ, যে প্রবাহে একটা চিত্রকল্প অন্য আর একটা চিত্রকল্পের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে যাচ্ছে। এই সব চিত্রকল্পের ব্যাখ্যা কোন তাৎ-ক্ষণিক বা সাময়িকভাবে গড়ে তোলা পদ্ধতি দিয়ে সম্ভবপর নয়। এই ব্যাখ্যা একটা বিশেষ নীতি মেনে চলে, কিংবা একটা বহুদিনের অভ্যাস।

চিন্তার জগতে যুক্তি বা ন্যায়ের যা ভূমিকা, কল্পনার রাজ্যে ঐ নীতির ভূমিকাও তাই। কল্পনার জগতে ক্রিয়াশীল নীতি বা যুক্তিকে আমাদের উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলির ক্ষেত্রে এবারে প্রয়োগ করা যেতে পারে। ছদ্মবেশী মানুষ কৌতুকহাস্যের উৎস। তেমনি, যে লোককে আমরা ছদ্মবেশী বলে ভুল করি সেও একই কারণে হাস্যকর। এই যুক্তিকে আরও একটু টেনে নিয়ে গিয়ে বলা চলে, যে-কোন আত্মগোপন ও ছদ্মবেশধারণের চেষ্টার মধ্যে হাস্যরসের উপাদান বা বীজ নিহিত। এই সত্য শুধু ব্যক্তির ক্ষেত্রে নয়, সারা মনুষ্য সমাজ, এবং শেষ পর্যন্ত প্রকৃতির রাজ্যেও সক্রিয়।

প্রকৃতির জগতে ছদ্মবেশের ব্যাপারটি নিয়েই শুরু করা যেতে পারে। গায়ের অর্দ্ধেক-লোম-ছাটা একটা কুকুর, কৃত্রিম রং-করা একটা ফুলের তোড়া কিংবা বনের মধ্যে গাছের গুঁড়িতে লাগানো নির্বাচনী প্রচারপত্র এসব দেখলে আমাদের হাসি পায়। এই হাসির কারণ খুঁজলে দেখা যাবে যে উল্লিখিত প্রত্যেকটি জিনিষ আমাদের ছদ্মবেশের কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে আমাদের কৌতুক বোধের মাত্রা অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ ও দুর্বল। কৌতুক-বোধের প্রধান উৎস থেকে এ-সব ব্যাপার অনেক দূরে। এই ক্ষীণ প্রতিক্রিয়াকে কি আমরা জোরালো করতে চাই? তার জন্যে আমাদের উৎসের কাছাকাছি যেতে হ'বে এবং ছদ্মবেশসদৃশ চিত্রকল্পের সঙ্গে সেই মূল চিত্রকল্পটির তুলনা করতে হবে যার গোপন তত্ত্বটি হোল জীবনের সাবলীল এবং স্বচ্ছন্দ রূপকে যান্ত্রিক অস্বাভাবিকতা এবং আড়ষ্টতা দেওয়া। জীবনের স্বাভাবিক ছন্দকে কোন যান্ত্রিক পদ্ধতি দিয়ে অস্বাভাবিক করে তোলাই হোল অবিমিশ্র কৌতুকহাস্যের গোপন তত্ত্ব এবং এই মূল তত্ত্বটিকে ব্যবহার করেই আমাদের কল্পনা নিঃসন্দেহে নানা উপায়ে বিচিত্র আর জোরালো কৌতুকহাস্যের উপাদান তৈরি করে নিতে পারে। এখানে আমাদের মনে আসে 'আল্‌প্‌স্‌ পাহাড়ে তারতার্‍্যাঁ' (*Tartarin sus les Alpes*) থেকে সেই মজার অনুচ্ছেদটি যেখানে বোঁপা (Bompard) তারতার্‍্যাঁকে, সেই সঙ্গে কিছুটা পাঠককেও সাময়িকভাবে মনে করতে বাধ্য করে যেন সুইজারল্যাণ্ড দেশটা নানা রকমের যন্ত্রে ভর্তি একটা অপেরাবাড়ির তলায়

খর। তার কথা শুনলে মনে হয় সারা দেশটাই কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং সেখানকার যত জলপ্রপাত, হিমবাহ আর 'কৃত্রিম' কাটলগুলো যন্ত্রের সাহায্যে চালু রাখা হয়েছে। সম্পূর্ণ নতুন সুরে বাঁধা হলেও প্রায় একই জাতের ধারণা পাওয়া যায় ইংরেজ লেখক জেরোম কে জেরোমের[১৩] (Jerome K. Jerome) *Novel Notes* বইটি পড়ে। এক মহিলা সমাজ-সেবী চান না যে সমাজসেবার কাজ তাঁর অভ্যস্ত জীবনছন্দকে ব্যাহত করুক। তাই তিনি তাঁর ভক্তদের সাহায্যে নিজের বাড়ির কাছাকাছি কিছু নাস্তিককে বসালেন যাতে তাদের ধর্মে মতি ফিরিয়ে এনে নিজে পুণ্যলাভ করতে পারেন। কিছু নিষ্পাপ লোককেও তাড়াতাড়ি মাতাল সাজানো হোল, যাতে তাদের মাতলামি ছাড়িয়ে মহিলা পুণ্যার্জনের কাজে সফল হন। বিষয়টিকে পাঠকদের কানে তোলবার জন্য লেখক দূর-থেকে-শুনতে-পাওয়া প্রতিধ্বনির মত মজাদার ভাষা ব্যবহার করেছেন আর তার সঙ্গে সঙ্গতের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে সহজ অথচ বিষয়ের প্রয়োজনমত বিন্যস্ত রচনাশৈলী। এক ভদ্রমহিলাকে জ্যোতির্বিদ্ ক্যাসিনি (Cassinni) চন্দ্রগ্রহণ দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, কিন্তু মহিলা আসতে একটু দেরি করে ফেলেছেন এবং দুঃখ করে বলছেন, "মঃ ক্যাসিনি, যদি কিছু মনে না করেন, দয়া করে সমস্ত ব্যাপারটা আমার জন্য আর একবার শুরু থেকে দেখান।" কিংবা গোদিনের[১৪] (Godinet) বর্ণিত এক চরিত্রের বিস্ময়কর একটা উক্তি। কোন শহরে পৌঁছে, কাছাকাছি একটা মৃত আগ্নেয়গিরি আছে শুনে ভদ্রলোক বললেন, "এঁদের একটা আগ্নেয়গিরি ছিল, কিন্তু এঁরা সেটাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেননি।"

এবার সমাজসংক্রান্ত বিষয়ে আসা যাক। আমাদের জীবন যেহেতু একই সঙ্গে সমাজকেন্দ্রিক ও সমাজনিরপেক্ষ, সমাজকে একটা জীবন্ত জিনিস না ভেবে উপায় নেই। তাই সমাজের যে-সমস্ত জিনিস দেখে আমাদের ধারণা হয় যে সমাজ ছদ্মবেশ ধরে আছে, সে-সব ব্যাপার আমাদের কাছে কৌতুক-কর মনে হবেই। মনে হবে কোন কপট বেশ ধরে সমাজ নিজেকে জাহির করার চেষ্টা করছে। জীবন্ত মানুষের তৈরি সমাজ যখন নিজের ওপর নিষ্প্রাণ,

অনড় আর ছকে-বাঁধা গতানুগতিক বিধিনিষেধ চাপিয়ে রাখে তখন তা আমাদের মনে ছদ্মবেশী কোন জিনিসের উপলব্ধি আনে। এ-হেন পরিস্থিতিতে জীবনের ভেতরকার স্বাচ্ছন্দ্য ও সাবলীলতার সঙ্গে একটা অনড় ও অনমনীয় প্রাণহীন বহিরাবরণের বিরোধ প্রকট হয়ে পড়ে। তাই আমাদের জীবনের বাহ্য ও আনুষ্ঠানিক আড়ম্বরের মধ্যে সব সময়ে একটা হাস্যকর ব্যাপার লুকিয়ে থাকে। সুযোগ-সুবিধে পেলেই এই কৌতুককর ব্যাপার হাসির বিস্ফোরণে ফেটে পড়ে। বলা যায় ব্যক্তিদেহের সঙ্গে তার পোষাকের যা সম্বন্ধ, সমাজদেহের সঙ্গে সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের সম্বন্ধও অনেকটা সেই রকম। ঐ অনুষ্ঠানগুলো তখনই আমাদের কাছে প্রয়োজনীয় আর মূল্যবান্ বলে মনে হয় যখন আমাদের মধ্যে সামাজিক সত্তার সঙ্গে তাদের একাত্ম করে দেখবার প্রবণতা থাকে। কিন্তু যে মুহূর্তে আমরা সমাজের একাত্ম চরিত্র থেকে ঐ আচার-অনুষ্ঠানগুলোকে আলাদা করে দেখি, তখনই তাদের হাস্যকরতা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাই যে-কোন অনুষ্ঠানের হাস্যকরতা বুঝতে হলে তাকে শুধু অনুষ্ঠান হিসেবেই দেখতে হবে, অর্থাৎ দার্শনিকদের ভাষায় তাদের বিষয়বস্তু এবং উপস্থাপনার বহিরঙ্গকে পৃথক করে ফেলতে হবে। এই বিশেষ দিকটির ওপর আমি অবশ্য বেশি গুরুত্ব দিতে চাই না। আমরা প্রত্যেকেই জানি যাবতীয় সামাজিক কাজকর্মের ওপর বিবিধ হাস্যকর অনুষ্ঠান একঘেয়ে প্রভাব বিস্তার করে—সাধারণ একটা পুরস্কার বিতরণী সভা থেকে শুরু করে গুরু-গম্ভীর ও গুরুত্বপূর্ণ মামলার শুনানি পর্যন্ত সর্বত্র এর নজির ছড়ানো। যে-কোন অনুষ্ঠান, যে-কোন সূত্র (formula) এমনভাবে বিধৃত যে অতি সহজে তার সঙ্গে হাস্যকর উপাদানকে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায়।

এইসব ক্ষেত্রেও হাস্যরসের উৎসের কাছাকাছি গিয়ে কৌতুককর ব্যাপারটিকে আরও জোরালো করা যায়। বিদ্রূপাত্মক অনুকরণ (travestissement) থেকে আমাদের ফিরে যেতে হ'বে মূল সূত্রে—জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যের ওপর যান্ত্রিক অনমনীয়তা ও আড়ষ্টতার আরোপ। ইতিমধ্যে আমরা দেখেছি অনুষ্ঠানের প্রাণহীন রীতিনীতির মধ্যে কিভাবে হাসির

বীজ লুকিয়ে থাকে। যে মুহূর্তে কোন আপাতগম্ভীর অনুষ্ঠানের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্ত আমরা ভুলে যাই, ঐ অনুষ্ঠানের সব পাত্রপাত্রী আমাদের কাছে হাস্তকর গতিবিধি ও চালচলন বিশিষ্ট পুতুলনাচের পুতুল বলে মনে হয়। তাদের চলাফেরা কতকগুলো ছকে-ফেলা অনড় নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলে আমাদের ধারণা হয়। এর নাম স্বয়ংক্রিয়তা (l'automatisme)। অবশ্ত এই স্বয়ংক্রিয়তা চরমে ওঠে সেই কেরাণী বা কর্মীদের মধ্যে যাঁরা শুধু কোন যন্ত্রের মত তাঁদের কাজ করে যান ; কিংবা কোন প্রশাসনিক নিয়মের ভাগ্যসদৃশ অবোধ ও চিন্তাহীন প্রয়োগের মধ্যে, যে নিয়ম মানুষের তৈরি হয়েও প্রাকৃতিক নিয়মের মতই অতিমানবিক হয়ে দাঁড়ায়। খবরের কাগজের যথেচ্ছ নির্বাচিত একটা পাতা থেকে হাস্তরসের এই ধরনের দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যেতে পারে। বছর কুড়ি আগে দীপ্ (Dieppe) বন্দরের কাছে একটা বড় জাহাজ ডুবে যায়। অন্ত একটা জাহাজ অনেক চেষ্টা করে ঐ ডুবন্ত জাহাজের কিছু যাত্রীকে উদ্ধার করে। স্থানীয় শুল্ক বিভাগের যে-সব কর্মচারী এই ত্রাণ কাজে অংশ নিয়েছিলেন তাঁরা প্রথমেই তাঁদের কাজের প্রথামত নিমজ্জমান যাত্রীদের জিজ্ঞাসা করেন তাঁদের কারুর কিছু ঘোষণা করার আছে কিনা (S'il n'avaient rien a declarer)। একটু সূক্ষ্মতর, কিন্তু প্রায় একই ধরনের কৌতুকহাস্তের সন্ধান পাওয়া যায় পার্লামেন্টের এক সদস্তের উক্তিতে। ট্রেনে একটা বীভৎস হত্যাকাণ্ড ঘটে যাবার পরের দিন তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলেছিলেন, "হত্যাকারী অপরাধ করার পর ভুল পথে ট্রেনের কামরা থেকে পালিয়েছিল। এর ফলে সে রেল কোম্পানির একটা নিয়ম লঙ্ঘন করেছিল"। এই উদাহরণগুলো থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, প্রথম ক্ষেত্রে কিভাবে মানুষী চেতনার ওপর একটা যান্ত্রিক নিয়মের প্রভাব পড়েছে, আর দ্বিতীয়টি দেখায় কিভাবে একটা বিশেষ বিভাগীয় নিয়ম মানবিক চেতনাকে অসাড় করে দিয়েছে, ফলে দুটি উক্তিই হাস্তকর হয়ে উঠেছে। এর পর আমাদের দেখতে হ'বে এই দুই ধরনের যান্ত্রিকতা সম্মিলিত হলে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া ঘটে।

এটা স্পষ্ট যে এই দুই পদ্ধতির মিশ্রণের ফলে প্রাকৃতিক বা মানবিক

নিয়মকে ছাপিয়ে মানুষের তৈরি কৃত্রিম নিয়মে নানা ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণের প্রবণতা দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে, জেরোঁৎ (Geronte) যখন বলে যে মানুষের দেহে হৃৎপিণ্ড বাঁদিকে আর যকৃৎ ডান দিকে থাকে তখন সগানারেল (Sganarelle) জবাব দেন 'হ্যাঁ, আগে তাই থাকত বটে, কিন্তু ইদানীং আমরা সব বদলে দিয়েছি, এখন আমরা সমস্ত চিকিৎসা একদম আধুনিক পদ্ধতিতে শুরু করেছি।" এখানে আমরা মঃ দ্য পুরসো-ঞাকের[১৪] (*M. de Ppourceaugnac*) দুই ডাক্তারের মধ্যে আলোচনারও উল্লেখ করতে পারি: "আপনি যে সব যুক্তি দিয়েছেন সেগুলো এতই সূক্ষ্ম আর পাণ্ডিত্যপূর্ণ যে রোগী সেগুলো শুনে বিষণ্ণ আর চিন্তিত না হয়ে পারে না। আর যদি সে তা নাও হয়, আপনার কথার চারুতা আর যুক্তির সৌকর্য দেখে তাকে বিমর্ষ হতেই হবে।" এ-ধরনের আরও অনেক দৃষ্টান্ত আমরা জড়ো করতে পারি। এমন কি মোলিয়েরের সৃষ্ট চিকিৎসক চরিত্র-গুলোকে একের পর এক সাজালেই আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তা ছাড়া আমাদের কল্পনা কৌতুকহাস্য নিয়ে যতদূরই এগোক না কেন, বাস্তব ঘটনা অনেক সময়েই কল্পনাকে ছাড়িয়ে যায়। এক ঝানু তার্কিক দার্শনিককে বলা হয়েছিল যে যদিও তাঁর সিদ্ধান্তগুলো যুক্তির দিক থেকে নিশ্ছিদ্র, তবুও বাস্তব ঘটনা বা অভিজ্ঞতা সব সময়েই তাদের বিরুদ্ধে যায়। দার্শনিক একটি বাক্যের সাহায্যে অভিযোগটি খণ্ডন করেন, "আমাদের অভিজ্ঞতাগুলোই আসলে ভুল।" আসল কথা, একটা 'প্রশাসনিক' পদ্ধতির বাঁধা ছকে জীবনকে চালানোর চেষ্টা কত প্রবল ও ব্যাপক আমরা তা কল্পনাও করতে পারি না। একদিক থেকে এই পদ্ধতি খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু যে-ভাবে সেটা প্রয়োগ করার চেষ্টা হয় তা অত্যন্ত কৃত্রিম। বলা চলে এর মধ্যে পণ্ডিতম্মন্যতার চরম সব উদাহরণ চোখে পড়ে, এবং শেষ পর্যন্ত এখানে প্রাকৃতিক শক্তির ওপর কৃত্রিম প্রয়াসের টেক্কা দেওয়ার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই লক্ষণীয় নয়।

সুতরাং সমস্ত ব্যাপারটিকে আর একবার ঝালিয়ে নিয়ে বলা যায় যে যে-শক্তি মানুষকে একটা মস্তিষ্কহীন যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য দেয়, তাই আবার

যাবতীয় স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক ঘটনার ওপর একটা কৃত্রিম নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে মানুষকে সক্রিয় করে। স্বপ্নলোকের যুক্তির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ এবং ক্রমশ ক্ষীয়মান যুক্তিবোধ ঐ একই ধরনের সম্পর্ক উত্তরোত্তর উন্নততর জগতে এবং আরও বেশি চিন্তা ও ভাবের জগতে তার প্রভাব বিস্তার করতে থাকে, এবং শেষ পর্যন্ত আমরা দেখতে পাই যে তৈরি পোষাক আর মানুষের জীবন্ত দেহের মধ্যে যে সম্পর্ক প্রায় তার অনুরূপ একটা সম্বন্ধ গড়ে ওঠে মানুষের তৈরি প্রশাসনিক বিধিনিয়ম আর মানুষের স্বাভাবিক এবং নৈতিক মূল্যবোধের মধ্যে। আমরা যে তিনটি দিগন্তের কথা উল্লেখ করেছি এতক্ষণে তার মধ্যে প্রথমটির শেষ সীমায় আমরা পৌঁছেছি। এবার আমরা দ্বিতীয় দিগন্তের দিকে দৃষ্টি দেব এবং দেখব এই দিকটি অনুসরণ করে আমরা কোথায় পৌঁছই।

। দুই।

আমাদের এবারের অনুসন্ধান আবার শুরু হ'বে একটা প্রাণবন্ত জিনিসের ওপর যান্ত্রিক কোন আবরণ আরোপিত হওয়ার উপলব্ধি থেকে। এ-রকম ক্ষেত্রে হাসির উৎস কোথায়? আমাদের হাসি আসে যখন আমরা দেখি একটা স্বচ্ছন্দ, সাবলীল আর প্রাণবন্ত জিনিস কোন প্রাণহীন যন্ত্রের মত আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে। আমাদের প্রত্যাশা থাকে জীবন্ত কোন মানুষ স্বাচ্ছন্দ্য আর সাবলীলতার পরাকাষ্ঠা দেখাবে, তার গতিপ্রকৃতি আর ক্রিয়াকাণ্ডে সদাসতর্ক একটা শক্তি সক্রিয় থাকবে। কিন্তু এই সক্রিয়তা আসলে দেহের নয়, মানুষের সত্তার বৈশিষ্ট্য। তা আসলে সেই জীবন-জ্যোতি যা আমাদের মধ্যে কোন দেহাতীত মহত্তর শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; কাচের তৈরি কোন স্বচ্ছ আবরণের আড়াল থেকে কোন আলোকের দ্যুতি যেমন দৃষ্টিগোচর হয়, তেমনি দেহরূপ আবরণ ভেদ করে এই সত্তার শক্তি অনুভূত হয়। জীবন্ত দেহে আমরা যখন শুধু স্বাচ্ছন্দ্য আর সাবলীলতাই দেখতে পাই, তখন আমরা দেহের গুরুভার এবং আত্মাবিরোধী প্রবণতাকে, সোজা কথায় তার ভৌত অস্তিত্বকে, অস্বীকার করি বা তাকে গুরুত্ব দিতে চাই না।

মানুষের দেহের পঞ্চভূতে তৈরি বহিরাবরণকে ভুলে গিয়ে শুধু তার আভ্যন্তরীণ জীবনীশক্তি আর উদ্দীপনার কথাই আমরা ভাবি, যে জীবনী-শক্তিকে আমরা কল্পনায় মানুষের মেধা ও নৈতিক গুণাগুণ থেকে অভিন্ন বলে মনে করি। ধরা যাক্, আমাদের মন এই দেহরূপ বস্তুটির দিকেই আকৃষ্ট হোল, আরও ধরা যাক্ যে যে লঘু এবং সূক্ষ্ম শক্তি ভেতর থেকে দেহকে সঞ্জীবিত করে, তার দ্বারা অনুজ্জীবিত এই শরীর আমাদের চোখে একটা ভারী এবং দুর্বহ বহিরাবরণ বা ভার হিসেবে প্রতিভাত হোল, যে তার ওপরের দিকে উঠতে উদ্‌গ্রীব আত্মাকে অনুক্ষণ নীচে চেপে রাখতে সচেষ্ট। এ ক্ষেত্রে দেহ ও আত্মার সম্পর্ক ঠিক পোষাক আর মনুষ্যদেহের মধ্যে সম্বন্ধের সঙ্গে তুলনীয়—প্রাণহীন একটা বোঝাকে যেন প্রাণবন্ত শক্তির ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। যে-মুহূর্তে আমাদের মনে এই 'চাপিয়ে দেওয়া'র অনুভূতি জাগবে তখনই আমরা কৌতুকবোধ করব। আমাদের এই কৌতুকবোধ আরও প্রবল হয় যখন আমরা বুঝি দেহের প্রয়োজনে মানুষের আত্মা প্ররোচিত বা প্রলুব্ধ হচ্ছে! একদিকে মানুষের নৈতিক ব্যক্তিত্ব আর বুদ্ধিদীপ্ত বৈচিত্র্যময় শক্তি, অন্যদিক বুদ্ধিহীন, উপলব্ধিশূন্য দেহের বৈচিত্র্যহীন গতানুগতিকতা—যা নিয়ত যন্ত্রসদৃশ একগুঁয়েমির দ্বারা তার যাবতীয় মৌলিক চিন্তা এবং ইচ্ছার প্রতিবন্ধকতা করে চলেছে। যত তুচ্ছ জিনিস নিয়ে এক নাগাড়ে দেহের চিন্তা আবর্তিত হতে থাকে, আত্মার ওপর তার হাস্যকর কর্তৃত্ব তত বেশি লক্ষিত হতে থাকে। কিন্তু এটা শুধু মাত্রাগত একটা ব্যাপার, এবং এই ব্যাপারটির মধ্যে ক্রিয়াশীল সূত্রটিকে আমরা এইভাবে সাজাতে পারি : যে কোন কৌতুককর ঘটনা যখন মানুষের শারীর অস্তিত্বের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তা আসলে মানুষের আত্মিক বা নৈতিক অবস্থা থেকেই উদ্ভূত।

যখন কোন বক্তা তাঁর বক্তৃতার করুণতম অংশে হঠাৎ হেঁচে ফেলেন, তখন আমাদের হাসি পায় কেন? একজন জার্মান দার্শনিকের বক্তৃতার নিম্নোদ্ধৃত অংশটুকুতে হাস্যকর ব্যাপার কোন্‌টি? "মৃত ব্যক্তি অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ এবং মোটাসোটা ছিলেন"? এখানে আমাদের কৌতুকবোধের

কারণ মৃতব্যক্তির নৈতিক মহত্বের প্রসঙ্গ থেকে বক্তা হঠাৎ তাঁর শারীরিক আয়তনের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে এই জাতের অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে। যদি জীবন থেকে ঐ ধরনের উদাহরণ খুঁজে পাবার চেষ্টা আমরা নাও করি, তাহলে নাট্যকার লাবিশের[১৬] (Labiche) লেখায় যত্র তত্র ঐ জাতীয় হাস্যকর পরিস্থিতির সন্ধান আমরা পাবই। যেমন, পোকায়-খাওয়া দাঁতের ব্যথা হঠাৎ বেড়ে ওঠায় এক নায়করা বক্তার বক্তৃতায় হঠাৎ বাধা পড়ে; কিংবা দেখা যায় কোন নাটকে চরিত্রবিশেষ উচ্ছ্বসিত হয়ে বক্তৃতা করতে করতে মাঝপথে হঠাৎ থেমে পড়েন, কারণ জুতোর মাপ ছোট হওয়ার দরুণ তাঁর পায়ে হঠাৎ ব্যথা লাগছে, কিংবা বেল্ট বেশি টানটান হওয়ার ফলে কোমরে যন্ত্রণা হচ্ছে। এই ধরনের প্রতিটি দৃষ্টান্তেই আমরা দেখি দেহগত যন্ত্রণার ফলে মানসিক বা নৈতিক কাজে বাধা-পাওয়া মানুষের ছবি। কোন বেশি মোটা লোককে দেখলে যে আমরা হাসি তার কারণও ঐ একই। আমার বিশ্বাস অতিরিক্ত লাজুক বা দ্বিধাগ্রস্ত লোককে দেখলে আমাদের যে কৌতুকবোধ হয় তার কারণও অভিন্ন। ঐ শ্রেণীর কোন লোককে দেখলে মনে হয় সে তার দৈহিক অস্তিত্ব নিয়েই বিব্রত এবং তার শরীরকে লুকিয়ে রেখে আসা যায় এমন একটা জায়গার সন্ধানে সে ব্যাপৃত।

ঠিক এই কারণেই ট্র্যাজেডির লেখক সবসময়ে চেষ্টা করেন কিভাবে নায়কের দেহগত চিন্তা থেকে দর্শকচিত্তকে সরিয়ে রাখা যায়। যে-মুহূর্তে দেহজ দুশ্চিন্তা ট্র্যাজেডির আবেগ ও অনুভূতিপ্রধান পরিবেশকে বিঘ্নিত করে, সেই ক্ষণে সেখানে হাস্যকর পরিস্থিতির সূচনা হবে বলে আশঙ্কা জাগে। তাই ট্র্যাজেডির নায়ককে আমরা কখনও খেতে, জলপান করতে বা শীতে আগুন পোহাতে দেখি না। এমন কি নাটকের নিজস্ব প্রয়োজন ছাড়া তাকে আমরা বসতে পর্যন্ত দেখি না। কোন গভীর এবং মহৎ অনুভূতি-ঋদ্ধ উক্তির মাঝখানে নায়ক যদি হঠাৎ বসে পড়েন, আমাদের দৃষ্টি তাঁর শরীরের দিকে আকৃষ্ট হয়। নেপোলিয়ন মাঝে মাঝে মনস্তাত্ত্বিকসুলভ অন্তর্দৃষ্টি দেখাতেন; তিনি একবার বলেছিলেন, মানুষ বসে বসেই ট্র্যাজেডি

থেকে কয়েভিন্ন জগতে চলে যেতে পারে। ব্যারন গুরগো[১৭] (Baron Gurgaud) তাঁর *Journal Inedit* বা অপ্রকাশিত পত্র নামক বইটিতে লিখেছেন, জেনার যুদ্ধের পর প্রুসিয়ার রাণীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের বিবরণ নেপোলিয়ন এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন : 'মহিলা শিমেন্-এর মত আবেগপ্লুত ভাষায় আর ভঙ্গীতে আমাকে অভ্যর্থনা করে বললেন, "বিচার, মহাশয় বিচার! মাগদেবুর্গ!" এইভাবে মহিলা অনেকক্ষণ চালালেন, আমি তো রীতিমত লজ্জায় পড়লাম। শেষ পর্যন্ত মহিলার এই অভিনাটকীয় ব্যবহারে যবনিকা টানার জন্ত আমি তাঁকে বসতে বললাম। কারণ, কোন আবেগপূর্ণ করুণ দৃশ্যকে ঐভাবে শেষ করতে হয়। বক্তা যে মুহূর্তে বসে পড়েন তখনই দৃশ্যের কারুণ্য শেষ হয় এবং সেখানে কৌতুকের স্পর্শ আসে"।

'দেহ আত্মার ওপর প্রভুত্ব করছে'—এই চিন্তাটাকে আর একটু ব্যাপকতর ক্ষেত্রে প্রসারিত করা যেতে পারে। এর থেকে আরও সাধারণ কিছু তত্ত্ব বেরিয়ে আসে, যেমন, বিষয়বস্তুর চেয়ে বাচনভঙ্গীর প্রাবল্য, আত্মান্তরীন অনুভূতিকে ছাপিয়ে ভাষার অনাবশ্যক আতিশয্য, ইত্যাদি। নাটকে যখন কোন মানুষী বৃত্তিকে বিদ্রূপ করা হয় তখন ব্যাপারটা কি অনেকটা সেইরকম দাঁড়ায় না? অনেক নাটকে উকীল, ডাক্তার বা সরকারি আমলাদের কথাবার্তা শুনে মনে হয় যেন যথাক্রমে মানুষের স্থায় বিচার করা, তাদের স্বাস্থ্যরক্ষার দায়িত্ব পালন করা কিংবা প্রশাসন চালানোর চেয়ে সমাজে উকীল, ডাক্তার আর আমলাদের বহাল তবিয়তে বেঁচে থাকাটাই বেশি দরকারি ব্যাপার। বাইরের কায়দাকানুন দেখিয়ে, যান্ত্রিকভাবে নিয়ম মেনে কাজ করার প্রবণতা সমাজে একধরনের বৃত্তিমূলক যান্ত্রিকতার জন্ম দিয়েছে যার সঙ্গে মানুষের আত্মা, বুদ্ধিবৃত্তি ও নৈতিবোধের ওপর দৈহিক নানা তাগিদের প্রভাবের সঙ্গে একটা সাদৃশ্য আছে, এবং দুটো ব্যাপারই সমান হাস্যকর। নাটকে এ-ধরনের বহু উদাহরণ আছে। এই বিষয়টি বিভিন্ন নাটকে কি রকম বিচিত্র নানারূপে দেখানো হয়েছে তার খুঁটিনাটি আলোচনায় না গিয়েও আমরা দু'তিনটে সংলাপাংশ তুলে

দেখাতে পারি সেখানে ব্যাপারটি কি রকম সোজাসুজি উপস্থাপিত হয়েছে। মোলিয়েরের 'কাল্পনিক রোগগ্রস্ত রোগী' (*Le Malade Imaginaire*) নাটকে ডাক্তার দিয়াফোয়ারুস (Diafoirus) বলছেন, "রোগীদের নিয়ম মাফিক চিকিৎসা করার চেয়ে বেশি যত্ন নেওয়া আমাদের দায়িত্ব নয়।' ঐ নাট্যকারেরই *L'Amour Medecin* নাটকে ডাক্তার বাই (Bahis) বলেন, "নিয়ম ভেঙে বেঁচে থাকার চেয়ে নিয়ম মেনে মরে যাওয়া ভাল"। ঐ নাটকেই দেফোনঁাদ্র (Defonandres) কিছুক্ষণ আগে মন্তব্য করেছেন, "আমাদের সব সময়ে, যে কোন অবস্থায় পেশাগত নীতি মেনে চলতে হবে"। তাঁর আর এক সহকর্মী Tomè's কারণ দেখিয়ে বলছেন, 'যে লোকটা মারা গেল সে তো গেলই, কিন্তু চিকিৎসাবৃত্তির কোন নিয়ম ভাঙা হলে সমস্ত চিকিৎসক সমাজের মধ্যেই একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে'। ব্রিদ্‌ওয়াসোঁর (Brid'oison) কথাগুলোও কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়, যদিও তার মধ্যে অন্য আর একটা চিন্তা কাজ করে, 'মনে থাকে যেন, 'এ' ফর্ম, 'এ' ফর্ম।' সত্যিই, যদি কোন জজ আটপৌরে সাদামাটা পোষাক পরে এজলাসে বসেন লোকে দেখে হেসেই খুন হবে, যদিও রাতের অন্ধকারে তাঁর পেশার পোষাক-পরা কোন উকীলকে দেখে ঐ লোকই ভয়ে আঁতকে উঠবে। সত্যিই, 'এ ফর্ম। শুধুই 'এ ফর্ম'।

আমার বিশ্বাস, এই উদাহরণগুলি থেকে কৌতুকহাস্যের যে প্রথম সূত্রটি বেরিয়ে এলো, আমাদের অনুসন্ধানের পথে আমরা যতই এগুবো সেটি তত বেশি স্পষ্ট হতে থাকবে। যেমন, কোন সুরকার যখন তাঁর যন্ত্রে একটি মাত্র সুর (note) বাজান, তা শুনে আরও অনেক সুরের ব্যঞ্জনা আপনা থেকেই আমাদের মনে ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে—এই নতুন সুরগুলির ধ্বনি প্রথম বা মূল সুরটির মত জোরালো না হলেও তার সঙ্গে অতি পরিষ্কার সম্বন্ধযুক্ত এবং এই সমস্ত সুর মিলে একটি সম্পূর্ণ সঙ্গীতের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। পদার্থবিজ্ঞানে একেই বলে মৌল সুরের ব্যঞ্জনা (les harmoniques du son fondamental)। আমার ধারণা কৌতুকহাস্যের সুদূরপ্রসারী নানা উদ্ভাবনী ক্ষেত্রেও এই ধরনের একটা ব্যাপার তার পরিবেশকে প্রভাবিত করে।

যেমন ধরা যাক, বস্তুর বাহ্ বা আপাতরূপ তার প্রকৃত বা বাস্তব চরিত্রকে আচ্ছন্ন করে দেওয়ার চেষ্টা করছে। আমাদের বিশ্লেষণ যদি ভুল না হয়, তা হলে এর থেকে আরও একটা অনুরণন কানে আসে, যেমন দেহ মনকে প্রলুব্ধ করছে, মনকে আচ্ছন্ন করে তার ওপর প্রভুত্ব করার চেষ্টা করছে। তাই তাঁর স্বরের প্রথম স্বরটি বাজাবার সঙ্গে সঙ্গে কৌতুকহাস্যের স্রষ্টা প্রায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাতে দ্বিতীয় একটি স্বর যোগ করেন বলা যায়। অর্থাৎ নাটকের কোন চরিত্রের পেশায় যা হাস্যকর তাকে নাট্যকার তার দৈহিক চালচলন ও গতিবিধিতে সঞ্চারিত করেন।

যখন বিচারপতি ব্রিদোয়াসোঁ (Brid'oison) তোৎলাতে তোৎলাতে মঞ্চে হাজির হন, তখন নাট্যকার ঐ তোৎলামির সাহায্যে চরিত্রটির বুদ্ধির জড়তার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান। তার বুদ্ধির জড়ত্বও অবিলম্বে আমাদের কাছে প্রকট হয়ে পড়ে। প্রশ্ন করা যায়, শারীরিক ত্রুটির সঙ্গে কোন চরিত্রের নৈতিক বা বুদ্ধিগত দুর্বলতার সম্বন্ধ কি? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়; তবে এই দুটো জিনিসের মধ্যে যে একটা যোগ আছে তা অনুভব করা যায়, যদিও এই যোগের প্রকৃতি সঠিকভাবে ভাষায় প্রকাশ করা সহজ নয়। হয়তো নাটকের ঐ বিশেষ পরিস্থিতিতে দরকার ছিল যে বিচার করার ঐ যন্ত্রটি দর্শকদের সামনে কথা বলার যন্ত্র হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করুক। যাই হোক, হয়তো অন্য কোন শারীরিক বৈশিষ্ট্য দিয়ে ঐ দৃশ্যের মূল সুরটিকে এর চেয়ে বেশি সাফল্যের সঙ্গে ধরা যেত না।

মোলিয়ের তাঁর *L'Amour Medecin* নাটকে বাই (Bahis) আর মাক্রোতোঁ (Macroton) নামে দুই ডাক্তারের হাস্যকর চরিত্র হাজির করে তাদের মধ্যে একটা চিবে তাদের সংলাপসমৃদ্ধ দৃশ্যের অবতারণা করেন। তাঁদের কথাবার্তা শুনে মনে হয় একজন অন্যের অবগতির জন্য প্রত্যেকটি শব্দ ধরে ধরে উচ্চারণ করছেন, আর তার জবাব দিতে গিয়ে অন্যজন অনবরত তোৎলাচ্ছেন। ঠিক এই জাতের বৈষম্যমূলক তুলনায় অন্য চরিত্রচিত্রণ দেখা যায় মঃ ভ পুরসোনাকের দুই উকীলের চরিত্রের

উপস্থাপনায়। প্রায় সব সময়ে কোন চরিত্রের ব্যক্তিগত হাস্যকরতাকে দেহগত ত্রুটি হিসেবে তার কথাবার্তার ছন্দে রূপায়িত হতে দেখা যায়। যে সব ক্ষেত্রে নাট্যকার অনুরূপ কোন দোষ চরিত্রের মধ্যে দেখাতে পারেন নি, সেখানে অভিনেতা প্রায়ই আপন উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে কোন মুদ্রাদোষ দেখিয়ে চরিত্রটিকে বিশিষ্টতা দেন। এমন ক্ষেত্র খুব কম আছে যেখানে প্রতিভাধর অভিনেতা অভিনীত চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলার তাগিদে নিজের থেকেই কোন একটা মুদ্রাদোষ উদ্ভাবন করেন না।

ফলে, মানুষের চরিত্র আর তার দেহগত বৈশিষ্ট্য এই দুটো জিনিসের মধ্যে একটা স্বাভাবিক আত্মীয়তা আছে যা আমরা সহজেই লক্ষ্য করি। মানুষের স্বচ্ছন্দ মন যেন হঠাৎ একটা ছাঁচের মধ্যে পড়ে শক্ত হয়ে যাচ্ছে, আর কতকগুলো ত্রুটির ফলে শরীর তার স্বাভাবিক নমনীয়তা হারিয়ে ফেলছে। আমাদের মন বিষয় থেকে তার উপস্থাপনা পদ্ধতিতে, অথবা নৈতিক থেকে দেহগত ব্যাপারে আকৃষ্ট হোক্ বা না হোক—দুই ক্ষেত্রেই একই শ্রেণীর ধারণা আমাদের কল্পনায় সঞ্চারিত হয়। দুটো ক্ষেত্রেই তাই কৌতুকহাস্যের প্রকৃতি প্রায় এক রকম। এখানেও আমরা কল্পনার স্বাভাবিক বিকাশের পদ্ধতিকে অনুসরণ করছি। মনে রাখতে হবে যে এই অভিমুখ বা প্রবণতা কেন্দ্রীয় চিত্রকল্পটি (l'image central) থেকে শুরু করে দ্বিতীয় প্রবণতা হিসেবে আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়েছিল। কিন্তু এখনও তৃতীয় এবং শেষ একটি পথের অনুসন্ধান বাকী আছে—সেই পথে এবার আমরা অগ্রসর হবো।

। তিন।

শেষবারের মত আর একবার আমাদের সেই কেন্দ্রীয় (মূল) চিত্রকল্পটিতে ফিরে যাওয়া যাক্—জীবন্ত কোন জিনিসের ওপর প্রাণহীন যান্ত্রিক কোন আবরণ। যে জীবন্ত জিনিসের কথা বারবার উল্লেখ করা হয়েছে তা হোল মানুষ। বিপরীতপক্ষে যে যান্ত্রিক আবরণটির কল্পনা করা হচ্ছে তা মানুষ নয়, নিষ্প্রাণ কোন জড়বস্তু। একটা সজীব মানুষের কিছুক্ষণের জন্য একটা

যন্ত্রবিশেষে রূপান্তরের ঘটনাটি আমাদের কৌতুকবোধকে জাগিয়ে তোলে অবশ্য চিত্রকল্পটিকে আমরা যদি এই দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখতে চাই। এখন যন্ত্ররূপ এই সুস্পষ্ট জিনিসের জায়গায় প্রাণহীন যে-কোন সাধারণ এবং অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট জিনিসের কথাও ভাবা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে দেখব এক ধরনের অভিনব হাস্যোদ্দীপক চিত্রকল্পসমষ্টির কথা আমাদের মনে আসছে। এই হাসির খোরাক আমরা এমন কোন অস্পষ্ট আর ধোঁয়াটে অনুভূতি থেকে পাই যে-অনুভূতি পূর্বোক্ত চিত্রকল্পগুলির দ্বারা প্রভাবিত, এবং তার থেকেই হাস্যরসের কারণ হিসেবে নতুন আর একটা নিয়ম বেরিয়ে আসে: যখনই কোন মানুষকে দেখে কোন প্রাণহীন জড়পদার্থের কথা মনে পড়ে তখনই আমাদের হাসি পায়।

সাঙ্কো পাঞ্জা[১৮] (Sancho Panza) কোন লেপের ওপর গড়াগড়ি খাচ্ছে, কিংবা একটা সাধারণ বেলুনের মত বিছানা থেকে ওপরে ভেসে উঠছে এ-রকম দৃশ্য দেখলে আমাদের হাসি পায়। কিংবা যখন আমরা দেখি কামানের গোলায় রূপান্তরিত ব্যারণ মুনখ্‌হাউসেন[১৯] (Baron Munchhausen) শূন্যমার্গে ধেয়ে চলেছেন তখনও আমাদের কৌতুকবোধ হয়। এমনও হতে পারে যে সার্কাসের জোকার ঐ নিয়মেরই কতকগুলো কসরৎ করে আমাদের হাসাচ্ছে। অবশ্য এই সব শারীরিক কসরৎ দেখানোর মাঝে মাঝে তারা যে-সব অশ্লীল উক্তি করে তা আমাদের ভুলে যেতে হ'বে—শুধু তাদের ঐ কসরৎ গুলোকে নিতে হ'বে, তাদের নানা অঙ্গভঙ্গী, লম্ফ-ঝম্ফ, গতিবিধি প্রভৃতি ভাঁড়ামোগুলোকে কৌতুক জাগাবার বিধিসম্মত উপায় বলে গ্রহণ করতে হবে। শুধু দুটো দৃশ্যে আমি এই ধরনের নিখাদ হাসির দৃষ্টান্ত পেয়েছি। এবং দুবারই আমার একই প্রতিক্রিয়া আর অনুভূতি হয়েছে। প্রথমবারে জোকার দুজন উল্টো দিক থেকে পাশাপাশি যেতে গিয়ে পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে একই তালে তড়িৎগতিতে লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে—দেখলেই বোঝা যায় তারা ঐ আপাত আকস্মিক ঘটনাটাকে একটা উঁচু ছন্দে বাঁধতে চাইছে। দর্শকদের মনও ক্রমশঃ তাদের এই বলের মত

লাফিয়ে ওঠা ঘটনাটার দিকে আকৃষ্ট হতে থাকে। তাঁরা ভুলে যান যে ধাক্কা খেয়ে হঠাৎ পড়ে যাওয়া আর সঙ্গে সঙ্গে স্প্রিং-এর মত লাফিয়ে ওঠা ব্যাপারটা দুটো হাড় আর মাংসের তৈরি মানুষের শরীরকে নিয়ে ঘটছে। তাঁদের মনে আসতে থাকে দুটো যে-কোন ধরনের পুঁটলির কথা—পুঁটলি দুটো পড়ছে আর সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দৃশ্যটা বেশ পরিষ্কার রূপ নেয়। জোকার দুজনের চেহারা আরও গোলাকার মনে হতে থাকে, তারা দুটো বলের মত অনায়াসে গড়াগড়ি খায় আবার নিজেদের মধ্যে লাফিয়ে ওঠে। পরিশেষে দর্শকমনে যে উপলব্ধি সৃষ্টি করার জন্য এই খেলাটি পরিকল্পিত তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁদের মনে হয় দুটো রবারের বল চারদিকে লাফালাফি করে বেড়াবার সময় পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা খাচ্ছে। দ্বিতীয় আর একটি দৃশ্য একটু বেশি অশোভন, এমন কি শ্লীলতাবর্জিত হলেও কোনমতেই কম শিক্ষাপ্রদ নয়। মঞ্চের ওপর দুটো লোকের আবির্ভাব হয়, দুজনেরই বিলিয়ার্ড বলের মত টাকভর্তি মাথা। দুজনের হাতেই একটা করে লম্বা লাঠি—তাই দিয়ে একে অন্যের মাথার ঠিক মাঝখানটায় পিটতে থাকে। এই অদ্ভুত দৃশ্যটিতেও এক ধরনের বিবর্তন লক্ষ করা যায়। প্রতিবার আঘাতের পর আহত ব্যক্তির শরীর যেন ক্রমশঃ বেশি ভারি হতে থাকে। সেই সঙ্গে আরও বেশি আড়ষ্ট হয়ে যায়—যেন প্রত্যেকটি আঘাত তার মানুষসুলভ শারীরিক নমনীয়তাকে একটু একটু করে কমাতে থাকে। এর পর আসে প্রত্যাঘাত—প্রতিটি আঘাত তার আগেরটির চেয়ে গুরুতর হয়। তার শব্দও উচ্চতর হতে থাকে। আর প্রত্যেক আঘাত আর তার পূর্বের আঘাতের মধ্যে সময়ের ব্যবধানও ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। একেবারে নিঃশব্দ প্রেক্ষাগৃহে মাথার চাঁদির ওপর লাঠির আঘাত আরও সশব্দে প্রতিধ্বনিত হ'তে থাকে। অবশেষে প্রাণহীন লাঠির মত আড়ষ্ট আর সোজা দুটো শরীরই পরস্পরের দিকে ঝুঁকে পড়ে আর তাদের মাথা দুটো কানফাটানো শব্দ করে ঠোকাঠুকি হয়ে যায়। শব্দ শুনে মনে হয় একটা বিরাট হাতুড়ি দিয়ে কেউ ওক কাঠের তৈরি মেঝেতে সজোরে আঘাত করছে; তারপর দু'জনেই মেঝেতে সোজা কাৎ হয়ে পড়ে যায়। ঠিক এই মুহূর্তে এই

ব্যাপারটা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে সার্কাসের ঐ দু'জন ভাঁড় বা জোকার অত্যন্ত মজার অথচ অমোঘ পদ্ধতিতে দর্শকদের বোঝাতে পেরেছেন, "আমরা আপনাদের চোখের সামনে কাঠের তৈরি দুটো প্রাণহীন পুতুলে রূপান্তরিত হতে চলেছি, এবং শেষ পর্যন্ত তা হয়েও গেছি"।

এ-হেন ক্ষেত্রে অত্যন্ত সংস্কৃতিহীন এবং অপরিশীলিত চিন্তার লোকও তার স্বাভাবিক বুদ্ধি এবং প্রতিক্রিয়ার ফলে মনোবিজ্ঞানের একটা সূক্ষ্ম ফল সম্বন্ধে সচেতন না হয়ে পারে না। আমরা জানি যে সম্মোহিত (hypnotise) কোন লোকের মনে শুধু ইঙ্গিতের সাহায্যে নানা কাল্পনিক দৃশ্যের সৃষ্টি করা যায়। লোকটিকে যদি বলা হয় যে তার হাতে একটা পাখি বসেছে, সে পাখিটিকে দেখবে এবং তারপর উড়ে যেতেও লক্ষ করবে। কিন্তু সম্মোহিত ব্যক্তি এই ধরনের প্রস্তাবিত কাল্পনিক দৃশ্য সব সময়ে সমান তৎপরতার সঙ্গে গ্রহণ নাও করতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় যে সম্মোহক খুব ধীরে ধীরে সাবধানে সুপরিকল্পিত ইঙ্গিতের সাহায্যে সম্মোহিত ব্যক্তির মনে কল্পিত ধারণার অনুপ্রবেশ ঘটাতে পারেন। যে-সব জিনিস লোকটি সত্যিই দেখেছেন সেইগুলি নিয়েই যাদুকর তাঁর কাজ শুরু করেন, সেই সঙ্গে বাস্তব জিনিসগুলি সম্বন্ধে লোকটির চিন্তাকে বিভ্রান্ত করতে তিনি সচেষ্ট হন। অতঃপর মোহময় দৃশ্যজগৎ অবতারণা করার জন্য যেসব বস্তুর দরকার ঐ-সব বিভ্রান্ত দৃশ্যনিচয়ের ভেতর থেকে সেগুলিকে বের করে আনবার চেষ্টা করা হয়। নিদ্রালু মানুষের মনেও অনুরূপ একটা ব্যাপার ঘটে। পরস্পরের সঙ্গে মিশে যাওয়া নানা রং-এর আর নির্দিষ্ট কোন আকৃতিহীন নানা জিনিসের ছবি তার মনের প্রেক্ষাপটে ধীরে ধীরে একটি সঠিক রূপ নেয়। তাই বলা চলে, অনিশ্চিত আর অস্পষ্ট থেকে স্পষ্ট এবং নিশ্চিতের দিকে বিবর্তনের এই নিয়ম মানুষের মনে কোন ধারণা সৃষ্টি করার শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। আমার মনে হয় মানুষের মনে কৌতুকহাস্যের বীজ বপনের যে নানা উপায় আছে তাদের মূলে আছে এই পদ্ধতিটি। একটু মোটাদানার হাস্যরসের সৃষ্টিতে এই ব্যাপারটা বিশেষ করে ফলপ্রসূ—যেমন যখন চোখের সামনে একটা লোককে আমরা প্রাণহীন কোন জড় পদার্থে বদলে যেতে দেখি।

কিন্তু অনেক সূক্ষ্মতর উপায়েও কৌতুকহাস্ত সৃষ্টি করা যায়—যে উপায়গুলি কবিরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁদের রচনায় প্রয়োগ করে থাকেন। কবিতার ছন্দ, পদান্ত মিল আর অনুপ্রাসের ক্রমাগত ব্যবহারের দ্বারা মানুষের বুদ্ধি আর কল্পনার সজীবতাকে পঙ্গু করে দেওয়া যায়। একই ধরনের ছন্দ আর মিলের টানাপোড়েনে পাঠকের মনের ওপর বশীকরণের মোহ ছড়িয়ে তাকে কবির নিজের কল্পনা অনুযায়ী দৃশ্য দেখতে বাধ্য করা যায়। পাঠক বলুন রুনিয়ার (Regnard) লেখা এই পংক্তিগুলি পড়ে তাঁর মনে কিছুক্ষণের জন্ত একটা পুতুলের ছবি ভেসে ওঠে কিনা :

তা' ছাড়াও, সে অনেক সৎ আর মহৎ লোকের কাছে
ঋণী : কারণ, তার মুখের কথায় বিশ্বাস করে
তাঁরা তার পেছনে হাজার পাউণ্ড আর এক ফার্দিং
খরচ করেছেন : তাকে বছরখানেকের মত এক নাগাড়ে
খাইয়েছেন, তাকে ভদ্রলোকের বেশভূষায়, মোজা, জুতো
আর দস্তানা দিয়ে সাজিয়েছেন ; তার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা,
এমন কি নরসুন্দরকে দিয়ে তার দাড়ি কামানো
চুল ছাঁটার ব্যবস্থাও করেছেন ; শীতের রাতে তাকে গরবে
আশ্রয় দিয়েছেন, তার পিপাসায় পানীয় যুগিয়েছেন ;
মোট কথা, তাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন ;
[Plus, il doit à maints particuliers
La somme de dix mil une livre une obole,
Pour l'avoir sans relâche un an sur sa parole
Habillé, voituré, chauffé, chaussé, ganté,
Alimenté, rasé, désaltéré, porté.]

নিচে ফিগারোর উক্তিটি শুনলেও প্রায় একই ধরনের ভাব কি আমাদের মনে জাগে না? (এখানে অবশ্য কোন চেতনাবিহীন জড়পদার্থের চেয়ে কোন জন্তুর চিত্রকল্পই শ্রোতার মনে এঁকে দেবার চেষ্টা হয়েছে বলে মনে হয়) 'এ কোন্ লোক? ইনি একজন সুদর্শন, মোটা, বেঁটে, তরুণ অথচ

প্রবীণ, ভদ্রলোক, ইস্পাত-ধূসর এক মূর্ত লোক, গোঁফ-দাড়ি কামানো, পরিষ্কার অথচ জ্ঞানশক্তি—যিনি একই সঙ্গে গোয়েন্দাগিরি করেন, অপরের ব্যাপারে অসুস্থ কৌতূহল দেখান, হুংকার ছাড়েন আর আর্তনাদ করেন। এমন এক জীব ইনি।"

এই দুই বর্ণনার মধ্যে একটি মোটা দানার, অন্যটি বেশ সূক্ষ্ম; কিন্তু এই দুই পরিসীমার মধ্যে আরও অজস্র ঢং আর সুরের কৌতুকহাস্য জাগাবার উপায় আছে। সব ক্ষেত্রেই মানুষের সম্বন্ধে এমন মনোভাব নিয়ে কথা বলা যায় যেন মনুষ্যেতর কোন প্রাণী বা প্রাণহীন কোন জড়পদার্থ সম্বন্ধে মন্তব্য করা হচ্ছে। এবারে উদাহরণ হিসাবে লাবিশের (Labiche) নাটক থেকে দু'একটা অংশ তুলে ধরব, কারণ তাঁর নাটকেই এ-ধরনের দৃষ্টান্তের ছড়াছড়ি।

ট্রেনে ওঠবার সময় মঃ পেরিশোঁ (M. Perrichons) নিশ্চিন্ত হতে চান যে কোন পোঁটলা বা পার্শেল তিনি ভুলে প্লাটফর্মে ফেলে যাচ্ছেন না— "চার, পাঁচ, ছয়, আমার বৌ হোল সাত, আমার মেয়ে আট, আর আমাকে নিয়ে নয়।" অন্য একটা নাটকে কন্যাগর্বে গর্বিত এক পিতা তাঁর মেয়ের জ্ঞানের বড়াই করছেন; "একটুও না থেমে ও আপনার সামনে ফ্রান্সে যে ক'টা রাজা ঘটেছে তাদের সবাইয়ের নাম গড় গড় মুখস্থ বলে যাবে।" "যে কটা রাজা ঘটেছে" এই বাক্যাংশটি রাজাদের নেহাৎই কোন নিষ্প্রাণ জড় পদার্থ পরিণত করে না, তবুও সেখানে তাদের সঙ্গে সত্তাহীন কোন জিনিসের তুলনা উহ্য থাকে।

এই উদাহরণটি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে মানুষের সঙ্গে প্রাণহীন বস্তুর সম্পূর্ণ একাত্মীকরণ (l'identification) দরকার নাও হতে পারে। ঐ ধরনের একীকরণের একটা প্রক্রিয়া শুরু করাই যথেষ্ট—তারই ফলে মানুষের ব্যক্তিত্ব আর প্রকৃত তাৎপর্য আমাদের মনে গুলিয়ে যেতে পারে। আবু[২১] (About)-রচিত একটা উপন্যাসে, কোন গ্রামের এক মোড়লের মন্তব্য আমি এখানে তুলছি: 'প্রিফেক্ট মশায় সব সময়ে আমাদের সমান দয়া দেখিয়েছেন, যদিও ১৮৪৭ সাল থেকে তাঁকে বেশ কয়েকবার বদলানো হয়েছে।"

ওপরে উদ্ধৃত সব কটা উক্তিই এক ধাঁচে তৈরি। তাদের উপকরণের গোপন রহস্যটির যদি একবার আমরা হদিশ পাই, ঐ ধরনের বিদ্রূপাত্মক অসংখ্য মন্তব্য আমরা তৈরি করতে পারি। কিন্তু ঔপন্যাসিক আর নাট্যকারের শিল্প শুধু কৌতুকপ্রদ সংলাপরচনাতেই সীমিত নয়। তাঁদের শিল্পের যথার্থ দুরূহ অংশ হোল সাধারণের ব্যবহৃত ভাষাকে একটা বিশেষ তাৎপর্য (suggestion) দিয়ে অর্থগর্ভ করে তোলা, অর্থাৎ পাঠক ও দর্শকদের কাছে গ্রহণযোগ্য করা। আমরা যে ওই সব কথা বা উক্তি সাগ্রহে গ্রহণ করি, তার কারণ, হয় সেগুলি বক্তার একটা বিশেষ মানসিক অবস্থার দ্যোতক বলে আমাদের মনে হয়, নয়তো আমাদের মনে হয় একটা বিশেষ পরিবেশ ও পটভূমির সঙ্গে কথাগুলি বেশ খাপ খেয়েছে বা মানিয়ে গেছে। যেমন, আমরা বলতে পারি যে ম: পরিশোঁ তাঁর প্রথম দূর সফরের অভিজ্ঞতায় এতই উত্তেজিত যে জীবন্ত মানুষকে প্রাণহীন জড়বস্তু হিসেবে গোনার হাস্যকরতা তাঁর মনেই আসছে না। তেমনি, "যে সব রাজারা ঘটেছে" কথাগুলি একাধিকবার উচ্চারিত হতে থাকে যখন মেয়েটি তার বাবার কাছে ইতিহাসের পড়া মুখস্থ বলে। মেয়েটির পাঠ শুনে মুখস্থ করা অভিনয়ের পাঠের কথাই আমাদের মনে আসে। আর তৃতীয় উক্তিটি শুনে আমাদের ধারণা হয় যে দরকার হলে সরকারি প্রশাসনের প্রতি আস্থা এতদূর নিয়ে যাওয়া যেতে পারে যে যখন prefect বা অন্য কোন সরকারি প্রশাসক বদলি হন তখন যেন শুধু পদাধিকারী ব্যক্তির নামেরই বদল হয়। প্রশাসনিক কাজকর্ম পদাধিকারী নির্বিশেষে সুষ্ঠুভাবে চলতে থাকে, এই মনোভাব প্রকাশ করা হয়।

কৌতুকহাস্যের পেছনে সক্রিয় যে মূল কারণটির প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে তার থেকে আমরা অনেক দূরে সরে এসেছি। অনেক হাসির ব্যাপারের বিশেষ কোন ব্যাখ্যা না থাকলেও, সেগুলিকে অন্য কোন ঘটনার সঙ্গে সাদৃশ্যের ভিত্তিতেই ব্যাখ্যা করা যায়। আবার, ঐ দ্বিতীয় ঘটনার হাস্যকরতা হয়তো নির্ভর করে তৃতীয় আর একটা ঘটনার সংগে তার মিল আছে বলে; এই রকম সাদৃশ্যের পারম্পর্যজনিত শৃঙ্খল চলতেই থাকে।

তাই কৌতুকহাস্তের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ যতই বুদ্ধিদীপ্ত এবং গভীর অন্বেষণ-ঋদ্ধ হোক না কেন, আমাদের বিশ্লেষণের সূত্র ছিন্ন হবে যদি না সাদৃশ্যের এই সূক্ষ্ম সূত্রটিকে আমরা অতি সতর্ক নিপুণতার সঙ্গে অনুক্ষণ রক্ষা করে চলি। প্রশ্ন উঠতে পারে এই অবিচ্ছিন্ন ক্রমান্বয়তার উৎপত্তি কোথায়? যে যুক্তি ও অদ্ভুত মানসিক প্রবণতা হাস্যকৌতুকের রহস্যকে চিত্রকল্প থেকে চিত্রকল্পে, প্রথম ঘটনা থেকে ক্রমশঃ সুদূর প্রসারী বিভিন্ন ঘটনান্তরে প্রসারিত করে যতক্ষণ না তা অন্য অনেক আপাত বিসদৃশ অথচ সমগোত্রীয় দৃষ্টান্তের ভীড়ের মধ্যে অন্তর্হিত হয়, তার প্রকৃত চরিত্র কি? কোন্ সেই শক্তি যা একটি কাণ্ডকে অজস্র শাখা-প্রশাখায়, ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করে এবং তার মূলকে অজস্র শাখামূলে নিয়ে যায়? এক অমোঘ নিয়ম প্রত্যেকটি জীবন্ত শক্তিকে তার জন্য নির্দিষ্ট সীমিত সময়ের মধ্যেই যতদূর সম্ভব ব্যাপক পরিসরের মধ্যে নিজেকে পরিব্যাপ্ত করার ক্ষমতা দেয়। বাস্তবিক, মানুষের কৌতুকপ্রিয়তা একটা প্রাণবন্ত শক্তি—যেন একটা জীবন্ত উদ্ভিদ্ মানবসমাজের পাথুরে মাটিতে অবলীলাক্রমে বেড়ে উঠেছে, সমাজ ও সংস্কৃতির অনেক পরিশীলিত শক্তির সঙ্গে এখনও পর্যন্ত সমানে প্রতিযোগিতা করে চলেছে। স্বীকার করতে হবে এ-পর্যন্ত যে-ধরনের হাস্যকৌতুকের দৃষ্টান্ত নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি সেগুলো কৌতুকহাস্যের মহত্তর দৃষ্টান্ত থেকে অনেক দূরে। পরের অধ্যায়ে সেই মহত্তর শিল্পের দিকে আমরা আরও একটু অগ্রসর হব, যদিও অবিমিশ্র মহৎ শিল্পের একান্ত পরিসরে প্রবেশ করা তখনও সম্ভবপর হবে না। শিল্পের ঠিক তলার মহলে আমরা পাই শিল্প-প্রযুক্তি (artifice) এবং প্রকৃতি ও শিল্পের অন্তর্বর্তী এই শিল্প-প্রযুক্তির জগতেই এবার আমরা ঢুকবো। এখন আমরা কৌতুকনাটক ও প্রহসনের রচয়িতা এবং রসিকচিত্ত (l'homme d'esprit) নিয়ে আলোচনা করব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরিস্থিতিগত কৌতুকহাস্য : সংলাপে কৌতুকহাস্য

এতক্ষণ আমরা গঠন, মানসিকতা ও গতিবিধির মধ্যে কৌতুকহাস্যের অস্তিত্ব নিয়ে অনুসন্ধান করেছি। এখন আমাদের আলোচনার বিষয় হবে মানুষের ক্রিয়াকলাপ ও মানবিক পরিস্থিতিতে হাস্যরসের উৎস। নিঃসন্দেহে বিভিন্ন হাস্যকর পরিস্থিতি অতি সহজে আমাদের প্রত্যেক্যের জীবনে লক্ষ করা যায়। কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনের ঐসব পরিস্থিতি থেকে হাস্যরসের চরিত্র বিশ্লেষণ করা খুব সোজা কথা নয়। একথা যদি সত্য হয় যে রঙ্গমঞ্চে জীবনের সত্যকেই একটু রং চড়িয়ে এবং সেই সঙ্গে কিছুটা সরলীকৃতরূপে উপস্থাপিত করা হয়, তাহলে কৌতুকনাটক আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের ওপর জীবনের চেয়েও বেশি আলোকপাত করতে পারে। হয়তো এই সরলীকরণের ব্যাপারটাকে আমরা আরও একটু এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি এবং শৈশবের স্মৃতিচারণ করে বুঝতে পারি যে ছোটবেলায় যে সব ক্রিয়াকলাপ আর খেলাধুলা আমাদের আনন্দ দিত সেগুলির মধ্যেই এমন সব সূক্ষ্ম সূচক বর্তমান যেগুলোর মিশ্রণের মধ্যেই আমরা পূর্ণবয়স্ক মানুষ হিসেবেও হাস্য-রসের বীজ খুঁজে পেতে পারি। আমাদের আনন্দ ও বেদনার অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রায়ই আমরা এমনভাবে কথা বলি যেন মনে হয় ঐসব অভিজ্ঞতা হঠাৎ আমাদের জীবনে তাদের সম্পূর্ণ রূপ নিয়ে হাজির হয়েছে—যেন তাদের প্রত্যিটির পেছনে কোন দীর্ঘ ইতিহাস নেই। আরও বড় কথা হোল, আমাদের বেশির ভাগ আনন্দসূচক অভিজ্ঞতা ও আবেগের পেছনে যে ছোটবেলার কোন না কোন অনুভূতি সুপ্ত থাকে সে কথা আমরা অতি সহজে ভুলে যাই। পরিণত জীবনের আনন্দময় নানা অভিজ্ঞতাকে খুঁটিয়ে বিচার করলে দেখতে পাব যে সেগুলির অধিকাংশের মূলই আমাদের শৈশবের আনন্দময় স্মৃতিতে নিহিত। যদি আমাদের অনেক অভিজ্ঞতা আর অনুভূতি

থেকে ছোটবেলার স্মৃতির অংশটুকু বাদ দিয়ে শুধু তাদের শৈশবনিরপেক্ষ অভিজ্ঞতা বা অনুভূতি হিসেবে গ্রহণ করতে চাই তাহলে দেখা যাবে সে-গুলোর আর বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই। কে জানে, হয়তো একটা বিশেষ বয়সের পর আমরা যাবতীয় নতুন এবং অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দে অংশ নিতে অক্ষম হয়ে পড়ি, আর বিপরীতপক্ষে, মধ্যবয়স্ক কোন লোক বোধ হয় শুধু শৈশবের স্মৃতিগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করেই জীবন থেকে আনন্দ সংগ্রহ করেন। যে অতীত ক্রমশঃই আমাদের নাগালের বাইরে চলে যায় এ যেন তারই থেকে ভেসে আসা ক্ষীণ অথচ মনোরম গন্ধবাহী মৃদু সমীরণ উপভোগ। এই মৌলিক অথচ স্থূল প্রশ্নটার যে উত্তরই দেওয়া যাক্ না কেন, একটা জিনিস নিশ্চিত : শিশু আর পরিণত বয়স্ক ব্যক্তির খেলাধুলা থেকে পাওয়া আনন্দের মধ্যে কোন রকমের বিচ্ছেদ বা বৈসাদৃশ্য নেই। আসলে হাস্তরসাত্মক নাটকও এক ধরনের খেলা, এবং এই খেলা জীবনেরই অনুকৃতি। আর যেহেতু শিশু যে পুতুলগুলো নিয়ে খেলা করে তার মধ্যে অনেকগুলির নড়াচড়া আর গতিবিধি অদৃশ্য সুতো দিয়ে পেছন থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, বহু প্রহসনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে যোগসূত্রের পেছনে আমরা ঐ রকম কোন সুতোর সন্ধান পাই—অবশ্য বহুল ব্যবহারের ফলে এই সুতো হয়তো এখানে ওখানে কিছুটা জীর্ণ হয়ে গেছে। শৈশবের খেলাধুলার প্রসঙ্গ দিয়ে বর্তমান অনুসন্ধান শুরু করে আমরা লক্ষ করব কিভাবে শিশু নিজে যেমন বড় হতে থাকে তেমনি প্রায় নিজের অজান্তে সে তার পুতুল-গুলোকেও বড় করে তোলে, তাদের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করে, এবং শেষ পর্যন্ত তাদের এমন একটা অনিশ্চিত পরস্পরবিরোধী অবস্থায় (l'état d'indecision) নিয়ে আসে যেখানে তারা সুতো-দিয়ে-খেলানো পুতুলের বৈশিষ্ট্য না হারিয়েও, অনেক মানুষী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়। এইভাবে আমরা এক বিশেষ শ্রেণীর হাসির নাটকের চরিত্রের আবির্ভাব দেখতে পাই। এর আগে বিশ্লেষণের সাহায্যে কৌতুকহাস্তের উৎস সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে আমরা পৌঁছেছি এবং যার সাহায্যে আমরা মোটামুটি যাবতীয় হাস্তকর পরি-স্থিতির লক্ষণ নিরূপণের চেষ্টা করব সেই সব নিয়ম বা সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য

আমরা এই ধরনের কৌতুকপ্রদ চরিত্রের ওপর প্রয়োগ করে যাচাই করে নেব। বলা যায়, কাজ ও ঘটনার যে সব বিন্যাস আর পারম্পর্য আমাদের চোখে জীবনানুগ অথচ যান্ত্রিক বলে মনে হবে তাই হ'বে হাস্যকর বা comique.

১ জ্যাক্-ইন-দ্য-বক্স (le diable á ressort)

বাক্সের ডালা তুললেই হঠাৎ তার ভেতর থেকে স্প্রিং-এর সাহায্যে লাফিয়ে ওঠা পুতুল নিয়ে আমরা সবাই ছোটবেলায় খেলা করেছি। পুতুলটিকে চেপে যতই দাবিয়ে রাখা হোক্ না কেন, ছেড়ে দেওয়ামাত্র তা লাফিয়ে ওঠে। তাকে যত জোরে চাপ দিয়ে ছোট করা হবে, ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা আরও তত বেশি জোরে লাফিয়ে ওপরে উঠবে। পুতুলটাকে যদি সজোরে বোতল বা বাক্সের ঢাকনার নিচে নামিয়ে দেওয়া হয়, ছেড়ে দিলেই তা ঢাকনা বা অন্য যা কিছু ওপরে থাকবে সেগুলিকে চারদিকে ছিটকে ছড়িয়ে দেবে। বলা কঠিন এই অদ্ভুত পুতুলটা ঠিক কতকালের পুরানো আবিষ্কার, কিন্তু এর থেকে পাওয়া আনন্দ যে চিরকালের তা অস্বীকার করার জো নেই। আসলে এর মজার পেছনে আছে দুটো একরোখা বিপরীত শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব বা সংঘাত ; এই শক্তি দুটোর একটা হোল মূলত যান্ত্রিক, যে শক্তিটি তার বিরোধী শক্তির দ্বারা পরাভূত আর খেলার উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ইঁদুর নিয়ে যেমন বেড়ালের খেলা—মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে সে ইঁদুরটাকে ছেড়ে দেয়—যেন স্প্রিং দেওয়া পুতুলটাকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে—কিন্তু তা শুধু পরমুহূর্তেই থাবা মেরে তাকে কাছে টেনে আনবার জন্য। বলা যেতে পারে আমাদের মত বেড়ালও ইঁদুররূপ এক ধরনের পুতুল নিয়ে খেলা করে।

এবার রঙ্গমঞ্চের দিকে ফেরা যাক্। পুতুলনাচের কথা দিয়েই শুরু করা যেতে পারে। মঞ্চে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ-সেপাই লাঠির এক ঘা খেয়ে শুয়ে পড়ে। সে অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়। দ্বিতীয়বার আবার দাঁড়িয়ে ওঠার অপরাধে তাকে একই ভাবে লাঠির ঘায়ে ধরাশায়ী

হতে হয়। অর্থাৎ বারবার স্প্রিং-এর ওঠানামার মত একটা যান্ত্রিক ব্যাপার এই সেপাইকে নিয়ে চলতে থাকে, আর সেই সঙ্গে দর্শকদের ক্রমবর্দ্ধমান হাসির শব্দে প্রেক্ষাগৃহ প্রতিধ্বনিত হতে থাকে।

এবার আমরা অন্ত আর এক ধরনের 'স্প্রিং'-এর কথা ভাবতে পারি—কোন নৈতিক ধারণা বা বিশ্বাসের 'স্প্রিং'। এই বিশ্বাসকে কখনও জোর করে চেপে রাখা হয়, আবার পরমুহূর্তেই সমস্ত বাধার বিরুদ্ধে তা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। কিংবা কারুর কোন বক্তব্যকে মাঝে মাঝে চেপে দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু বাইরের আরোপিত বাধা সরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে কথাগুলি আবার সবেগে বেরিয়ে আসছে। এখানেও সেই একই প্রক্রিয়া কাজ করছে—দুটো পরস্পরবিরোধী একরোখা শক্তির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এখানে কিন্তু জড়পদার্থসুলভ কয়েকটি বিশেষত্বকে আমাদের ভুলে যেতে হয়। এ-ক্ষেত্রে আমরা আর স্প্রিং-লাগানো পুতুলের খেলা দেখছি না, যথার্থ উচ্চমানের কৌতুকহাস্তের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি।

বলা চলে অনেক নাটকের অনেক মজার দৃশ্য এই সরল নীতির ওপর দাঁড়িয়ে। যেমন মোলিয়েরের *Mariage Forcé* (জোর-করে-দেওয়া বিয়ে) নাটকে স্গানারেল (Sganarelle) ও পাঁক্রাসের মধ্যে কথোপকথনে যে কৌতুক তাও লুকিয়ে আছে দুটো বিরোধী শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্বে। শক্তি দুটির মধ্যে একটি হোল স্গানারেলের নিজের কোন মত বা ধারণা, যেটা সে পাঁক্রাস্‌কে শোনাবেই; আর দ্বিতীয়টি দার্শনিক পাঁক্রাসের স্গানারেলের কথায় কান না দিয়ে অনবরত বকে চলা। দৃশ্যটি যত এগোয় ঐ স্প্রিং-দেওয়া পুতুলের ছবিটি আমাদের মনে ততই জাগতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত ঐ দৃশ্যের চরিত্রদুটি যন্ত্রচালিত পুতুলের মত ব্যবহার করতে থাকে। পাঁক্রাস্‌ স্টেজে ঢোকামাত্র স্গানারেল তাকে ধাক্কা মেরে নেপথ্যে পাঠিয়ে দেয়। পাঁক্রাস্‌ও প্রত্যেকবার মঞ্চে ফিরে এসে তার বক্তব্য রাখবার চেষ্টা করে। শেষ পর্যন্ত যখন স্গানারেল তাকে বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়—যেন বাক্সের মধ্যে সেই স্প্রিং দেওয়া পুতুলটাকে ঢুকিয়ে বাক্সের ডালা বন্ধ করে দেয়—তখন পাশের একটা জানলা হঠাৎ খুলে সেখান থেকে

দার্শনিকের মাথা আবার বেরিয়ে আসে। মনে হয় বাক্সের ডালা খুলে যান্ত্রিক পুতুলের মাথা চাড়া দিয়ে বেরিয়ে এসেছে।

ঠিক এই ধরনের মজার দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় ঐ নাট্যকারেরই *Malade Imaginaire* (কাল্পনিক রোগের রোগী) নাটকে। অবমানিত চিকিৎসকসমাজের প্রতিবাদ আর বিষোদ্গার মঃ পুরগোঁর মুখ দিয়ে আরগাঁর (Argand) বিরুদ্ধে ধ্বনিত হয়। যত রকমের রোগ আছে সব যেন আরগাঁকে ঘিরে ধরে। আর পুরগোঁর বাক্যবাণকে থামাবার জন্তে আরগাঁ যতবার চেয়ার ছেড়ে ওঠে, পুরগোঁও সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে যায়, যেন আর কেউ তাকে ঠেলে মঞ্চের বাইরে সরিয়ে দেয়; কিন্তু পরের মুহূর্তেই যেন কোন স্প্রিং তাকে আবার স্টেজের ঠিক মাঝখানে ছুঁড়ে পাঠিয়ে দেয় আবার পুরোদমে আরগাঁকে গালিগালাজ করার জন্ত। "মঃ পুরগোঁ" এই দুটি কথা মাঝে মাঝে নির্দিষ্ট একটা বিরতির পর বারবার নিয়ম করে ধ্বনিত হয়—যেন কোন গানের ধুয়ো।

এখন, বারবার চেপে দেওয়া আর প্রতিবারেই লাফিয়ে ওঠা স্প্রিং-এর পুতুলের চিত্রকল্পটিকে আমরা একটু তলিয়ে বিশ্লেষণ করতে পারি। এই চিত্রকল্পটির কেন্দ্রবিন্দুটিকে আবিষ্কার করতে পারলেই আমরা কৌতুক-হাস্যের পেছনে সক্রিয় সনাতন আর শাশ্বত নীতি অর্থাৎ 'পুনরাবৃত্তি' পদ্ধতির মুখোমুখি দাঁড়াব।

প্রশ্ন ওঠে, মঞ্চের ওপর বারবার উচ্চারিত কোন উক্তি কেন আমাদের হাসায়? কৌতুকহাস্যের কোন সূত্রই এই সহজ ও সরল প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারে বলে মনে হয় না। ফলে, যখন কোন বাক্য বা বাক্যাংশের কৌতুককরতার কারণ আমরা তার মধ্যে খুঁজে পেতে চাই, অর্থাৎ শব্দগুলির ব্যঞ্জনা ভুলে শুধু শব্দগুলিকেই গুরুত্ব দিই, তখন এই সমস্যা সমাধানের বাইরে থেকে যায়। এই চিরাচরিত প্রথার ব্যর্থতা অন্ত কোথাও এত প্রবলভাবে অনুভব করা যায় না। যে বিশেষ পটভূমি নিয়ে আমরা আবার আলোচনা করব তাকে বাদ দিয়ে শুধু কথাগুলির পুনরাবৃত্তিই হাস্যকর হতে পারে না। বারবার উচ্চারিত কোন উক্তি যখন একই সঙ্গে কোন নৈতিক

বৈশিষ্ট্যের দ্যোতক এবং কোন জড়ত্বের সূচক হিসেবে কাজ করে তখনই তা আমাদের কৌতুকবোধকে উদ্দীপিত করে।

এও খানিকটা ইঁদুর নিয়ে বেড়ালের খেলার মত। কোন শিশুর স্প্রিং-দেওয়া পুতুলকে বারবার বাক্সের মধ্যে চেপে রাখার চেষ্টার মত। কিন্তু কৌতুকনাটকে এই পদ্ধতিই অনেক বেশী দক্ষতা আর সূক্ষ্মতর ও গভীরতর মননশীলতার সঙ্গে ব্যবহার করা হয়—সেখানে সমস্ত ব্যাপারটাই দর্শকের অনুভূতি ও চিন্তাকে সক্রিয় রাখার উদ্দেশ্যে কল্পিত আর উপস্থাপিত। বাক্য ও বাক্যাংশের পুনরাবৃত্তির সাহায্যে যে কৌতুকহাস্যের উদ্ভব হয় তার সূত্র খুঁজতে গিয়ে আমরা বলতে পারি, কোন বাক্যের কৌতুকাবহ পুনরুক্তির পেছনে আমরা সাধারণতঃ দুটো জিনিস লক্ষ করি: একটা অবদমিত কামনা যা কথায় কথায় স্প্রিং-এর মত মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চায়, আর তার বিরোধী অন্য একটা শক্তি বা চিন্তা যা প্রতিবার নতুন উদ্যমে ঐ প্রয়াসকে চাপা দিতে চেষ্টা করে।

যখন দোরিন (Dorine) ওরগোঁর (Orgon) কাছে তার স্ত্রীর অসুস্থতার বিবরণ দেয়, আর ওরগোঁও সমানে তার বিবৃতিতে বাধা দিয়ে তারতুফ্ (Tertuffe) সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে থাকে,—"আর তারতুফ্?" এই প্রশ্নটি যখন কয়েক মুহূর্তের ব্যবধানে বারে বারে উচ্চারিত হতে থাকে, তখন আমাদের পরিষ্কার মনে হয় যেন একটা আটকে থাকা স্প্রিং বারবার ছাড়া পেয়ে লাফিয়ে বেরিয়ে আসছে। আর দোরিনও ঐ স্প্রিংটাকে বাধা দেবার জন্য প্রতিবারেই তার নিজের স্ত্রীর, অর্থাৎ এলমিরের অসুস্থতার কাহিনী পুনরাবৃত্তি করে আনন্দ পায়। অন্য আর এক দৃশ্যে বৃদ্ধ জেরোঁৎ (Geronte) কে সাপাঁ (Sapin) যখন খবর দেয় যে তার ছেলে জাহাজে বন্দী হয়েছে এবং তাকে ছাড়িয়ে আনতে গেলে এখনই মুক্তিপণ দিতে হবে তখন আমাদের ধারণা হয় জেরোঁৎ-এর কার্পণ্য নিয়ে সাপাঁ তার সঙ্গে এইভাবে মজা করছে, তারতুফ্ সম্বন্ধে ওরগোঁর দুর্বলতা নিয়েও যেমন দোরিন মজা করে। বৃদ্ধের কার্পণ্যের প্রকাশ যেই একটু চাপা পড়ছে বিবেকের মধ্যেই আবার তা মাথা তুলছে, এবং তার অর্থলালসার ঐ যান্ত্রিক স্বয়ংক্রিয়তার দিকে

নাট্যকার যখন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান তখন সে বলতে থাকে, "মুক্তিপণের অতগুলো টাকা কোথা থেকে পাওয়া যাবে ?" ঠিক একই কথা বলা চলে সেই দৃশ্যটি সম্বন্ধে যেখানে ভালেরি (Valerie) আরপাগোঁকে (Harpagons) বোঝাবার চেষ্টা করে যে তার মেয়ে যাকে ভালবাসে না তার সঙ্গে ওর বিয়ে দেওয়া কত বড় অন্যায় হবে। কিন্তু হাড়-কৃপণ আরপাগোঁ কয়েক সেকেণ্ড অন্তর অন্তর ভালেরিকে বাধা দিয়ে বলতে থাকে, "কোন পণ নেবে না এরা"। এই কথাগুলির প্রায় স্বতঃস্ফূর্ত আর যন্ত্রসদৃশ পুনরাবৃত্তির পেছনে আমরা আবিষ্কার করি একটা দৃঢ়মূল ধারণার দ্বারা চালিত পুনরাবৃত্তিকরার কোন স্বয়ংক্রিয় মনুষ্যদেহী যন্ত্রকে।

অবশ্য এই যান্ত্রিকতা সব সময়ে আমরা এত সহজে ধরতে পারি না। আর এইসব ক্ষেত্রে কৌতুকহাস্যের তত্ত্ব খুঁজতে গিয়ে আমরা আর একটা নতুন আর কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হই। কখনও কখনও একটা দৃশ্যের সমস্ত কৌতুক কোন বিশেষ চরিত্রের দ্বৈত প্রকৃতির মধ্যে নিহিত থাকে। তার সঙ্গে সংলাপরত অন্য চরিত্রটি যেন একটা প্রিজ্‌ম্ বা ত্রিপার্শ্ববিশিষ্ট কাচের খণ্ডের কাজ করে যার মাধ্যমে ঐ চরিত্রটির দ্বৈতপ্রকৃতি (dualité) দর্শকদের কাছে ধরা পড়ে। এই প্রতিক্রিয়ার আসল রহস্যটি যদি এই দুই চরিত্রের মধ্যে অভিনীত দৃশ্যটির বাহ্যরূপের মধ্যে খুঁজে পেতে চাই তা হলে আমরা ভুল পথে যাব ; আমাদের মন দিতে হ'বে সেই আভ্যন্তর গূঢ় তাৎপর্যটুকুতে যা আলোকের প্রতিসরণের মত প্রথম চরিত্রটির ভেতরের নানা রং আমাদের সামনে মেলে ধরে। ওরোন্ত্‌ (Oronte) যখন আলসেস্ত্‌[২২] (Alceste)-কে প্রশ্ন করে ওর কবিতা খারাপ লাগে কিনা এবং জবাবে আলসেস্ত্‌ এক কথাই বারংবার বলতে থাকে, "না, আমি তা বলছি না", তখন ব্যাপারটা হাসির হয়ে পড়ে যদিও ওরোন্ত্‌ আলসেস্ত্‌-এর সঙ্গে একটু আগে আলোচিত গূঢ়ার্থে কোন দ্বৈত-ভূমিকায় অভিনয় করছে না। কিন্তু এখানেও আমাদের সজাগ থাকতে হবে, কারণ আলসেস্তের মধ্যেও আমরা দুটো আলাদা চরিত্রের অস্তিত্ব অনুভব করি। তার মধ্যে একজন আছে দুর্মুখ আর মানববিদ্বেষী যে দেশকালপাত্র নির্বিশেষে স্পষ্ট

কথা বলার শপথ নিয়েছে। অন্যদিকে তারই মধ্যে রয়েছে সৌজন্য-পরায়ণ এক ভদ্রলোক যিনি সোজাসুজি তাঁর স্বাভাবিক বিনয় ও ভদ্রতাকে বিসর্জন দিতে অক্ষম, কিংবা এমন এক সজ্জন যাকে তাঁর বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করতে বললে অপরের সম্মান ও অনুভূতিতে সহজে আঘাত করতে অপারগ হন। তাই ওপরে উক্ত দৃশ্যটিতে সত্যিকারের দ্বন্দ্ব আলসেস্ত ও ওরোন্তের মধ্যে নয়, দ্বন্দ্ব আসলে আলসেস্ত্-এর নিজের মধ্যেই সক্রিয় দুটো পৃথক সত্তার মধ্যে। 'সরাসরি-অপ্রিয়-সত্য-বলতে-ভীত-নয়' এমন একটি সত্তার মুখের কথা উচ্চারণ হতে না হতে তার মুখ চেপে ধরে ওরই সজ্জন এবং সৌজন্যপরায়ণ অপর সত্তাটি। তাই "আমি সে-কথা বলছি না" এই কথাগুলি বক্তার ভেতরে ক্রিয়াশীল দুটি বিরোধী সত্তার মধ্যে সংঘাতের দ্যোতক। যে অপ্রিয় সত্যটি তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসার জন্য প্রবল চেষ্টা করছে তাকে রুদ্ধ করে রাখার ক্রমবর্দ্ধমান প্রয়াস ঐ কথাগুলির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। তাই কথাগুলি উচ্চারণের সুর উত্তরোত্তর হিংস্র হয়ে ওঠে। আলসেস্তের রাগও ক্রমশ বাড়তে থাকে। সে নিজে হয়তো ভাবে যে তার এই রাগ ওরোন্তের ওপর, কিন্তু আসলে সে নিজের ওপরেই ক্রমশ রেগে উঠছে। এইভাবে সেই যান্ত্রিক স্প্রিংটির 'টেনশন' প্রতিবারেই নতুন করে জেগে ওঠে আর জোরালো হয় যতক্ষণ না তা একটা বিরাট বিস্ফোরণে ফেটে পড়ে। অন্য উদাহরণগুলোর মত এটিও আমাদের পুনরাবৃত্তিসঞ্জাত যান্ত্রিকতার চেতনা দেয়।

কেউ যদি শপথ নেয় যে সে আসলে যা সত্যি বলে ভাবে তা ছাড়া অন্য কিছু বলবে না; এমন কি এর ফলে তাকে যদি কার্যত সারা মানব-সমাজের বিরুদ্ধে যেতে হয় তা হলেও না, তখন এই শপথটির মধ্যে আপাত-রূপে কোন হাস্যকর ব্যাপার থাকার কথা নয়। এই ধরনের প্রতিজ্ঞা মানুষের মহত্তম আদর্শের দৃষ্টান্ত বলে মেনে নিতেই হয়। অন্য আর একজন যদি সহৃদয়তা, কিংবা স্বার্থপরতা, কিংবা পরম ঔদাসীন্যবশতঃ লোকের মন রেখে কথা বলার সিদ্ধান্ত নেয় তাতেও কৌতুকবোধ করার সঙ্গত কোন কারণ নেই। এখন আমরা এই দুই একেবারে উল্টো চরিত্রের লোকের বৈশিষ্ট্য

নিয়ে এমন একটি চরিত্র তৈরি করতে পারি যে অপ্রিয় স্পষ্টবাদিতা আর কপট বিনয়ের মধ্যে দোদুল্যমান। কিন্তু এই দুই পরস্পরবিরোধী বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তাও এমনিতে আমাদের কাছে কৌতুকের ব্যাপার বলে মনে হয় না। বরঞ্চ এই দুই বিরোধী মানসিকতা একই চরিত্রের মধ্যে পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে আমাদের কাছে চরিত্রটির আন্তরিকতা ও সততার সূচক হিসেবে প্রতিভাত হতে পারে। অপরপক্ষে, যদি কোন প্রকৃত জীবন্ত মানুষের মধ্যে এই দুই শক্তিকে নমনীয়তাশূন্য, অপরিবর্তনীয় চারিত্রিক উপাদান হিসেবে দেখতে পাওয়া যায় এবং যদি তার ফলে চরিত্রটি এক চরম বিন্দু থেকে একেবারে বিপরীতমুখী অন্য একটি চরম বিন্দুর মধ্যে অনুক্ষণ অবস্থিত ও দোদুল্যমান থাকে; বিশেষত: যদি দেখা যায় যে এই দোদুল্যমানতা চরিত্রটিকে একটি স্থিতিস্থাপকতাশূন্য যন্ত্রে পরিণত করেছে এবং তার ফলে তার মনটি অভ্যাসদুষ্ট, অপরিণত এবং শিশুসুলভ একগুঁয়েমির শিকার হয়েছে তা হলে অবশ্যই হাস্যকর যে-সব দৃশ্য এর আগে আলোচিত হয়েছে সেগুলির মধ্যে পাওয়া চিত্রকল্পটি এক্ষেত্রেও আমাদের চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠবে—এখানেও আমরা একটা জীবন্ত জিনিসের মধ্যে যান্ত্রিক অতএব হাস্যকর কিছুর অস্তিত্ব উপলব্ধি করব।

Jack in the box (বাক্সের মধ্যে স্প্রিং দেওয়া পুতুল) চিত্রকল্পটি নিয়ে আমরা বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়েছি, কারণ আমরা দেখাতে চেয়েছি কৌতুকহাস্য নিয়ে সক্রিয় কল্পনা কিভাবে একটা জড়বস্তুসুলভ যান্ত্রিকতাকে চারিত্রিক ও নৈতিক যান্ত্রিকতায় রূপান্তরিত করে। এখন আমরা অন্য কয়েকটা ক্রিয়াকলাপ নিয়ে আলোচনা করব—অবশ্য আমাদের আলোচনাকে ঐ ক্রিয়াকলাপগুলির প্রাসঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই সীমিত রাখা হবে।

২ পুতুলনাচের পুতুল (Le pantin à ficelles) :

অনেক প্রহসনে আমরা একটা চরিত্র পাই যে মনে করে যে তার কথাবার্তা ও কাজকর্মে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং জীবনের যা কিছু মূল্যবান্ ও গুরুত্বপূর্ণ সবই তার আয়ত্তের মধ্যে। কিন্তু একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ

করলে বোঝা যায় যে অন্ত আর একজনের হাতে ঐ চরিত্রটি একটি পুতুল বা খেলনা বিশেষ এবং ঐ ব্যক্তি তাকে নিয়ে তার ইচ্ছেমত খেলা করছে। ছেলের হাতে সুতোলাগানো পুতুলের চিত্রকল্প থেকে সাপাঁ্যার (Sapin) যারা পুতুল হিসেবে ব্যবহৃত জেরোঁত্ (geronte) আর আরগাঁতের (Argante) প্রসঙ্গে আমাদের চিন্তাকে প্রসারিত করতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না। সাপাঁ্যার নিজের মুখের কথাই শোনা যেতে পারে, "বোঝাই যাচ্ছে যন্ত্রটা কোথায়"./কিংবা "ভগবান্ নিজেই ওদের আমাদের জালের মধ্যে এনে দিয়েছেন"। স্বাভাবিক প্রবণতার ফলে, এবং অন্ততঃ কল্পনায় আমরা প্রতারিত হওয়ার চেয়ে প্রতারণা করাকেই কাম্য বলে মনে করি, দর্শকদের সহানুভূতি বেশির ভাগ সময় প্রবঞ্চকের দিকে ঝোঁকে। বাকী সময়টা বাচ্চা ছেলে যেমন বন্ধুর কাছ থেকে পুতুল নিতে ভালবাসে, দর্শকও নিজের হাতে পুতুল নাচাবার সুতো নিয়ে পুতুলগুলোকে ইচ্ছেমত মঞ্চে হাজির করেন আর সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যান। শেষোক্ত এই ব্যাপারটি অবশ্য অপরিহার্য বা অনিবার্য নয়। মঞ্চে ঘটমান ব্যাপারগুলো থেকে আমরা নির্লিপ্ত থাকতে পারি যখন সমস্ত ঘটনার পেছনে নাট্যকারের তৈরি যান্ত্রিক বিন্যাস সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা রাখি। নাটকের কোন চরিত্র যখন দুটো বা ততোধিক বিরোধী ঘটনা বা চিন্তার মধ্যে দোদুল্যমান থাকে, তখনই ঐ ব্যাপারটা সক্রিয় হয়। যেমন প্যানার্জ (Panurge) চোখের সামনে যাকেই পায় তাকেই জিজ্ঞাসা করে তার বিয়ে করা উচিত হবে কিনা। আমাদের লক্ষ করতে হবে যে কৌতুক নাটকের রচয়িতা এ-হেন পরিস্থিতিতে সযত্নে দুটো পরস্পর বিরোধী সিদ্ধান্ত বা মনোভাবকে দুটি কিংবা একটি চরিত্রের মধ্যেই মূর্ত করে তোলেন। কারণ, দর্শক না থাকলেও যে-কোন অবস্থায় ঐ পুতুল খেলাবার সুতোকে নাড়াবার জন্তে নাট্যকারের এক বা ততোধিক চরিত্রের দরকার।

জীবনের যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ আর মূল্যবান্ জিনিসের উৎস আমাদের স্বাধীনতা। যে অনুভূতিকে আমরা পরিণত রূপ দিয়েছি, যে আবেগগুলো নিয়ে আমরা দিনরাত ভেবেছি, যে কাজগুলো সম্বন্ধে আমরা গভীরভাবে

অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করেছি, সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং শেষ পর্যন্ত সেগুলোকে কাজে রূপ দিয়েছি—অর্থাৎ যা কিছু আমাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে উদ্ভূত এবং যথার্থ ই আমাদের আত্মিক সেই সমস্ত ব্যাপার প্রায়ই জীবনকে নাটকীয় আর গুরুগম্ভীর রূপ দেয়। এই সব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারকে কৌতুক-প্রদ করে তুলতে হলে আমাদের কি করণীয়? শুধু কল্পনা করতে হবে আমাদের আপাত স্বাধীনতার পেছনে লুকানো আছে পুতুলনাচের পুতুলকে নাচাবার সুতো, আর, কবির ভাষায়, আমরা সবাই

> পুতুলনাচের তুচ্ছ পুতুল
> সূত্র যাহার ভাগ্যদেবীর হাতে।
> d'humbles marionnettes
> Dont le fil est au mains de la Necessité.

তাই বলা যায় জীবনে এমন কোন গম্ভীর বা নাটকীয় দৃশ্য নেই যাকে আমাদের কল্পনা এই ধরনের চিত্রকল্পের সাহায্যে কৌতুকাবহ করে তুলতে না পারে। আর, যে-কোন খেলার এত বড় ক্ষেত্রও আর নেই।

° তুষার-গোলক (La boule de neige)

কৌতুকহাস্য সৃষ্টির পদ্ধতির অনুসন্ধানে আমরা যত এগুবো, আমাদের শৈশবের অসংখ্য স্মৃতির ভূমিকা সেখানে ততই পরিষ্কার হয়ে উঠবে। এই সব স্মৃতি কোন বিশেষ খেলার কথা আমাদের মনে না জাগিয়ে এমন একটা যান্ত্রিক পদ্ধতির কথা মনে করিয়ে দেয়, যার বিভিন্ন প্রয়োগের মধ্যে একটি হোল এই খেলাটি। তা ছাড়া অনেক সময় একটি সাধারণ নিয়ম বিভিন্ন খেলায় প্রযুক্ত হয়। যেমন সংগীতের বিভিন্ন সুর ও তার বিন্যাসের মধ্যে একই স্বরের প্রয়োগ। খুব সূক্ষ্ম নানা স্তর ও পর্যায় অতিক্রম করে শিশুর খেলা থেকে পূর্ণবয়স্ক লোকের খেলায় পর্যন্ত যে মূল নীতিগুলি প্রযুক্ত এবং যার প্রয়োগের উদাহরণ হিসেবে বিভিন্ন খেলাকে ব্যবহার করা হয় সেগুলি মনে রাখার মত। উদাহরণ হিসাবে আমরা একটা তুষার-গোলকের কথা তুলতে পারি—যে গোলকটি গড়াতে গড়াতে ক্রমশঃ বড় হতে থাকে। তেমনি

আমরা কল্পনা করতে পারি সারি সারি দাঁড়ানো পুতুলসৈন্তদের ছবি। সারির প্রথম পুতুলটিকে ঠেলা দিয়ে ফেলে দেওয়া মাত্র সে দ্বিতীয়টির ওপর পড়ে, দ্বিতীয়টি পড়ে তৃতীয়টি ওপর এবং পরিস্থিতি জটিল থেকে জটিলতর হতে থাকে যতক্ষণ না শেষ পুতুলটি পর্যন্ত ধরাশায়ী হয়। কিংবা অনেক পরিশ্রম আর যত্ন দিয়ে তৈরি তাসের বাড়ির কথাও ভাবা যেতে পারে। যে তাসটিকে প্রথমেই ছোঁয়া হয় দু'এক মুহূর্ত সেটি অনিশ্চিত অবস্থায় থাকে, কিন্তু তার ঠিক পাশের তাসটি কালক্ষেপ না করে পড়ে যায় এবং তারপর যত সময় যায় ধ্বংস ও পতনের পর্ব তত দ্রুতলয়ে ঘটতে থাকে এবং কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে সমস্ত প্রাসাদটি ধূলিসাৎ হয়ে যায়। তুষার-গোলক, পুতুল-সৈন্ত আর তাসের ঘর, এগুলি পরস্পরের থেকে আলাদা আর বিচিত্র। কিন্তু আমরা বলতে পারি যে এগুলির প্রত্যেকটি একটি সাধারণ তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করে এবং সেই তত্ত্বটি হোল, ঘটনাগুলি পাটিগণিতের প্রগতি অনুযায়ী ঘটতে থাকে এবং এই ঘটনাগুলির প্রথম ধাপটি তুচ্ছ হলেও বিবর্তনের নীতি অনুযায়ী তার পরিণতি হয়ে ওঠে যেমন গুরুত্ব-পূর্ণ, তেমনি অপ্রত্যাশিত। এবারে আমরা ছোটদের জন্ত তৈরি একটি ছবির বই নিয়ে বসতে পারি। বইটিতে দেখতে পাওয়া যাবে কিভাবে প্রদর্শিত পদ্ধতিতে সাজানো ঘটনাপরম্পরা একটা উচ্চমার্গের হাস্তকৌতুকের জগতের দিকে এগিয়ে গেছে। প্রথম ছবিতে দেখা যাচ্ছে এক আগন্তুক হন্তদন্ত হয়ে একটা বাড়ির বৈঠকখানায় ঢুকে পড়েছেন ; ঢুকেই তিনি এক ভদ্রমহিলাকে ধাক্কা দিয়েছেন ; ধাক্কা খেয়ে মহিলা তাঁর হাতের চায়ের কাপটি এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের গায়ে ছিটকে ফেলেছেন ; ভদ্রলোকটি আবার ধাক্কা খেয়ে বেসামাল হয়ে জানালার কাচের শার্শি ভেঙে একেবারে রাস্তায় চলমান এক পুলিশ কন্‌স্টেবলের মাথায় পড়েছেন। ফলে স্থানীয় পুলিশ-বাহিনীর মধ্যে ভয়ঙ্কর সোরগোল পড়ে গেছে। ঠিক এই জাতের ঘটনা-বিন্তাস বয়স্কদের জন্ত কৌতুকশিল্পীদের আঁকা নানা ছবির মধ্যে বারবার ঘুরে ফিরে আসে। ভাষা ব্যবহার না করেই শুধু ছবি দিয়ে বর্ণিত নানা কাহিনীতে (Comiques) আমরা স্রাম্যমান কোন বস্তু আর তার সঙ্গে

সংশ্লিষ্ট নানা চরিত্রের দেখা পাই, এবং ফলে ধারাবাহিক কতকগুলো দৃশ্যের মাধ্যমে আমরা শুধু ঐ বস্তুটির অবস্থানের পরিবর্তন সম্বন্ধেই সচেতন হই না, তার সঙ্গে চরিত্রগুলির অবস্থারও প্রায় যান্ত্রিক উপায়ে পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়। এবার কৌতুকনাটক এবং প্রহসনের দিকে নজর দেওয়া যেতে পারে। শুধু ভাঁড়ামোর অসংখ্য দৃশ্যে নয়, বহু উঁচুদরের কৌতুকনাটকে এই অতি সহজ ও সরল পদ্ধতির ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। প্লেদর (*Plaideur*)[২৩] নাটকে চিকানো (Chicanneau) বলে চরিত্রটির কথাগুলোর দিকে আমরা কান দিতে পারি। সেখানে আমরা একটা মামলার মধ্যে আরও একটা মামলার সন্ধান পাই এবং এই বিন্যাসপদ্ধতি ক্রমশঃ দ্রুততর হতে থাকে। আইনের পরিভাষা ঘন ঘন ব্যবহার করে নাট্যকার রাসিন্[২৪] (Racine) এই দ্রুততর গতির উপলব্ধি দেন, যতক্ষণ না একটা তুচ্ছ খড়ের আঁটিকে কেন্দ্র করে একটা মামলার ফলে বিবাদীকে তার সম্পত্তির বেশির ভাগটাই হারাতে হয়। ঠিক অনুরূপ ঘটনাবিন্যাস দেখা যায় ডন কিহোটের (*Don Quixote*) কতকগুলি দৃশ্যে। যেমন, একটা সরাইখানায় সংঘটিত কতক-গুলো উদ্ভট ঘটনাপরম্পরার ফলে এক খচ্চরচালক সাঙ্কোকে একটা চড় কষিয়ে দেয়, সাঙ্কোও উল্টে মারিওতোরনেকে (Mariotorne) উত্তমমধ্যম দেয়, আবার সরাইখানার মালিক মারিওতোরনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অবশেষে, আধুনিক লঘু প্রহসনের প্রসঙ্গে আসা যাক্। কত বিচিত্র ঢং-এর বিন্যাস পদ্ধতি যে এই ধরনের নাটকে চোখে পড়ে তার ইয়ত্তা নেই। একটা পদ্ধতি তো প্রায়ই দেখা যায় : কোন একটা জিনিস—ধরা যাক্ একটা চিঠি—কারুর কাছে ভীষণ দরকারী এবং যেন তেন প্রকারেণ লোকটি চিঠিটা হাত করবেই ; নাটকের ক্ষেত্রে এই রকম একটা পরিস্থিতি বসানো হয়েছে। কিন্তু যে মুহূর্তে চিঠিটি লোকটির নাগালের মধ্যে আসছে, সেইমুহূর্তে কোন একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনার ফলে সে সেটা পেতে বিফল হচ্ছে। এ-ধরনের একটা ঘটনা উত্তরোত্তর অনেক জটিলতর আর অচিন্তিতপূর্ব পরিস্থিতির জন্ম দিতে পারে। প্রথমে এ-ধরনের কোন ঘটনাকে নিশ্চয়ই ছেলেমানুষী বলে মনে হয় না। কিন্তু একটু ভাবলেই বোঝা যাবে আমাদের ছেলেবেলার

অনেক খেলাতেই ঠিক এই জাতের কোন পরিস্থিতি থাকত। তুষার গোলক গড়াতে গড়াতে উত্তরোত্তর বড় হতে থাকার সূত্রটিই এখানে কার্যকর।

এই ধরনের যান্ত্রিক চরিত্রের ঘটনাবিন্যাসের বৈশিষ্ট্য হোল সমস্ত ব্যাপারটাকে আবার উল্টোদিকে পাক খাইয়ে দেওয়া। বাচ্চা ছেলেরা খুব মজা আর উত্তেজনা বোধ করে যখন একটা ছুটন্ত আর ঘুরন্ত বল এগোতে এগোতে তার সামনের যাবতীয় জিনিস ছিটকে ফেলে দিয়ে এলোমেলো করে দেয়। ওদের আরও বেশি মজা লাগে যখন ঐ বলটা আবার নানা ঢং-এ এঁকে বেঁকে যেখান থেকে তার যাত্রা শুরু করেছিল সেখানেই ফিরে আসে। অর্থাৎ এতক্ষণ যে পদ্ধতির বর্ণনা করা হোল তা সোজা পথে গেলেও আমাদের হাসি পায়, আর সেই গতি যখন বৃত্তাকারে ঘটে এবং খেলোয়াড়ের অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও কার্যকারণ তত্ত্বের অনিবার্য ফল হিসেবে তার উৎসের দিকে ফিরে আসে তখন ঘটনাটি দর্শকের মনে আরও জোরালো কৌতুক জাগায়। বলা চলে অনেক লঘু প্রহসন এই সূত্রকে নিয়ে কল্পিত এবং আবর্তিত। লাবিশের *Un Chapeau du Paille d'Italie* (The Italian Straw Hat) নাটকে দেখা যায় খড়ের তৈরি ইতালির একটা টুপি ঘোড়ায় খেয়ে ফেলেছে। সারা পারী শহরে আর মাত্র একটি ঐরকম টুপি আছে। দাম যতই লাগুক, ঐ টুপিটাকে হাতাতেই হবে। কিন্তু ঐ অভিলষিত টুপিটি নাটকের প্রধান চরিত্রকে অনুক্ষণ তটস্থ করে রাখে কারণ যেই টুপিটা তার হাতের মুঠোয় এসেছে বলে মনে হয়, তখনই অপ্রত্যাশিত কোন একটা কারণে সেটা ওর নাগালের বাইরে চলে যায়। নায়কের পেছনে ঘোরাফেরা করছে অন্য অনেক চরিত্র চুম্বকে আকৃষ্ট লোহার মত টুপিটার পেছনে ছোটাছুটি করে। শেষ পর্যন্ত নানা কঠিন বাধা পেরিয়ে অভীষ্ট টুপিটা যখন নায়কের হাতে এসে যায়, তখন দেখা যায় যে-টুপিটাকে ঘিরে এত উত্তেজনা আর ব্যস্ততা তা আসলে সেই আপাতরূপে ঘোড়ায় খেয়ে ফেলা টুপিটাই। ঠিক একই ধরনের আবিষ্কার দেখানো হয়েছে লাবিশের লেখা অন্য আর একটা কৌতুকনাটকে। যবনিকা উঠলে দেখা যায় একজন বয়স্কা মহিলা আর প্রায় সমবয়সী একজন পুরুষ মঞ্চের ওপর বসে। দু'জনেই

অবিবাহিত। এঁদের দু'জনের মধ্যে অনেক দিনের পরিচয় এবং প্রতিদিনের মত আজও তাঁরা তাস নিয়ে বসেছেন। পরস্পরের অজ্ঞাতে দু'জনেই একই প্রজাপতি বা ঘটকের অফিসে নিজের নিজের বিয়ের জন্য পাত্র ও পাত্রী খুঁজছেন। হাজার কঠিন পরিস্থিতি কাটিয়ে, একটার পর একটা অনেক সমস্যার সমাধান করে দু'জনেই লক্ষ্যের দিকে এগোতে থাকেন। সমস্ত প্লট জুড়ে এই ঘটনা চলতে থাকে, এবং শেষ পর্যন্ত দুজনে যখন পরস্পরের বর-কনে হিসেবে মুখোমুখি দাঁড়ান তখনই নাটকের যবনিকা পড়ে। এটাও ঐ একই জাতের বৃত্তাকার প্লট, অর্থাৎ নাটকের ঘটনা যে-পরিস্থিতি নিয়ে শুরু সেইখানেই তার শেষ। এই ধরনের ব্যাপার আমরা সাম্প্রতিক বহু নাটকে দেখি। স্ত্রী-তাড়িত এক ভদ্রলোক ভাবলেন ডিভোর্স করে তাঁর দজ্জাল স্ত্রী আর শাশুড়ীর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছেন। তিনি আবার বিয়ে করলেন—কিন্তু হা হতোস্মি, বিবাহ-বিচ্ছেদ আর পুনর্বিবাহের যুগ্মচক্রে তিনি এবার তাঁর প্রাক্তন স্ত্রীকে পেলেন নতুন শাশুড়ী হিসেবে, আগের চেয়েও বেশি বিপজ্জনক ভূমিকায়!

যখন আমরা এই ধরনের কৌতুকহাস্যের তীব্রতা বুঝতে পারি আর দেখি যে অনেক নাট্যকার বারবার এই রকম অপ্রত্যাশিত পরিণতিসমৃদ্ধ পরিস্থিতি ব্যবহার করেন, তখন আমরা সহজেই বুঝি কেন এই ব্যাপারটা কোন কোন দার্শনিকের চিন্তার বিষয় হয়েছে। নানা পথ ঘুরে যেখানে প্লটের শুরু অজান্তে সেইখানেই শেষ পর্যন্ত ফিরে আসার এই ব্যাপার মূলত: অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও ব্যর্থতার কাহিনী। তাই এই শেষ উদাহরণটির ভিত্তিতে কৌতুকহাস্যের লক্ষণ বা সংজ্ঞা নিরূপণের চেষ্টা একেবারে নিরর্থক নয়। কৌতুকহাস্য সম্বন্ধে হার্বার্ট স্পেনসার[২৫]-এর ধারণাও একই শ্রেণীর। তাঁর মতে, কোন জিনিস আয়ত্ত করার জন্য আমাদের সব চেষ্টা যখন বিফল হয়, তারই সূচক হিসেবে কৌতুকহাস্যের উদ্ভব। স্পেন্সার-এর আগে জার্মান দার্শনিক কান্ট[২৬] (Kant) প্রায় অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন: আমাদের আশা যখন নৈরাশ্যে পরিণত হয়, তার প্রকাশ ঘটে কৌতুকহাস্যের মাধ্যমে। নিঃসন্দেহে কৌতুকাস্য সম্বন্ধে এই বিশ্বাসগুলো

আমাদের উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। একথা স্পষ্ট যে কৌতুক-হাস্তের এই লক্ষণগুলো পরিস্থিতি নির্বিশেষে প্রয়োগ করা চলে না, কারণ আমরা জানি যে বহু ক্ষেত্রে আমাদের প্রয়াসের ব্যর্থতা আমাদের মনে কৌতুক জাগায় না। একটি নাটক থেকে উদ্ধৃত দৃশ্যগুলো যেমন আমাদের দেখায় 'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া'র নানা দৃষ্টান্ত, তেমনি এমন আরও কতকগুলি দৃশ্যের আমরা উল্লেখ করেছি যেগুলি অন্তপক্ষে দেখায় কিভাবে তুচ্ছ কারণ থেকে বৃহত্তর বা জটিলতর পরিস্থিতি বা ঘটনার উদ্ভব হয়। কিন্তু এই দ্বিতীয় সূত্রটি যে প্রথমটির চেয়ে মূল্যবান্ বা গুরুত্বপূর্ণ তা ভাববার কোন যুক্তি নেই। কার্য ও কারণের মধ্যে অসঙ্গতি বা অসামঞ্জস্য মাত্রই—তা যেদিকেই হোক্ না কেন—সরাসরি কৌতুকহাস্তের উৎস হতে পারে না। শুধু এই অসঙ্গতি বা অসামঞ্জস্যের ফলে যদি কোন গভীর সত্যের প্রকাশ ঘটে, যেমন স্বচ্ছ কাচের ভেতর থেকে দৃশ্যমান কোন যান্ত্রিক ঘটনাবিন্যাস, যার মধ্যে মানুষী বুদ্ধিবৃত্তির অভাব আমাদের চোখে স্পষ্ট হয়ে ওঠে—তবেই তা আমাদের কৌতুকবোধকে জাগিয়ে তোলে। এই কৃত্রিমভাবে সাজানোর ব্যাপারটাকে যদি আমরা উপেক্ষা করি বা গুরুত্ব না দিই তাহলে হাসির পেছনে যে গোলকধাঁধার জগৎ তার মধ্যে দিয়ে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার একমাত্র সূত্রকেই আমরা হারিয়ে ফেলব। হাসির উৎস সম্বন্ধে যদি আমরা এমন কোন পূর্বসিদ্ধান্ত (hypothèse) গ্রহণ করি যা খুব যত্নসহকারে মনোনীত কয়েকটি ক্ষেত্রেই শুধু প্রয়োগ করা যায় তাহলে দেখা যাবে কৌতুককর এমন অনেক ঘটনা আর পরিস্থিতি আছে যেখানে ঐ সিদ্ধান্ত প্রযুক্ত হতে পারে না।

কিন্তু মূল প্রশ্নটি থেকেই যাচ্ছে—এই ধরনের যান্ত্রিক ব্যবহারবিধি এবং ঘটনাবিন্যাস আমাদের কাছে হাসির বলে মনে হয় কেন? এই ব্যাপারটা সত্যিই অদ্ভুত যে কখনও কখনও কোন বিশেষ ব্যক্তি বা সামাজিক গোষ্ঠীর ইতিহাস বিবেচনা করলে আমাদের ধারণা হয় সে বা তারা যেন পেছনের কোন অদৃশ্য সুতো, তার বা স্প্রিং-এর দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এই অদ্ভুত উপলব্ধির কারণ কি? আবার, এই উপলব্ধি কেনই বা

হাসির কারণ হয়? এই প্রশ্নটিকে বহুবার বিভিন্নভাবে সাজালেও তার সঠিক উত্তর সব সময়েই অভিন্ন বা এক ধরনের হবে। মানুষের পক্ষে অশোভন, স্বাচ্ছন্দ্যহীন এবং আড়ষ্ট যে যান্ত্রিকতা আমরা মাঝে মাঝে মানুষেরই ব্যবহার ও কাজকর্মে লক্ষ করি তা আমাদের বিশেষ কৌতূহল জাগায় এবং জীবন্ত জিনিসের মধ্যে সক্রিয় 'অন্যমনস্কতা' হিসেবে আমাদের চিন্তার উদ্রেক করে। সমস্ত ঘটনা যদি একটা বিরামহীন চেতনার প্রবাহের মধ্যে ঘটতো তা হলে সেখানে কাকতালীয় কোন ব্যাপার থাকতো না। থাকতো না যুগপৎ ঘটমান কোন ঘটনানিচয়, ঘটতো না এমন কিছু যেখানে সূত্রপাত আর সমাপ্তি একই বিন্দুতে গিয়ে মেলে। সে-ক্ষেত্রে প্রতিটি ব্যাপার নিরবচ্ছিন্ন গতিতে বিবর্তিত এবং অগ্রসর হোত। যদি সব মানুষ সব সময়েই জীবন সম্বন্ধে সমভাবে সচেতন হোত, ব্যক্তিমানুষ যদি অনুক্ষণ সমাজের অন্য প্রতিটি সভ্যের সঙ্গে নিজের সংযোগ রেখে চলতো তাহলে কাউকেই স্প্রিং বা সুতোর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পুতুল বলে মনে হোত না। মানুষের ব্যক্তিত্বে যে দিকগুলো কোন জড় বা মননক্ষমতাহীন বস্তুর সঙ্গে মেলে সেইগুলোই কৌতুকপ্রদ। মানুষের স্থিতিস্থাপকতাশূন্য, যান্ত্রিক এবং স্বয়ংক্রিয় কাজকর্ম ও গতিবিধিগুলো হাস্যকর—তার কারণ ঐ কাজকর্ম ও চলাফেরার মধ্যে আমরা সচেতন বিচারক্ষমতা ও বুদ্ধিবৃত্তির স্পর্শ অনুভব করি না। এই কারণেই গোষ্ঠী ও ব্যক্তির জীবনে উৎকর্ষের অভাব আমাদের কাছে প্রকট হয়ে ওঠে—ঐ অভাবকে মোচন করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমরা সচেতন হই। কৌতুকহাসির মাধ্যমে আমরা ঐ ত্রুটির প্রতি আমাদের বিতৃষ্ণা প্রকাশ করি; তাই কৌতুকহাস্য সমাজের দ্বারা অনুমোদিত এমন একটা অস্ত্র যার সাহায্যে আমরা ব্যক্তিচরিত্র ও সমাজদেহে পরিলক্ষিত ত্রুটি, নিন্দনীয় চিন্তাহীনতা ও অন্যমনস্কতাকে দূর করার চেষ্টা করি।

কিন্তু এই ধরনের চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে কৌতুকহাস্য সম্বন্ধে আমাদের অনুসন্ধানের ক্ষেত্র আরও প্রসারিত হয়ে পড়ে। এ পর্যন্ত আমরা জানবার চেষ্টা করেছি কিভাবে ছোটবেলার আনন্দদায়ক যান্ত্রিক ব্যাপারগুলো প্রাপ্তবয়স্ক লোকের চিত্তবিনোদনের ক্ষেত্রেও কার্যকর। অর্থাৎ এখন পর্যন্ত

আমাদের অনুসন্ধানপদ্ধতি ছিল মূলত: অভিজ্ঞতাভিত্তিক (empirique)। এবার একটা একেবারে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং বিধিসম্মত সূত্রে (déduction) উপনীত হবার সময় এসেছে। তা করতে হলে আমাদের সমস্যাটির উৎসে গিয়ে সেই সরল আর শাশ্বত মূলনীতি (principe) খুঁজে পেতে হবে যা নানা রূপ ধরে খুব অল্প সময়ের জন্য হলেও নানা কৌতুকপ্রদ পরিস্থিতি ও ঘটনার জন্ম দেয়। এর আগে আমরা বলেছি যে কৌতুকরচনা ও প্রহসন বিভিন্ন ঘটনাকে এমনভাবে সন্নিবিষ্ট করে যাতে জীবনের বহিরঙ্গে এক ধরনের যান্ত্রিকতার প্রচ্ছন্ন প্রভাবকে উপলব্ধি করা যায়। এইবারে আমরা দেখতে পারি জীবনের কোন্ অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যগুলি বাইরে থেকে লক্ষ করলে জীবন ও যান্ত্রিকতার মধ্যে পার্থক্যগুলো আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর জন্য দরকার জীবন ও যন্ত্রের পরস্পরবিরোধী বৈশিষ্ট্যগুলোকে লক্ষ করা এবং তার থেকে এমন একটা সূত্র খুঁজে বের করা যার সাহায্যে কৌতুকহাস্যের যে-কোন প্রকৃত ও সম্ভাব্য প্রকাশের চরিত্র নির্ণয় করা সহজ হতে পারে।

আমাদের জীবন সময়ের দ্বারা বিবর্তিত হয়ে স্থানভেদে জটিল আকার নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। সময়ের পটভূমিতে জীবন একটা প্রাণীর মধ্যে অবিরাম অগ্রসর হতে থাকে যতক্ষণ না প্রাণীটি বার্দ্ধক্যে পৌঁছয়—অর্থাৎ জীবন কখনও পিছু হাটে না বা কোন জীবনে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে না। আবার যদি পরিসর বা স্থানের মধ্যে (dans l'espèce) জীবনকে দেখা যায় তাহলে পরস্পর নির্ভরশীল কতকগুলো জিনিসের সহাবস্থান চোখে পড়ে এবং ঐ জিনিসগুলো এমন একান্তভাবে পরস্পরের প্রয়োজনে সৃষ্ট যে তাদের মধ্যে একটিও ঠিক ঐ একই সময়ে একের বেশী, দুটি পৃথক জীবনের (organisme) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতে পারে না। তার মানে, প্রতিটি জীবন্ত সত্তার সম্পূর্ণ অনন্য এবং বিশেষ কতকগুলি ঘটনার সংযোগ আর বিন্যাস একটির বেশি দ্বিতীয় অন্য কোন জীবন্ত সত্তার মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে পারে না। বহিরঙ্গের অবিরাম পরিবর্তন, ঘটনাচক্রের পারম্পর্যের অপরিবর্তনীয়তা, প্রতিটি ঘটনাক্রমের অনন্য এবং নির্দিষ্ট

স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা, এইগুলি হোল জীবনের বাহ্য বিশেষত্ব। এই ব্যাপারগুলো প্রকৃত না আপাত সে প্রশ্ন অবান্তর; ঘটনা হোল, এই সব বৈশিষ্ট্য জীবন্ত যে কোন জিনিসকে যন্ত্রের থেকে একটা আলাদা সত্তা দেয়। এখন এই বিশেষত্বগুলির বিপরীত গুণগুলির কথা ধরা যাক্। সেখানে আমরা যে তিনটি প্রক্রিয়া লক্ষ করি সেগুলি হোল: পুনরাবৃত্তি (répétition), বিপর্যয় (inversion) এবং পারস্পরিক সংঘাত (interference de séries)। দেখা যায় যে খুব হালকা ধরনের কৌতুকহাস্যেও এই প্রক্রিয়াগুলো ব্যবহৃত হতে পারে। এগুলির বাইরে হাস্যরস সৃষ্টির অন্য কোন পদ্ধতি নেই।

বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এর আগে আমরা যে সব দৃষ্টান্ত দেখিয়েছি বিভিন্ন অনুপাতে হলেও তাদের প্রত্যেকটিতেই, বিশেষ করে শিশু ও বালকবালিকাদের জন্য উদ্ভাবিত নানা খেলাধুলায়, এই পদ্ধতিগুলিই কাজে লাগানো হয়। উক্ত দৃষ্টান্তগুলোতে এই পদ্ধতিগুলোকে কিভাবে কাজে লাগানো হয়েছে তা বিশদ করে আলোচনা করতে অনেক সময় লেগে যাবে, তাই নতুন কতকগুলি উদাহরণের সাহায্যে আমরা এই পদ্ধতিগুলোর নির্ভেজাল রূপের আলোচনা করব।

১। পুনরাবৃত্তি (répétition): আমাদের এবারের আলোচ্য জিনিস আগের মত কোন ব্যক্তির বলা একটা কথা কিংবা একটা পুরো বাক্যের পুনরাবৃত্তি নয়; এবারে আমাদের বিশ্লেষণের বিষয় কোন বিশেষ পরিস্থিতি—কতকগুলো ঘটনা ও অনুষঙ্গের সমষ্টি যা দ্বিতীয়বার একই ভাবে ঘটে পরিবর্তনশীল জীবনপ্রবাহের পটভূমিতে একটা সম্পূর্ণ বিপরীত প্রতিক্রিয়া ও পরিস্থিতির জন্ম দেয়। প্রাত্যহিক জীবনে এই ধরনের অনেক কৌতুকাবহ পরিস্থিতির সঙ্গে আমাদের মোকাবিলা করতে হয়, যদিও সেগুলি সচরাচর অত্যন্ত প্রাথমিক আর মামুলি ঢং-এ ঘটে। ধরুন, অনেকদিন বাদে এক বন্ধুর সঙ্গে আপনার পথে দেখা হয়ে গেল; এ-ব্যাপারে হাসির কিছুই নেই। কিন্তু যদি ঐ একই দিনে আবার ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে আপনার প্রায় একই পরিস্থিতিতে সাক্ষাৎ হয়ে যায়, এবং তার পর আরও কয়েকবার তাঁর সঙ্গে

আকস্মিকভাবে অনুরূপ পরিবেশের মধ্যে দেখা হতে থাকে তবেই এই কাকতালীয় ব্যাপারটা আপনার কাছে কৌতুকাবহ বলে বোধ হবে। এর পর আপনি একের পর এক ঘটমান এমন কতকগুলি ব্যাপারের কথা ভাবুন যেগুলি আপনার মনোপটে জীবনের একটা প্রতিচ্ছবি মুদ্রিত করতে পারে; আবার, এই অবিরাম গতিশীল জীবনপ্রবাহের মধ্যে এমন একটা বিশেষ দৃশ্যের কথা কল্পনা করুন যেটা বারবার কয়েকজন বিশেষ চরিত্র কিংবা আলাদা আলাদা কয়েকটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে ঘটতে থাকে। এখানেও আপনি সমাপতন (co-incidence)-এর দৃষ্টান্ত পাচ্ছেন। যদিও তার চরিত্র একটু অসাধারণ। এই জাতীয় পুনরাবৃত্তিই আমরা নাটকে দেখতে পাই। এই ধরনের ঘটনা বা দৃশ্যের চরিত্র যত জটিল হয় এবং যত সহজ ও স্বাভাবিকভাবে সেগুলিকে নাটকের প্লটের মধ্যে বোনা যায় সেগুলিকে তত বেশি হাসির বলে মনে হয়। এই পরস্পরবিরোধী ব্যাপার অর্থাৎ জটিল সমাপতনের ঘটনাকে স্বাভাবিক ও সরলভাবে উপস্থাপিত করা এবং তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করাই নাট্যকারের প্রধান দায়িত্ব বলা যেতে পারে।

আমাদের সমকালীন হালকা প্রহসনে হাস্যকৌতুক সৃষ্টির এই পদ্ধতি নানা ঢং-এ ও কায়দায় সব সময়েই অনুসরণ করা হয়। এই ধরনের বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতির একটি দৃষ্টান্ত হোল, কয়েকটি বিশেষ চরিত্রকে নাটকের অঙ্কের পর অঙ্কে বিচিত্র সব পরিমণ্ডলের মধ্যে বারবার নিয়ে আসা, যাতে নতুন নতুন পটভূমিতে সুসমঞ্জসভাবে বিন্যস্ত একই ধরনের ঘটনা বা দুর্ঘটনার মুখে তাদের ফেলে দেওয়া যায়।

নাট্যকার মোলিয়েরের একাধিক নাটকে প্রায়ই একই ধরনের ঘটনা-বিন্যাস আমাদের চোখে পড়ে। *École des Femmes* (মহিলাদের শিক্ষায়তন) নাটকটি একই ঘটনাকে তিনবার আমাদের সামনে তুলে ধরার চেয়ে বেশি কিছু করে না। প্রথমবার হোরাস (Horace) আরনোল্ফ্‌কে (Arnolphe) বলে এগনেসের অভিভাবককে ঠকাবার জন্যে সে কি কি উপায় উদ্ভাবন করেছে; পরে দেখা যায় আরনোল্ফ্‌ নিজেই সেই

অভিভাবক ; দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা দেখতে পাই যে আরনোলফের ধারণা যে সে হোরাসের এই চালাকির ওপর টেক্কা দিয়েছে ; তৃতীয় ধাক্কায় আবার দেখা যায় যে এগ্‌নেস্ এমন চাল চেলেছে যে আরনোল্ফ্ যা কিছু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়েছে তা উল্টে হোরাসের পরিকল্পনাকেই সাহায্য করেছে। ঠিক একই ধরনের ঘটনা সাজানো হয়েছে ঐ নাট্যকারেরই *L'École de Maris* (স্বামীদের শিক্ষায়তন), *L'Etourdi* (আত্মভোলা) আর *George Dandin* (জর্জ দাঁদাঁ) নাটকে ; সর্বত্র এক রকমের পরিস্থিতি তিনটি তরঙ্গে আত্মপ্রকাশ করে। শেষোক্ত নাটকের নায়ক জর্জ প্রথমে আবিষ্কার করে যে তার স্ত্রী পরপুরুষে আসক্ত ; দ্বিতীয় তরঙ্গে সে শ্বশুর আর শাশুড়ীর কাছে এ ব্যাপারে সাহায্যের জন্য আবেদন করে ; তৃতীয় ধাক্কে দেখা যায় যে জর্জ নিজেই অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা চাইছে।

কখনও কখনও প্রায় একই জাতের দৃশ্য একই নাটকে আলাদা আলাদা চরিত্রকে নিয়ে বিন্যাস করা হয়। এমন নাটক বিরল নয় যেখানে দৃশ্যটি প্রথমে পরিবারের কর্তৃস্থানীয় চরিত্রদের নিয়ে পরিকল্পিত হয়, আর দ্বিতীয় দৃশ্যটিতে প্রায় ঐ এক ধরনের পরিস্থিতিতে অংশ নেয় বাড়ির চাকর-বাকরেরা। বাড়ির কর্তারা প্রথমে যে দৃশ্যটিতে অংশ নিয়েছেন প্রায় তার অনুরূপ একটি দৃশ্য একটু আলাদাভাবে পুনরায় অনুষ্ঠিত হয় ভৃত্যস্থানীয়দের নিয়ে, অবশ্য তাদের কথাবার্তা ও আচার-আচরণ একটু অমার্জিত ও গ্রাম্য হবেই। *Depit Amoureaux*[২৭] (বিরক্ত প্রেমিক) আর *Amphitryon*[২৮] নাটক দুটির কিছু কিছু অংশ এই ধাঁচে পরিকল্পিত। বেনেদিক্স্[২৯] (Benedix) এর লেখা ছোট্ট একটা প্রহসন *Der Eigensinn* (এক-গুঁয়ে)-এ এই পদ্ধতিটাকেই একটু উল্টে ব্যবহার করা হয়েছে ; চাকরদের একরোখামির একটা দৃষ্টান্ত বাড়ির কর্তারা যেন নতুন করে পরের দৃশ্যে পুনরাবৃত্তি করেছেন।

কিন্তু শ্রেণীনির্বিশেষে যে-সব মানুষকে নিয়ে এই জাতের পারম্পরিক সুবিন্যস্ত দৃশ্যের অবতারণা করা হয়, তাতে প্রাচীন আর সমসাময়িক কৌতুক-নাট্যের মধ্যে একটা বড় তফাৎ চোখে পড়ে। দুই যুগের নাটকেই ঘটনা

পরম্পরার বিন্যাসে একটা সঙ্গীতসদৃশ অনুক্রম (ordre) চোখে পড়ে, অবশ্য জীবনের সঙ্গে পারম্পর্য ও সঙ্গতি বজায় রাখার চেষ্টাও সেখানে লক্ষণীয়। কিন্তু এই সাদৃশ্য সত্বেও এই দুই যুগের নাটক রচনার আঙ্গিক বা শৈলী আলাদা। আমাদের যুগের বেশির ভাগ লঘু প্রহসন সরাসরি দর্শকমনকে সম্মোহিত করার চেষ্টা করে। নাটকের কাকতালীয় বা সমাপতিত ঘটনা-শৃঙ্খলের প্রকৃতি যেমনই হোক্ না কেন, দর্শকহিসেবে আমাদের সেগুলিকে মেনে নেওয়ার ব্যাপারটাই সেগুলির গ্রহণযোগ্যতার নির্ণয়। সেগুলিকে মেনে নেওয়ার মানসিকতা অবশ্য আমাদের মধ্যে ক্রমশঃ তৈরি হয়েছে, তবুও উল্লেখযোগ্য কথা হোল শেষ পর্যন্ত আমরা সেগুলিকে নাটকের স্বীকৃত উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করেছি। অন্যপক্ষে, মোলিয়েরের নাটকে দর্শকদের মানসিক প্রস্তুতির চেয়ে মঞ্চে উপস্থিত চরিত্রগুলোর মানসিক অবস্থা দৃশ্য-গুলিকে দর্শকদের কাছে স্বাভাবিক বলে প্রতিভাত করে। সেখানে প্রতিটি চরিত্র একটা বিশেষ দিকে পরিচালিত একটি শক্তিবিশেষের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত হয়, এবং এই শক্তি অনুক্ষণ নিজ নিজ জগতে সক্রিয় থেকে একটা বিশেষ ধরনের ঘটনাপরম্পরা সৃষ্টি করার দরুণ একই ধাঁচের পরিস্থিতির বারবার উদ্ভব সম্ভবপর হয়। এইভাবে ব্যাখ্যা করলে ঘটনাপ্রধান প্রহসন এবং চরিত্রোদ্ভূত কৌতুকনাটকের মধ্যে অনেক মিল চোখে পড়ে। একে আমরা কৌতুকনাটকের শাশ্বত বা classique পদ্ধতি হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি কারণ প্রকৃত classique বা কালজয়ী শিল্প কারণ থেকে কার্যের উদ্ভাবনে বিশ্বাসী।

২। বৈপরীত্য (Inversion): এই দ্বিতীয় পদ্ধতিটি প্রথমটির সঙ্গে এত নিকট সাদৃশ্যযুক্ত যে আমরা এখানে শুধু এর লক্ষণটির উল্লেখ করব, দৃষ্টান্ত দেখার বিশেষ চেষ্টা করব না। কতকগুলি চরিত্রকে বিশেষ কতকগুলো পরি-স্থিতিতে কল্পনা করা যাক্। আবার, যদি পরিস্থিতিটাকে উল্টে দিয়ে চরিত্র-গুলির ক্রিয়াকলাপও স্থানান্তরিত করা যায়, দেখা যাবে বেশ কৌতুককর একটা অবস্থার উদ্ভব হয়েছে। নাট্যকার লাবিশের *Le Voyage de M.*

Perrichon (ম: পেরিশোঁর বিদেশযাত্রা) নাটকে দ্বৈত উদ্ধারের দৃশ্যটি এই ধরনের নাট্যপরিস্থিতির উদাহরণ। অবশ্য দুটো একই ধরনের দৃশ্যকে আমাদের সামনে আলাদা করে অভিনয় করার দরকার হয় না, বিশেষ করে যদি প্রথম ঘটনাটা আমাদের পরিষ্কার মনে থাকে। যেমন কাঠগোড়ার আসামী যদি বিচারপতিকে আইন সম্বন্ধে উপদেশ দেয়, কিংবা কোন সন্তান যদি পিতামাতা বা অভিভাবককে নীতিকথা শোনায়, (অর্থাৎ যাবতীয় ব্যাপার যাকে আমরা 'উলটু-পুরাণ' বলি), ইত্যাদি অস্বাভাবিক ও অপ্রত্যাশিত দ্বিতীয় ঘটনাটাকে দেখানোই যথেষ্ট, যে ঘটনাটা স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত সেটা দেখাবার সব সময়ে প্রয়োজন হয় না।

অনেক জায়গায় কৌতুকহাস্যের রচয়িতা এমন সব চরিত্রের অবতারণা করেন যারা নিজের তৈরি ফাঁদে নিজেরাই জড়িয়ে পড়ে। বহু নাটকের মূল বিষয়বস্তুই হোল দুষ্কৃতকারী নিজেই নিজের কুকীর্তির শিকার হচ্ছে, প্রতারক নিজেই প্রতারিত হচ্ছে। আগের দিনের অনেক প্রহসনে এই ধরনের পরিস্থিতি আখছার দেখতে পাই। যেমন আইনজীবী পাথলঁ্যা (Pathelin) মক্কেলকে শেখায় কিভাবে জজসাহেবকে ঠকাতে হবে; মক্কেল কিন্তু ঐ উকীলের শেখানো চালাকি দিয়ে তাকেই তার 'ফি' থেকে বঞ্চিত করে। এক দজ্জাল বউ স্বামীকে দিয়ে সংসারের সব কাজ করিয়ে নেবার ফন্দী আঁটে। এই উদ্দেশ্যে সে সংসারের যাবতীয় কাজের একটা লম্বা আর নিখুঁত ফিরিস্তি তৈরি করে। একদিন ঘটনাক্রমে স্ত্রী যখন পা-পিছলে একটা গভীর চৌবাচ্চায় পড়ে যায় তার স্বামী তাকে উদ্ধার করতে অস্বীকার করে; ফিরিস্তি দেখিয়ে বলে সেখানে স্ত্রীকে চৌবাচ্চা থেকে উদ্ধারের কোন উল্লেখ নেই। আধুনিক সাহিত্যেও এই ধরনের 'চোরের ওপর বাটপাড়ি'র নানা বিকল্প ঘটনা অজস্র দেখা যায়। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে নাটকের কুশীলবের ভূমিকাগত এই ধরনের বৈপরীত্য পরিস্থিতিকে কৌতুকাবহ করে তোলে—যে অন্য কাউকে ঠকাবার মতলব করছে শেষ পর্যন্ত সে নিজেই ঐ বদ্ ফন্দীর জালে জড়িয়ে পড়ছে।

এখানে একটি বিশেষ নীতি সার্থকভাবে প্রযুক্ত বলে ধরা যায়, এবং ঐ

রীতির কিছু কিছু উদাহরণ আমরা এর আগেই তুলে ধরেছি। কৌতুকপ্রদ কোন দৃশ্য বা পরিস্থিতি বেশ কয়েকবার উপস্থাপিত হবার পর তা স্থায়ী বা অনুকরণযোগ্য কোন মডেল বা দৃষ্টান্ত হিসেবে সমাদৃত হতে থাকে। যে বিশেষ কারণে ঐ ঘটনা বা দৃশ্যটি কৌতুকপ্রদ হয় সেই কারণটিকে মনে না রেখেই লোকে দৃশ্যটিকে হাস্যকর বলে ধরে নেয়। অতঃপর, বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে হাস্যকর না হয়েও শুধু ঐ 'মডেল' দৃশ্যটির সঙ্গে আংশিক সাদৃশ্য থাকার কারণেই নতুন আর একটি দৃশ্য দর্শকের কাছে হাস্যকর হয়ে উঠতে পারে। এই সব 'অনুকৃত' দৃশ্য আমাদের মনে অস্পষ্ট আর জটিল এমন সব চিত্রকল্প জাগিয়ে তোলে যেগুলিকে আমরা হাসির খোরাক বলে ধরে নিই। অর্থাৎ, যুক্তির দিক থেকে হাস্যকর বলে স্বীকৃত এমন সব ঘটনাসমন্বিত একটি বিশেষ শ্রেণীর দৃশ্য হিসেবে চিহ্নিত হয়ে এই দৃশ্যগুলিও কৌতুকপ্রদ বলে স্বীকৃতি পায়। 'চোরের ওপর বাটপাড়ি' জাতীয় যাবতীয় দৃশ্য এই শ্রেণীতে পড়ে। এই ধরনের অসংখ্য ঘটনা বা পরিস্থিতির ওপর কৌতুকহাস্যের একটা আস্তরণ চাপানো হয় এবং শেষ পর্যন্ত 'স্বখাত সলিলে ডুবে মরা' জাতীয় যে-কোন ঘটনা আমাদের কৌতুকবোধকে জাগিয়ে তোলে—তার জন্য কোন দুর্ঘটনা বা কোন পাত্রের চরিত্রগত দোষ যতটাই দায়ী হোক না কেন। শুধু দুর্ঘটনাটির উল্লেখ করে সামান্য একটি শব্দও সে সম্বন্ধে আমাদের একটা ধারণা দেয় এবং আমাদের কাছে হাস্যকর বলে মনে হয়। 'মঃ দাঁদ্যাঁ (Dandin), আপনার উচিত শিক্ষা হয়েছে', এই কথাগুলির মধ্যে এমনিতে হাসির এমন কিছু নেই, কিন্তু কথাগুলি যেই 'স্বখাত সলিলে'র ধারণা দর্শকমনে মুদ্রিত করে এবং ঐ জাতীয় আরও অনেক ঘটনার প্রতিরূপ এবং প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করে, তখনই তা আমাদের কাছে কৌতুকহাস্যের উৎস হয়ে ওঠে।

৩। আমার বিশ্বাস পুনরাবৃত্তি (répétition) আর বৈপরীত্য (inversion) এই দুটি ব্যাপার নিয়ে আমরা বেশ খানিকক্ষণ আলোচনা করেছি। এখন আমরা দুটো স্বতন্ত্র ঘটনাশৃঙ্খলের পারস্পরিক অনুপ্রবেশ এবং অন্তরায়সৃষ্টি (l'interférence de séries) পদ্ধতির আলোচনায় আসতে পারি। এটি

এমন এক ধরনের কৌতুকাবহ পরিস্থিতি যার সঠিক সূত্র বা নীতি খুঁজে বের করা বেশ কঠিন, কারণ এই পদ্ধতি অসংখ্য বিচিত্ররূপে মঞ্চে উপস্থাপিত হতে পারে। যে পরিস্থিতি একই সঙ্গে দুটো স্বতন্ত্র এবং নিরপেক্ষ ঘটনাক্রমের পরিণতি হিসেবে দুটি একেবারে আলাদা অর্থে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে তা অনেক ক্ষেত্রে হাস্যোদ্দীপক।

এই সূত্র উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গে দ্ব্যর্থক (qui pro que) কোন পরিস্থিতির কথা আমাদের মনে আসে। এ-ধরনের পরিস্থিতি একই সঙ্গে দুটো আলাদা তাৎপর্যের বাহক বলা যায়। তাদের মধ্যে একটি আপাতদৃষ্টিতে সম্ভাব্য—যে তাৎপর্যটিকে অভিনেতারা নাটকের কুশীলব হিসেবে সত্য বলে মনে করে, অন্যটি যথার্থ বা প্রকৃত, যেটি সম্বন্ধে দর্শকরা অবহিত। দর্শক হিসেবে আমরা পরিস্থিতিটির আসল রহস্য জানি কারণ নাট্যকার আমাদের কাছে পরিস্থিতিটির পটভূমি ও প্রসঙ্গ আদ্যোপান্ত বিশদ করেছেন। কিন্তু মঞ্চে উপস্থিত চরিত্রগুলি প্রত্যেকটি ঘটনার শুধু একটি দিক সম্বন্ধে সচেতন; ফলে, তাদের চারপাশে যা ঘটছে এবং ঘটনাগুলিতে তারা এককভাবে যে ভূমিকা নিচ্ছে সে সম্বন্ধে তাদের ধারণা আংশিক এবং ভ্রান্ত, তাদের সিদ্ধান্তও তাই আংশিক আর অসম্পূর্ণ জ্ঞানের ভিত্তিতে উপনীত। তাই আমরা ভুল থেকে সঠিক ধারণার দিকে এগোই, আপাত আর প্রকৃত এই দুই ধারণার মধ্যে দোদুল্যমান থাকি; এই দুই পরস্পরবিরোধী ব্যাখ্যার মধ্যে বন্দী হয়ে থাকার যে মানসিক অবস্থা তার থেকেই উপভোগ্য কৌতুকবোধের জন্ম হয়। এটা খুবই স্বাভাবিক যে কোন কোন দার্শনিক দর্শকের এই মানসিক অধৈর্য দেখে প্রথমে অবাক্ হয়েছিলেন এবং সিদ্ধান্ত করেছিলেন কৌতুকহাস্যের মূলে আছে দুটি পরস্পরবিরোধী চিন্তা বা সিদ্ধান্তের মধ্যে সংঘাতজনিত মানসিক অবস্থা। কিন্তু দুঃখের কথা কৌতুকহাস্যের কারণ সম্বন্ধে তাঁদের এই সিদ্ধান্ত সব নাটকের পরিস্থিতির মূল্যায়নে প্রয়োগ করা যায় না। যেখানে তাঁদের এই সূত্র প্রযুক্ত হতে পারে, সেখানেও তার যৌক্তিকতা কৌতুকহাস্যের কারণ হিসেবে নয়, কৌতুকহাস্যের অন্ততম ফল হিসেবে। সহজেই বোঝা যায় যে মঞ্চের ওপর অভিনীত

ভুলবোঝাবুঝি বেশ সাধারণ একটা ব্যাপারের অন্তত্তম প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়—আসলে তা স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষ কয়েকটা ঘটনাক্রমের মধ্যে অনিচ্ছাকৃত বা অনীপ্সিত মিশ্রণ বা অনুপ্রবেশ (interference)। আলাদা-ভাবে এই ঘটনাগুলো হাসির না হলেও, যখন একটা ঘটনাক্রম চরিত্রগুলির ইচ্ছা ছাড়াই অন্ত এক বা একাধিক ঘটনাক্রমের সঙ্গে মিশে গিয়ে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করে তখনই সেগুলি কৌতুকহাস্তের কারণ হয়।

আসলে প্রতিটি ভুল-বোঝাবুঝির পরিস্থিতিতে লিপ্ত চরিত্রগুলির প্রত্যেকের এক একটি ঘটনাক্রমের মধ্যে বিশেষ একটি ভূমিকা থাকে এবং তার জ্ঞান অনুযায়ী প্রত্যেকটি পরিস্থিতির সে সঠিক ব্যাখা করে এবং ফলে তার যাবতীয় কাজ আর কথায় একটা সামঞ্জস্য আর বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। চরিত্রগুলো এককভাবে যে সব কৌতুককর ঘটনাক্রমে অংশ নেয় তার প্রত্যেকটি আলাদা করে গড়ে ওঠে; কিন্তু কোন বিশেষ মুহূর্তে সেই ঘটনা-গুলো এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যে যে-কোন একটা চরিত্রের কাজ ও কথাবর্তা অন্ত আর একটি চরিত্রের কাজ ও কথাবার্তার সঙ্গে মিলে যেতে পারে। এরই ফলে চরিত্রগুলির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ভুলবোঝাবুঝি, দ্ব্যর্থক এবং পরস্পরবিরোধী উক্তির আদান-প্রদান ঘটে। কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে কোন পরিস্থিতিই হাসির নয়, সেগুলি হাস্যোদ্দীপক হয়ে ওঠে যখন দুই বা তারও বেশি ঘটনাপ্রবাহের কাকতালীয়তা আমাদের কাছে প্রকট হয়ে ওঠে। আমাদের এই চিন্তার যথার্থ্য প্রমাণিত হয় যখন আমরা দেখি নাট্য-কার দুটো আলাদা ঘটনাক্রমের মধ্যে 'অনিচ্ছাকৃত' সাদৃশ্যের দিকে আমাদের মনকে আকৃষ্ট করার জন্ত কত রকমের কৌশল আর উদ্ভাবনী শক্তির প্রয়োগ করেন। তাঁর এই প্রয়াস সফল হয় কারণ তিনি বারবার দর্শকদের এই আশ্বাস দেবার ভাণ করেন যে এই দুই স্বতন্ত্র ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে যে আকস্মিক সাদৃশ্য তা তিনি আর ঘটতে দেবেন না। প্রতিমুহূর্তে মনে হয় এই বুঝি দুটো ঘটনাস্রোতের মিশ্রণ বন্ধ হয়ে যাবে, কিন্তু কিছু-ক্ষণের মধ্যেই তাদের কাকতালীয় সাদৃশ্য আবার অনিবার্যভাবে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। স্বাতন্ত্র্য ও সাদৃশ্যের এই লুকোচুরি খেলার মধ্যেই কৌতুক-

হাস্যের কারণ-লুকিয়ে থাকে। দুটো পরস্পরবিরোধী চিন্তার মধ্যে দোদুল্যমান থাকার চেয়ে এই ভাবে মাঝে মাঝে মিলে মিশে ভ্রান্তির সৃষ্টি করাটাই কৌতুকহাস্য সৃষ্টির জন্যে বেশি দরকার। কিভাবে দুটো আলাদা ঘটনাপ্রবাহ পরস্পরকে প্রভাবিত করছে, কিংবা একে অপরের সহজ ও সরল বিবর্তনকে ব্যাহত করছে তার বিভিন্ন দৃষ্টান্ত আমাদের কৌতুকবোধের ইন্ধন যোগায়।

মঞ্চের বিশেষ প্রয়োজনে নাট্যকার যে বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি তৈরি করেন তা হোল দুটো একেবারে আলাদা ঘটনাস্রোতের মধ্যে অনিচ্ছাসত্বেও উদ্ভূত পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতের একটা বিশেষ নজির বা উপায়। কিন্তু এইটিই একমাত্র দৃষ্টান্ত বা পদ্ধতি নয়। দুটো সমকালীন ঘটনাপ্রবাহের পরিবর্তে, একটা অতীতে সংঘটিত আর একটা বর্তমানে ঘটমান—এমন দুটি ঘটনাক্রমও ব্যবহৃত হতে পারে। যদি এমন দুটি ঘটনাপ্রবাহ আমাদের কল্পনার জগতেও পরস্পরের ওপর অনুরূপ প্রভাব রাখতে পারে, সেখানে কোন ভুলবোঝাবুঝির (qui pro quo) অবকাশ না থাকলেও দর্শক বা পাঠকের মনে কৌতুককর অনুভূতি আসবেই। শিয়ঁ (Chillon)-র দুর্গে বন্দী বনিভারের[৩০] (Bonivard) কথা ভাবুন—এটা একটা বিগত ঐতিহাসিক ঘটনাক্রম; এখন মনে করুন সুইজারল্যাণ্ডে ভ্রমণরত তারতারাঁার (Tartarin) কথা; ইনিও হঠাৎ গ্রেপ্তার হয়ে বন্দী হলেন। এটা দ্বিতীয় একটা ঘটনাক্রম যার সঙ্গে প্রথমটির কোন সংস্রব নেই। এখন ধরা যাক্ বনিভারকে যে শেকল দিয়ে বাঁধা হয়েছিল ঠিক সেইটি দিয়ে তারতারাঁাকেও শৃঙ্খলিত করা হোল। এর ফলে অন্ততঃ কয়েক মুহূর্তের জন্য দুটো একেবারে আলাদা ঘটনাক্রম পরস্পরের খুব কাছে এলো। এবং সাহিত্যিক আলফঁাস দোদের[৩১] (Alphonse Daudet) কল্পনায় তৈরি হোল একটা খুব মজার দৃশ্য। বীরত্বগাথার অনুকরণে কল্পিত অনেক বিদ্রূপাত্মক (héroi-comique) দৃশ্যের বিশ্লেষণ করলে এই ধরনের উপকরণ পাওয়া যায়। অতীত থেকে বর্তমানে সময়ান্তরীকরণের এই কৌতুককর পদ্ধতির পেছনে এই সৃষ্টির অনুপ্রেরণা কাজ করে।

এই পদ্ধতিকে নানাভাবে কাজে লাগিয়েছেন নাট্যকার লাবিশ (Labiche); তিনি কখনও বিভিন্ন ঘটনাক্রমকে একেবারে আলাদা করে শুরু করেছেন, তারপর একটা প্রবাহের সঙ্গে অন্য আর একটার পারস্পরিক প্রভাব বিস্তারের খেলা দেখিয়ে মজা পেয়েছেন। কখনও আবার স্বতন্ত্র কোন চরিত্রগোষ্ঠীকে, ধরা যাক একদল বরযাত্রী, একেবারে সম্পর্কশূন্য একটা পরিবেশের মধ্যে এনে ফেলেছেন। এই পরিবেশে অন্ততঃ কিছু সাদৃশ্য সাময়িকভাবে হলেও অনিবার্যভাবে চরিত্রগুলির মনে কিছু বিভ্রান্তি আর গণ্ডগোলের সৃষ্টি করেছে। কখনও আবার সারা নাটক জুড়ে তিনি এমন একটি মাত্র চরিত্রগোষ্ঠীকে ব্যবহার করেছেন, যাদের কয়েকজনের জীবনে কিছু গোপনীয় ব্যাপার আছে এবং তা নিয়ে তাদের নিজেদের মধ্যে কিছু গোপন বোঝাপড়াও আছে। অর্থাৎ মূল নাট্যপরিস্থিতির ভেতরেই আলাদা কয়েকটি ছোটখাট নাটকীয় পরিস্থিতিও সেখানে সক্রিয়। তার ফলে নাটকের মূল ঘটনাপ্রবাহে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয় যেখানে এই দুই সমান্তরাল কৌতুককর পরিস্থিতির মধ্যে সংঘর্ষের ফলে একটি অন্যটিকে প্রায় বানচাল করে বসে। কিন্তু পরের ঘটনাতেই আবার পরিস্থিতি সামলে ওঠে, দুটো ঘটনাক্রম আবার নিজ নিজ পথে স্বতন্ত্রভাবে আপন ছন্দে এগোতে থাকে। এমনও দেখা যায় যে মূল ঘটনাপ্রবাহের মধ্যেই নাট্যকার এমন সব জিনিস এনেছেন নাটকের প্লটের পক্ষে যেগুলো মোটেই অনিবার্য বা অপরিহার্য নয়। যেমন, কোন চরিত্রের অতীত-জীবনের এমন কোন লজ্জাকর ব্যাপার যা অন্য সকলের অগোচরে রাখা তার পক্ষে বিশেষ দরকার। কিন্তু ঘটনাটা যে-কোন মুহূর্তে অন্যদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ার উপক্রম হলেও প্রতিবারেই চরিত্রটি উদ্বেগজনক পরিস্থিতিটাকে সামলে ওঠে এবং ঘটমান জীবনের সহজ প্রবাহ অতীতের ঐ ঘটনাটির দ্বারা কোনমতেই বিঘ্নিত হয় না। মোট কথা, উল্লিখিত প্রতিটি দৃষ্টান্তেই আমরা একই প্রক্রিয়ার মুখোমুখি হচ্ছি: দুটো নিরপেক্ষ আর স্বতন্ত্র ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে আংশিক সাদৃশ্য, সেই সাদৃশ্যের ফলে উদ্ভূত বিভ্রান্তি এবং তজ্জনিত কৌতুককর পরিস্থিতি।

লঘু প্রহসনের বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ নিয়ে আমরা আর বেশি সময়ক্ষেপ করতে চাই না। পারস্পরিক পরিস্থিতিতে প্রভাব বিস্তার, পুনরাবৃত্তি বা বৈপরীত্য, এগুলির মধ্যে যে পদ্ধতিটিই ব্যবহৃত হোক না কেন, নাট্যকারের উদ্দেশ্য সব সময়েই এক এবং অভিন্ন : জীবনের মধ্যে যান্ত্রিকতার অস্তিত্ব খুঁজে তাকে তুলে ধরা। কিছু ঘটনা ও চরিত্রের পারস্পরিক সম্বন্ধকে বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসা, কিংবা তাদের শ্রেণীগত চরিত্রকে উল্টে দেওয়া, কিংবা স্বতন্ত্র অন্য কতকগুলো ঘটনা ও চরিত্রের সঙ্গে তাদের আংশিক সাদৃশ্য দেখিয়ে কিছুটা বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি রচনা—এই সব পদ্ধতির সাহায্যে জীবনে একই ব্যাপার বারবার ঘটার যে যান্ত্রিক সম্ভাবনা থাকে তা আমাদের সামনে তুলে ধরার প্রয়াস লক্ষণীয়।

আমাদের বাস্তব জীবনকে আমরা ঠিক ততটুকু হাসির এবং প্রহসন-সদৃশ বলে ভাবি ঠিক যে পরিমাণে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি সেখানে সহজ ও স্বাভাবিকভাবে ঘটে। ফলে, জীবন যতটা আত্মবিস্মৃত হয়ে থাকতে পারে সেখানে পুনরাবৃত্তি আর প্রহসনজাতীয় ক্রিয়াকলাপ ততটুকুই সম্ভবপর। কারণ, জীবন যদি অনুক্ষণ সতর্ক এবং সজাগ হয়ে থাকে, তাকে অবিরাম নতুন আর বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনা ঘটাতে হবে, তাকে সব সময়ে এমন সব ঘটনা-ক্রমের উদ্ভাবন করতে হবে যার মধ্যে থাকবে অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতার প্রবাহ, অতীতের সঙ্গে যার কোন সাদৃশ্য বা সংস্রব থাকবে না। তাই কোন ঘটনার হাস্যকরতার অন্যতম কারণ হিসেবে থাকে অসতর্কতা বা মনঃ-সংযোগের অভাব, ঠিক যেমন কোন চরিত্রের দৃঢ়মূল অসতর্কতা বা আত্মবিস্মৃতি চরিত্রটিকে হাস্যকর করে তোলে। কিন্তু প্রকৃত জীবনে ঘটনা-ক্রমের এই বিশৃঙ্খল ছন্দোহীনতা খুব বিরল আর তার প্রতিক্রিয়া বা ফলও খুব লঘু চরিত্রের। তা ছাড়া জীবনের ঘটনায় এ-ধরনের অসর্তকতা বা সামঞ্জস্যহীনতা থাকলে তার প্রতিকারের কোন পথও নেই। ফলে, সেই সব ঘটনা নিয়ে বিদ্রূপাত্মক হাসিরও কোন অবকাশ নেই। হাসি জিনিসটা সব সময়েই আনন্দের একটা অভিব্যক্তি এবং যে-কোন ব্যাপারে হাসির সুযোগ থাকলে মানুষ তার সদ্ব্যবহার করতে উদ্‌গ্রীব হয়; সেই কারণেই

ঘটনার মধ্যে প্রকাশিত অনমনীয়তাকে একটু অতিরঞ্জিত করে তাকে শিল্প-সৃষ্টির একটা বিশেষ উপায় হিসেবে ব্যবহার করার কথা মানুষের মাথায় এসেছে। লঘু প্রহসনের জনপ্রিয়তার এই হোল আসল ব্যাখ্যা। মানুষের প্রাত্যহিক বাস্তবজীবনের সঙ্গে এর যে সম্বন্ধ, একটা সক্রিয় ও সচল স্বাভাবিক মানুষের সঙ্গে স্প্রিং-এর তৈরি জোড়াতালি দেওয়া নৃত্যরত পুতুলের সম্পর্কও তাই। প্রত্যেক জীবন্ত জিনিসের মধ্যে যে একটা অনিবার্য অনমনীয়তা আছে, কৌতুকধর্মী প্রহসন তারই একটা কৃত্রিম ও অতিরঞ্জিত রূপ। প্রকৃত ও স্বচ্ছন্দ জীবনের সঙ্গে এর বন্ধন অতি সূক্ষ্ম আর পলকা সুতোয় তৈরি। এটা আসলে এক ধরনের খেলা; অন্য আর পাঁচটা খেলার মত এটিও আগে থেকে নির্দ্ধারিত আর স্বীকৃত কতকগুলি প্রথা ও নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অন্যপক্ষে, চরিত্রভিত্তিক কৌতুকহাস্যের মূল জীবনমাটির গভীরতর স্তরে নিহিত। এই চরিত্রভিত্তিক কৌতুকহাস্যের প্রকৃতি নিয়ে আমরা এই আলোচনার পরিণতির দিকে আরও বিশেষ অনুসন্ধান চালাবো। কিন্তু তার আগে আমরা আর এক শ্রেণীর কৌতুকের উৎস সন্ধান করব এবং দেখব যে এই শ্রেণীর কৌতুকের সঙ্গে লঘু প্রহসন থেকে পাওয়া কৌতুকহাস্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এই জাতের কৌতুকহাস্যের জন্ম হয় মানুষের কথাবার্তার মধ্যে।

। দুই ।

সংলাপভিত্তিক কৌতুকহাস্যকে একটি বিশেষ শ্রেণীতে ফেলার মধ্যে একটা তাৎপর্য আছে, কারণ যে ধরনের হাসির আমরা এ-পর্যন্ত আলোচনা করেছি তার বেশির ভাগই ভাষার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু বোঝা দরকার যে ভাষার মাধ্যমে রূপায়িত, আর মূলতঃ সংলাপের দ্বারা সৃষ্ট, এই দুই ধরনের কৌতুকের মধ্যে একটা গুণগত পার্থক্য আছে। প্রথম জাতের কৌতুকহাস্য এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনূদিত হতে পারে। অবশ্য এই ভাষান্তরীকরণের ফলে মূল রচনার রস ও তাৎপর্যের বেশ খানিকটা হানি হতে পারে, বিশেষ করে যখন তা অন্য কোন সামাজিক রীতিনীতি, সাহিত্য

ও বিশেষ ভাব-ধারণাসম্পন্ন পরিবেশের উদ্দেশ্যে কল্পিত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ সংলাপসাপেক্ষ এবং মূলতঃ ভাষার দ্বারা সৃষ্ট প্রহসনের অন্য কোন ভাষায় অনুবাদ প্রায় অসম্ভব বলা যায়। এই শ্রেণীর কৌতুকহাস্য পুরোপুরি নির্ভর করে মূল ভাষার বাক্যগঠন ও বিন্যাসপদ্ধতির নিজস্বতা ও শব্দনির্বাচনের ওপর। ভাষা দিয়ে মানুষের অন্যমনস্কতার কোন বিশেষ উদাহরণ দেওয়ার ওপর এই ধরনের কৌতুকহাস্যের সাফল্য বা বিফলতা নির্ভর করে না। এক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হয় ভাষার ব্যবহারে বক্তার শৈথিল্যের ওপর। এখানে ভাষা নিজেই কৌতুকহাস্যের উৎস বা কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

বাস্তবিক, কোন হাস্যকর উক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিঃসৃত হয় না। আমরা যখন কোন কথা শুনে হাসি তখন তার বক্তার উদ্দেশেও আমাদের কৌতুক-বোধ ও কৌতূহল প্রযুক্ত হয়। কিন্তু এই পরিস্থিতিকে একেবারে অপরিহার্য বলা চলে না। বহুক্ষেত্রে কোন বাক্য বা শব্দ তার নিজের তাৎপর্যেই কৌতুকপ্রদ হতে পারে। এ-ধরনের বেশির ভাগ দৃষ্টান্তে কোন্ চরিত্রকে লক্ষ করে আমরা কৌতুকের হাসি হাসছি তা নির্ণয় করা কঠিন হয়—এবং এই ঘটনা থেকেই এই বক্তব্যের যৌক্তিকতা প্রমাণিত হয়। অবশ্য ক্ষেত্র-বিশেষে আমাদের একটা অস্পষ্ট ধারণা হয় যে ঐ সব কৌতুককর উক্তি বা ভাষার পেছনে কোন বিশেষ চরিত্র আর তার বুদ্ধিবৃত্তি কাজ করছে।

তা ছাড়া অনেক সময় বক্তা নিজে ঐ কৌতুকপ্রদ ব্যক্তিস্বটি নন, এমনও দেখা যায়। এখানে আবার কৌতুকপ্রদ (comique) এবং রসঘন (spirituel) এই দুই আলাদা জাতের হাস্যরসাত্মক ব্যাপারের মধ্যে পার্থক্য বোঝা দরকার। যখন বক্তা নিজে আমাদের হাসির পাত্র হয়ে ওঠেন,তখন তাঁর উক্তিকে আমরা কৌতুককর বলতে পারি। কিন্তু যখন বক্তার উক্তি তৃতীয় কোন ব্যক্তি বা মনুষ্যজাতির সাধারণ কোন হাস্যকর বৈশিষ্ট্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাকে আমরা রসিক বা witty (spirituel) উক্তি বলি। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আমরা ঠিক

করে উঠতে পারি না উক্তিটি কৌতুকপ্রদ (comique) না রসোত্তীর্ণ (spirituel), আমরা শুধু এইটুকু বুঝতে পারি যে উক্তিটি শুনে আমাদের হাসি পায়।

আর বেশিদূর এগোবার আগে স্থির করা দরকার রসিক উক্তি (ইংরেজিতে wit এবং ফরাসিতে mot d'esprit) বলতে ঠিক কি বোঝায়। কোন রসোত্তীর্ণ উক্তি (mot d'esprit) অন্ততঃ আমাদের স্মিত বা মৃদু হাসির উদ্রেক করে। তাই হাস্যরসের কারণ অনুসন্ধানে প্রযুক্ত কোন আলোচনাই সম্পূর্ণ হবে না যদি না রসিকতা (d'esprit) ব্যাপারটাকে তলিয়ে দেখে তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য স্থির করা না যায়। কিন্তু ভয় হয়, হয়তো এই অতি সূক্ষ্ম নির্যাসটি অনুসন্ধানের বেশি জোরালো আলোতে আনার সঙ্গে সঙ্গে উপে যাবে।

প্রথমে রসিকতা (wit or esprit) শব্দের যে দুটো আলাদা মানে হয় তাদের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা যেতে পারে। একটা মানে একটু মোটা আর সাধারণ, অন্যটি সূক্ষ্ম আর গভীর তাৎপর্যমণ্ডিত। মোটা অর্থে যখন 'রসিকতা' শব্দটি ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে একটু নাটকীয় (বাংলায় 'নাটুকে') চিন্তাধারার স্পর্শ পাওয়া যায়। সমস্ত চিন্তা বা ধারণাকে শুধু কায়াহীন বা বিদেহী প্রতীক হিসেবে না ভেবে রসিক ব্যক্তি (l'homme d'esprit) তাদের রক্তমাংসের তৈরি জীবন্ত প্রাণীরূপে কল্পনা করেন। তাদের কথাবার্তা শুনতে পান এবং তাদের মানুষ বিবেচনা করে তাদের মধ্যে সংলাপ বিনিময়ের ব্যবস্থা করেন। তিনি তাদের চরিত্রহিসেবে রূপ দিয়ে মঞ্চস্থ করেন আর সেই সঙ্গে অন্ততঃ কিছুটা নিজেকেও প্রেক্ষাগৃহে দর্শকসমক্ষে মেলে ধরেন। বলা চলে, কোন রসিকজাতি প্রায় সব সময়েই নাটকপ্রিয় জাতি। প্রত্যেক রসিক ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটা কবিসুলভ গুণ আছে— ঠিক যেমন প্রত্যেক আদর্শ পাঠকের মধ্যে সুপ্ত থাকে অভিনেতাসুলভ অনেক বৈশিষ্ট্য। আমরা জেনে শুনেই এই তুলনার অবতারণা করছি, কারণ এই চারটি জিনিসের মধ্যে একটা আনুপাতিক সম্বন্ধ স্থাপিত হতে পারে। কোন বই ঠিকমত অনুশীলন করতে গেলে পাঠকের চরিত্রে অভিনয় শিল্পের চিন্তা-

মূলক বা মননভিত্তিক দিকটি থাকা দরকার। কিন্তু অভিনয় করতে গেলে আমাদের কায়মনোবাক্যে অভিনেতা হতে হবে। ঠিক তেমনি, কাব্যসৃষ্টি করতে হলে কবিকে অন্ততঃ আংশিকভাবে আত্মবিস্মৃত হতে হয়। কিন্তু রসিক ব্যক্তি কোন ব্যাপারেই মোটেই অসতর্ক বা উদাসীন নন। তিনি যা করেন বা বলেন, তার পেছনে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাবেই। তিনি তাঁর কাজে সম্পূর্ণ মগ্ন বা তদ্গত হয়ে যান না। কারণ তিনি শুধু তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিকে ঐ কাজ বা কথায় প্রয়োগ করেন।

সুতরাং যে-কোন কবি ইচ্ছে করলেই রসিক (l'homme d'esprit) হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারেন। রসিকতা আয়ত্ত করতে তাঁকে কোন নতুন ধর্ম বা গুণ অর্জন করতে হয় না। বরঞ্চ মনে হয়, এই ভূমিকায় নামতে হলে কিছু গুণ তাঁকে সাময়িকভাবে বর্জন করতে হয়। তাঁকে শুধু বিভিন্ন ধারণার মধ্যে সংলাপসমন্বিত একটা দৃশ্যের কল্পনা করতে হবে, "কোন কিছুর জন্য নয়, শুধু আনন্দ পাবার উদ্দেশ্যে (pour rien, pour le plaisir—Victor Hugo's *Marion Delorme*)। যে শৃঙ্খল তাঁর চিন্তা আর অনুভূতিকে, তাঁর আত্মা আর জীবনবোধকে একত্র করে রাখে তার থেকে তিনি সাময়িকভাবে নিজেকে মুক্ত করবেন। এক কথায়, কবি রসিক হয়ে উঠবেন যদি তিনি অনুভূতি ও আবেগকে অবদমিত রেখে তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রাধান্য দিতে প্রস্তুত থাকেন।

কিন্তু রসিকতা মানে যদি মূলতঃ নাটকের পরিস্থিতি দিয়ে জীবনকে দেখা হয়, সেখানে স্পষ্টতঃ একটা বিশেষ শ্রেণীর নাট্যশিল্পের উদ্ভব হবে এবং সেই শ্রেণী হোল কৌতুকহাস্য বা প্রহসন। এখানে অবশ্য esprit (wit বা রসিকতা) শব্দটি বেশ সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং কৌতুক-হাস্যের সূত্রানুসন্ধানের কাজে ঐ অর্থই আমাদের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ আর মূল্যবান্। এখানে রসিক (l'homme d'esprit) বলতে আমরা এমন একজন শিল্পীকে বোঝাতে চাই যিনি কলমের দু'একটা আঁচড়ে অনায়াসে কৌতুককর কোন দৃশ্য সৃষ্টি করতে পারেন। শুধু তাই নয়, এত

দ্রুত অথচ সূক্ষ্মভাবে তিনি এই সৃষ্টিকার্যে পটু যে আমরা লক্ষ করার আগেই তিনি তাঁর সৃজনপ্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে ফেলেন।

এইসব দৃশ্য বা পরিস্থিতিতে অভিনেতা কারা? রসিকচিত্ত (l'homme d' esprit) কাকে বা কাদের নিয়ে চিন্তা করে? প্রথমত যাঁরা তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা প্রায়ই করে থাকেন তাঁদের নিয়ে এবং তাঁর রসোত্তীর্ণ উক্তি (mot d'esprit) তাদের কারুর প্রতি তাঁর সরাসরি নিক্ষিপ্ত বাণ। কখনও বা আবার প্রত্যক্ষভাবে অনুপস্থিত এমন কোন ব্যক্তিত্বকে নিয়ে তিনি ব্যস্ত। তাঁর কোন উক্তির জবাব হিসেবে তিনি মন্তব্য করেন। বেশির ভাগ সময় তিনি যেন পৃথিবীর সমস্ত মানুষের কাছে তাদের সাধারণ বুদ্ধিহীনতার কৈফিয়ৎ চাইছেন, প্রচলিত কোন বিশ্বাস বা ধারণার মধ্যে চিন্তা ও যুক্তির পরস্পরবিরোধিতা মেলে ধরছেন, কিংবা কোন জনপ্রিয় উক্তি বা প্রবাদজাতীয় জিনিসের মধ্যে হাস্যকর কোন ত্রুটি আবিষ্কার করছেন। যদি নমুনা হিসেবে ছোট ছোট কয়েকটি দৃশ্যের মধ্যে আমরা তুলনা করি তাহলে দেখতে পাব যে প্রায় সব ক্ষেত্রেই আমাদের পরিচিত কোন একটি ব্যাপারকেই অভিনব নানা উপায়ে উপস্থাপিত করা হয়েছে—এবং এই ব্যাপারটি হোল 'চোরের ওপর বাটপাড়ি'। একটা রূপক কিংবা বাক্যাংশকে অথবা কোন তর্কে উপস্থাপিত কোন যুক্তিকে তার উদ্ভাবকের বিরুদ্ধেই যদি প্রয়োগ করা হয় দেখা যাবে উত্তরে তিনি এমন সব কথা বলতে বাধ্য হচ্ছেন যা বলার কোন উদ্দেশ্যই প্রথমে তাঁর ছিল না, এবং ফলে অনবধানতাবশতঃ নিজের কথার জালেই তিনি জড়িয়ে পড়ছেন। কিন্তু 'চোরের ওপর বাটপাড়ি' জাতীয় ব্যাপারই একমাত্র সম্ভাব্য বিষয়বস্তু নয়। এর আগে যে সব কৌতুককর পরিস্থিতি আলোচিত হয়েছে তার মধ্যে এমন কোন জিনিষ নেই যাকে রসোত্তীর্ণ মন্তব্য বা উক্তিতে রূপান্তরিত করা না যায়।

প্রতিটি রসোত্তীর্ণ মন্তব্যকে (mot d'esprit) বিশ্লেষণ করে তার মধ্যে আসল রাসায়নিক সূত্রটি কি তা নির্ণয় করার স্তরে এখন আমরা পৌঁছেছি। সূত্রটি এই ধরনের হতে পারে: মন্তব্যটিকে সম্প্রসারিত করে রীতিমত একটা নাটকীয় দৃশ্য কল্পনা করা যেতে পারে, তারপর স্থির করা যেতে পারে

দৃশ্যটিকে কোন শ্রেণীর কৌতুকহাস্যের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। এই পদ্ধতির সাহায্যে কোন রসোক্তিকে আমরা তার সরলতর রূপে নিয়ে গিয়ে তার চরিত্র নিরূপণ করতে পারি। একটি কালোত্তীর্ণ দৃষ্টান্ত (exemple classique) দিয়ে এই পদ্ধতি পরীক্ষিত হতে পারে। "তোমার বুক আমাকে ব্যথিত করছে" (j'ai mal à votre poitrine)—মাদাম দ্য সেভিনিয়ে (Madame de Sevigné) তাঁর অসুস্থ মেয়েকে চিঠিতে এই কথাগুলো লিখেছিলেন। নিঃসন্দেহে এই উক্তিটি একটি রসিক মনের দ্যোতক। আমাদের সূত্রটি যদি নির্ভুল হয়, তাহলে এই উক্তিটিকে একটু গুরুত্ব দিয়ে, একটু সম্প্রসারিত করে দেখতে হবে; আর তা করলে দেখা যাবে যে ঐ ছোট্ট উক্তিটি একটি কৌতুককর দৃশ্যের সৃষ্টি করেছে। তাঁর *Amour Médecin* নাটকে মোলিয়ের ঠিক এই ধরনের একটা দৃশ্য একেবারে তৈরি অবস্থায় আমাদের দিয়েছেন। হাতুড়ে ডাক্তার ফিলর্তাদ্রঁলকে ডাকা হয়েছে স্গানরেলের নিজের মেয়ের অসুস্থতা পরীক্ষা করার জন্য। সে শুধু স্গানারেলের নাড়ি টিপেই কাজ সারে, আর বাপ ও মেয়ের মধ্যে যে স্বাভাবিক সহানুভূতি তার ওপর নির্ভর করেই একটুও না ভেবে বলে, "আপনার মেয়ে বেশ অসুস্থ।" এই দৃশ্যটিতে আমরা রসিকের উক্তিকে একটি কৌতুকদৃশ্য হিসেবে দেখি। অর্থাৎ, আমাদের বিশ্লেষণকে সম্পূর্ণ করতে হলে আমাদের দেখতে হবে কোন সন্তানের রোগ নির্ণয় করার উপায় হিসেবে তার পিতামাতার স্বাস্থ্য পরীক্ষার মধ্যে হাস্যকর কি আছে। আমরা দেখেছি হাস্যরসের অন্যতম উৎস জীবন্ত কোন মানুষকে জোড়াতাড়া দিয়ে তৈরি কোন যান্ত্রিক পুতুল হিসেবে কল্পনা করা, এবং অনেক সময় এই ধরনের কল্পনার প্রক্রিয়াকে আমাদের পক্ষে সহজ করার জন্য আমাদের দেখানো হয় কিভাবে দুই বা ততোধিক লোক এমনভাবে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে বা ব্যবহার করছে যাতে ধারণা হয় তারা পরস্পরের সঙ্গে অদৃশ্য কোন সুতো দিয়ে বাঁধা। যখন আমাদের কাছে বাবা ও মেয়ের মধ্যে এই অদৃশ্য সহানুভূতির সুতোর অস্তিত্বের ইঙ্গিত দেওয়া হয় তখন কি ঠিক এই নীতি বা পদ্ধতির কথাই আমাদের মনে জাগে না?

এখন আমরা খানিকটা বুঝতে পারছি যে যে-সব সমালোচক বা লেখক রসোক্তি (mot d'esprit) বা wit নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁরা কেন শুধু এই শব্দটির অসাধারণ জটিলতা নিয়েই ব্যস্ত হয়েছেন, কিন্তু কখনই তার প্রকৃত লক্ষণ স্থির করতে পারেননি। রসিক হবার নানা উপায় আছে, যেমন আছে ঠিক তার বিপরীত চরিত্রের মানুষ হবার। এখন এই দুই সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির চরিত্রের মধ্যে সাধারণ কোন্ ধর্ম আছে তা আমরা কেমন করে বুঝবো, যদি না আমরা রসোত্তীর্ণ (spirituel) আর কৌতুককর (comique) এই দুই-এর মধ্যে যে সাধারণ গুণ বা সম্বন্ধ তা ঠিক করতে পারি? কিন্তু ব্যাপারটাকে যখন সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায় তখন খুবই সরল মনে হয়। তখন বোঝা যায়, যে নাটকের কোন দৃশ্যের অস্পষ্ট আর অস্থির ধারণা আর একটা সুষ্ঠুভাবে বিন্যস্ত সুপরিচালিত নাট্যদৃশ্যের মধ্যে যে সম্পর্ক, একটা রসোক্তি আর একটা সরল কৌতুকহাস্যসমৃদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যেও ঠিক সেই সম্বন্ধ। তাই কৌতুকহাস্য যত রকমের বিচিত্র রূপ নেয়, রসোক্তিও ঠিক তত রকমের বৈচিত্র্য ধারণ করতে পারে। অতএব কৌতুকহাস্য কি কি রূপ ধরতে পারে, প্রথমে আমাদের তা ঠিক করতে হবে (এ কাজটা যে বেশ কঠিন তা আমরা এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি) এবং তা করতে হলে আমাদের দেখতে হবে কোন্ পথ ধরে এক জাতের কৌতুকহাস্য অন্য আর এক ধরনে রূপান্তরিত হয়। ঐ পথ ধরে রসোক্তিরও বিশ্লেষণ করতে হবে এবং সেই বিশ্লেষণ সফল হলে আমরা দেখতে পাব যে আসলে রসোক্তি কৌতুকহাস্যেরই সূক্ষ্মতর আর লঘুতর (plus volatile) অবস্থা। কিন্তু তা না করে আমরা যদি বিপরীত পদ্ধতি ব্যবহার করি অর্থাৎ সরাসরি রসোক্তির রহস্যের সূত্র খোঁজার চেষ্টা করি, তাহলে আমাদের চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। যে রসায়নবিজ্ঞানী তাঁর ল্যাবরেটরিতে একটা বিশেষ রাসায়নিক জিনিষ বোতলের পর বোতল মজুত থাকা সত্ত্বেও গবেষণার সাহায্যে বাতাস থেকে নতুন করে সেই একই রসায়ন আহরণ করার চেষ্টা করেন, বিশেষ করে বাতাসে সেই অভিষ্ট বস্তুটির পরিমাণ যদি খুবই কম হয়, তাঁর সম্বন্ধে আমাদের কি ধারণা হওয়া সম্ভব?

রসোত্তীর্ণ (spirituel) আর হাস্যকর এই দু'রকম জিনিষের মধ্যে তুলনার পদ্ধতি থেকেই আমরা শিখব ভাষার হাস্যকরতা বা ভাষাগত কৌতুকের (l'esprit du mot) বিশ্লেষণও আমাদের কিভাবে করতে হবে। প্রকৃতই আমরা লক্ষ করি যে এক অর্থে যে-কোন হাস্যকর উক্তি এবং কোন রসোক্তির মধ্যে মূলতঃ কোন তফাৎ নেই। অন্তপক্ষে, রসোক্তির সঙ্গে শব্দালঙ্কার বা অর্থালঙ্কারের কোন সম্বন্ধ থাকলেও, এই ধরনের উক্তি নির্ব্যতিরেকে আমাদের মানসপটে স্পষ্ট বা আবছা একটা কৌতুককর চিত্রকল্পের সৃষ্টি করে। তার মানে কৌতুককর ভাষা এবং হাস্যকর ঘটনার মধ্যে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে একটা পারম্পর্য থাকা স্বাভাবিক, এবং বলা যায় যে কৌতুককর কোন উক্তি কোন হাস্যকর ঘটনারই ভাষাগত উপস্থাপনা মাত্র। তাই এখানে কৌতুককর ঘটনা ও পরিস্থিতির চরিত্রের দিকে ফিরে চাইতে হবে, দেখতে হবে প্রধানত কোন্ কোন্ পদ্ধতি অনুসারে সেগুলির আবির্ভাব হয়, এবং লক্ষ করতে হবে কোন্ কোন্ শব্দ ব্যবহারের ফলে সেই ঘটনা ও পরিস্থিতিগুলি ভাষাগত রূপ পায়। এই পদ্ধতির সাহায্যে আমরা সম্ভাব্য সকল শ্রেণীর ভাষাগত হাস্যরস (comique de mots) এবং একই সঙ্গে সবজাতের রসোক্তির (comique de l'esprit) সন্ধান পাব।

১। মানসিক জাড্য (raideur) বা হঠকারিতার ফলে অনিচ্ছাকৃত-ভাবে আমরা যা করি বা বলি তা কৌতুকহাস্যের একটা প্রধান উৎস, এই ব্যাপারটা ইতিপূর্বে লক্ষ করা গেছে। অন্যমনস্কতা হাস্যকৌতুকের একটা বড় কারণ এবং উপাদান হওয়ার ফলে আমাদের অঙ্গভঙ্গী, মানসিক প্রতি-ক্রিয়া এবং মুখাবয়বের ভাবপ্রকাশে যদি আমরা যন্ত্রসদৃশ অনমনীয়তা অনুভব করি তা আমাদের কৌতুকবোধকে জাগিয়ে তোলে। প্রশ্ন হোল, এই অনমনীয় জাড্য (genre de raideur) আমরা কি ভাষার ব্যবহারেও ধরতে পারি? নিঃসন্দেহে পারি, কারণ আমাদের ব্যবহৃত ভাষার মধ্যে গতানুগতিক উক্তি (clichés, platitudes) এবং বৈচিত্র্যশূন্য বাক্যাংশের একটা বড় ভূমিকা আছে। কোন লোক যদি ক্রমাগত এই ধরনের ভাষা

ব্যবহার করে অবশ্যই সে আমাদের হাসির উদ্রেক করে। কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে কোন বাক্যাংশকে যদি বক্তৃনিরপেক্ষভাবে কৌতুকপ্রদ হয়ে উঠতে হয়, তাকে অবশ্যই যাবতীয় গতানুগতিক উক্তি থেকে আলাদা হতে হবে, তার মধ্যে এমন কোন বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে যা আমাদের নিশ্চিতভাবে বুঝিয়ে দেবে যে বক্তা চিন্তা না করে অন্যমনস্ক হয়ে কথাটি বলে ফেলেছেন। যখন কোন উচ্চারিত বাক্যাংশের মধ্যে বক্তার ভ্রান্তি বা স্ববিরোধিতা সহজেই প্রকট হয়ে' উক্তিটিকে তাৎপর্যহীন করে তখনই এই সত্যটি স্পষ্ট হয়। তাই এই রকম একটা সাধারণ সূত্র স্থির করা যায়: যখন কোন যুক্তি-বা-অর্থহীন ধারণা কোন প্রচলিত বাক্যাংশের মধ্যে আধৃত হয় তখন তার ফলে একটা কৌতুককর চিন্তার উদ্ভব অনিবার্য।

প্রুধম (Proudhomme)[৩৩] বলেছিলেন, "Ce sabre est le plus beau jour de ma vie" এই বাক্যটিকে ইংরাজী, জার্মান কিংবা অন্য যে কোন ভাষায় অনুবাদ করলে কোন তাৎপর্যই থাকে না, কিন্তু ফরাসিতে কথাগুলি খুবই মজার। তার কারণ "le plus beau jour de ma vie" ফরাসিদের কাছে একেবারে মামুলি কতকগুলি কথা, যেগুলি শুনতে তারা ভীষণ অভ্যস্ত। তাই উক্তিটিকে হাস্যকর করে তুলতে হলে বক্তার হাব-ভাবের যান্ত্রিকতাকে খুব যত্ন করে ফুটিয়ে তুলতে হবে। তাই যখন কোন উক্তি বা শব্দসমষ্টি আমাদের কাছে অর্থহীন বলে মনে হয় তখন তার পেছনে এই প্রক্রিয়াটি কাজ করছে বুঝতে হবে। এখানে কিন্তু উক্তিটির অর্থহীনতা হাসির কারণ নয়, পরিস্থিতির মধ্যে যে কৌতুকাবহ ব্যাপার বর্তমান তাকে স্পষ্ট করে তোলার সবচেয়ে সফল আর সরল উপায় হিসেবেই এখানে কথা-গুলির গুরুত্ব।

এখানে আমরা মঃ প্রুধমের একটি মাত্র উক্তির কথা বলেছি। তাঁর অসংখ্য উক্তির মধ্যে আমরা ঠিক এই ধরনের জিনিষ দেখতে পাব, কারণ তিনি তাঁর মাতৃভাষায় প্রচলিত বাক্যাংশ আর বাগ্‌বিধি (phrases toutes faites) ব্যবহারের দৃষ্টান্ত স্বরূপ। যেহেতু প্রত্যেক ভাষার একান্ত নিজস্ব কতকগুলো বাগ্‌বিধি আছে, মঃ প্রুধমের কথাগুলোকেও নিশ্চয়ই ভাষান্তরিত

করা যায়, কিন্তু সেগুলির আক্ষরিক বা আনুষঙ্গিক ভাষান্তর সম্ভবপর নয়।

বহুক্ষেত্রে সাধারণ বাক্য বা বাক্যাংশের অর্থহীনতা সহজে লক্ষ করা যায় না। ধরুন কোন অলস চরিত্রের লোক বলল, "দুটো খাওয়ার মাঝখানে কাজ করা আমি মোটে পছন্দ করি না।" কথাগুলোর পেছনে হাস্যকর কিছুই থাকত না যদি সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যসম্বন্ধে সেই উপদেশটি, "দুই ভোজনের মধ্যস্থ সময়ে আবার খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর" আমাদের মনে না পড়ত।

কখনও কখনও কোন উক্তির প্রতিক্রিয়া বেশ গোলমেলে হয়ে পড়ে। কোন খুব সাদামাটা বাক্যাংশের জায়গায় দুই বা তিনটি বাক্য বা বাক্যাংশকে মিলিয়ে বলা হয়। লাবিশের একটি নাটকের কোন চরিত্রের একটি উক্তিকে উদাহরণ হিসেবে ধরা যায়। "একমাত্র ঈশ্বরেরই অধিকার আছে তাঁর সঙ্গীদের হত্যা করার"। আমার ধারণা নাট্যকার আমাদের খুব পরিচিত দুটো উক্তি সুবিধেমত মিশিয়ে ব্যবহার করেছেন। "একমাত্র ঈশ্বরই মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন", আর "মানুষের পক্ষে অন্য মানুষকে হত্যা করা মহা অপরাধ"—এই দুই বাক্যের এখানে মিশ্রণ ঘটেছে। কিন্তু নাটকটির এই বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে কথা দুটিকে এমন ভাবে মেশানো হয়েছে যাতে শোনামাত্র আমাদের কান সাময়িকভাবে বোকা বনে যায়, মনে হয় আমরা অতি সাধারণ, বহুল ব্যবহৃত, না ভেবে মেনে নেওয়ার মত কোন উক্তি শুনছি। আমাদের মানসিক অসতর্কতার ফলে প্রথমে আমরা উক্তিটিকে যথার্থ বলে মেনেও নিই, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই উক্তিটির হাস্যকরতা আর নিরর্থকতা চিন্তার জাড্য থেকে আমাদের জাগিয়ে তোলে।

উদাহরণগুলি আমাদের বেশ ভালভাবেই বুঝিয়ে দেয় কিভাবে উচ্চারিত শব্দ থেকেই একটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ কৌতুকহাস্যের উদ্ভব হয় এবং সরলভাবে ভাষার ওপর খেলা করে। এবার অপেক্ষাকৃত দুর্লভ বাক্‌চাতুর্যের আলোচনায় আসা যেতে পারে।

২। আমাদের আলোচনার আরম্ভেই হাস্যরসের যে সূত্রগুলির উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে একটি হোল, "যখন মানুষের নৈতিক বা মানসিক অবস্থা তার বাইরে লক্ষিত বিকৃতির কারণ হওয়া সত্ত্বেও তার শারীরিক অবস্থার দিকে আমাদের মনকে আকৃষ্ট করে তখনই আমরা হাসি।" এবার এই সূত্রটিকে ভাষার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করে দেখা যাক। বলা যায় যে অধিকাংশ শব্দের (mots) একটা বাহ্য বা দেহগত আর একটা নৈতিক বা আত্মিক তাৎপর্য আছে। 'অর্থাৎ শব্দগুলিকে বাচ্যার্থে (au propre) এবং ব্যঙ্গার্থে (au figuré) ব্যবহার করা যায়। বস্তুতঃ প্রত্যেকটি শব্দ আদিতে বিশেষ কোন বস্তু, ঘটনা বা ক্রিয়ার বর্ণনার কাজে ব্যবহার করা হোত। কিন্তু কাল-ক্রমে ধীরে ধীরে শব্দটির অর্থ তার বস্তুগত চরিত্র থেকে কোন মানসিক অবস্থা (état spirituel) কিংবা পুরোপুরি কোন ধারণা বা চিন্তার সূচক হয়ে দাঁড়ায়। যদি এই অনুচ্ছেদের গোড়াতেই উল্লিখিত নীতি বা সূত্র এখানেও প্রযোজ্য হয়, তাহলে সেটিকে আমরা এইভাবে সাজাবো : রূপক অর্থে ব্যবহৃত কোন শব্দ বা উক্তিকে যখন আমরা তার আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করি তখনই তা আমাদের কৌতুকবোধকে উজ্জীবিত করে। কিংবা, যখন আমাদের মন কোন রূপকধর্মী উক্তির আক্ষরিক তাৎপর্যের ওপর নিবিষ্ট হয়, তখনই তার দ্বারা প্রকাশিতব্য চিন্তাটি হাস্যকর হয়ে ওঠে।

"Tous les arts sont frères' অর্থাৎ সব শিল্পই ভ্রাতৃপ্রতিম, এই বাক্যটিতে 'frères' (ভাইরা) শব্দটি রূপকার্থে (au sens figuré) ব্যবহৃত হয়েছে, বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে অল্পবিস্তর লক্ষণীয় সাদৃশ্যগুলিকে মনে রেখে। শব্দটি এত ব্যাপকভাবে এই তাৎপর্যে ব্যবহৃত হয় যে শুনে নানা শিল্পের মধ্যে ভ্রাতৃসুলভ সাদৃশ্যের কথা আক্ষরিক অর্থে আমাদের চিন্তাতেই আসে না। কিন্তু যদি বলা হোত "tous les arts sont cousins' তাহলে বলার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে খটকা লাগত, কারণ 'cousins' অর্থাৎ "তুতো ভাই' বা জ্ঞাতি ভাই এই শব্দগুলি রূপকার্থে বেশি ব্যবহার করার রীতি আমাদের ভাষায় নেই। কিন্তু আরও একটু এগিয়ে ধরে নেওয়া যাক্ যে রূপকটির আক্ষরিক তাৎপর্যের দিকে আমাদের চিন্তাকে আকৃষ্ট করা

হোল' বাক্যটির মধ্যে দুটো শব্দের মধ্যে লিঙ্গগত অসামঞ্জস্যকে বাড়িয়ে তুলে। এর ফলে আমাদের মনে আরও বিশেষ একটি কৌতুককর উপলব্ধি জাগবে। 'Tous les arts sont soeurs' (প্রত্যেক শিল্পই অন্য যে কোন শিল্পের ভগিনীপ্রতিম), এই পরিচিত উক্তিটির জনকও মঃ প্রুধম্।

বুফলের[৩৪] (Boufflers) সম্মুখে একজন দাম্ভিক লোক সম্বন্ধে বলা হয়েছিল, "ভদ্রলোক সব সময়ে ঠাট্টার পেছনে ছোটেন" ; এর উত্তরে বুফলে যদি বলতেন, "তিনি কিন্তু ওকে ধরতে পারেন না,' তাহলে কথাটা একটা রসোক্তির সূচনা করত, কিন্তু তাতে সূচনার চেয়ে বেশি কিছু হোত না, কারণ 'ধরা' (attraper) শব্দটি 'ছোটা (courir) শব্দটির মতই অনবরত রূপকার্থে ব্যবহৃত হয়। তা ছাড়া, 'ধরা' এই শব্দটি শুনলে একজন অন্য কাউকে সজোরে তাড়া করেছে, এই রকম একটা ছবি মনের মধ্যে জেগে ওঠেই, 'ছোটা' শব্দটি কিন্তু অনুরূপ কোন চিত্রকল্পের জন্ম দেয় না। আপনি কি চান যে আপনার উত্তরটি আমার কাছে পুরোপুরি 'রসোত্তীর্ণ' বা witty হোক ? তা হলে খেলাধূলার জগৎ থেকে আপনাকে এমন একটা স্পষ্ট আর বস্তুনিষ্ঠ শব্দ বেছে নিতে হবে যেটা শুনলেই ধাবমান প্রতিযোগিদের ছবি আমার মনে ভেসে ওঠে। বুফলে যখন উল্টে বলেন, "আমি ঠাট্টার ওপর বাজি রাখব', তখন তিনি ঠিক এই নীতিটি কাজে লাগান।

এর আগে আমরা বলেছি যে 'রসোক্তি' সৃষ্টি করতে হলে অনেক সময় কোন কাল্পনিক প্রতিবাদীকে এমন মানসিক অবস্থায় নিয়ে যেতে হয় যেখানে তিনি যা ভাবেন ঠিক তার বিপরীত চিন্তা প্রকাশ করতে বাধ্য হন এবং তাঁর চিন্তা ও উক্তির পরস্পরবিরোধী জালে তাঁকে জড়িয়ে ফেলা হয়। এখন এই সূত্রে আমরা আরও একটা ব্যাপার যোগ করব। আমরা বলব, এই জালটি প্রায় সবক্ষেত্রে রূপকধর্মী বা তুলনাভিত্তিক, যা ব্যবহারিক জগতে ঠিক উল্টো রূপ নিয়ে বক্তার বিরুদ্ধে যায়। এই প্রসঙ্গে *Faux Bonshommes* নাটকে মা ও ছেলের মধ্যে কথোপকথন মনে করা যেতে পারে : মা ছেলেকে বলছেন, "জুয়ো অত্যন্ত বিপজ্জনক খেলা ; একদিন হয়তো কিছু লাভ হোল, কিন্তু পরের দিনে লোকসান

হবেই।" ছেলেটি উত্তর দিল, 'বেশ, তাহলে আমি একদিন অন্তর জুয়ো খেলব।" এই নাটকেই দু'জন ব্যবসায়ীর মধ্যে আমরা এই শিক্ষাপ্রদ সংলাপ শুনতে পাই, "আমরা যা করছি তা কি খুব সম্মানের? এই সব ভাগ্যহীন অংশীদারদের পকেট থেকে টাকা নিচ্ছি!" "তাহলে টাকাটা কোথা থেকে নেব আমরা?"

যখন কোন প্রতীক বা স্মারককে (symbole on emblème) তার বস্তুগতরূপের ভিত্তিতে কোন সংলাপে পল্লবিত করা হয় এবং যুগপৎ তার প্রতীকত্ব ও স্মারকত্ব সম্বন্ধে পাঠক বা শ্রোতার চেতনাকে জাগিয়ে রাখার ভাণ করা হয়, তখন কতকগুলি কৌতুককর পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমরা সচেতন হই। একটা বেশ জমাট কৌতুকনাটকে মন্টি কার্লোর এক সরকারী কর্মচারীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়, তাঁর সারা পোষাক নানারকম পদক আর পদ-সূচক অলঙ্কারে ঢাকা, যদিও সরকার নিজে তাকে মাত্র একটা সম্মানসূচক পদক দিয়েছেন। কর্মচারীটি তার বুকভর্তি পদকমালার রহস্য ব্যাখ্যা করে বলে, "আসলে হয়েছে কি, জুয়ো খেলতে গিয়ে আমার পদকটা বাজী রেখেছিলাম রুলেত (roulette) চাকার একটা বিশেষ সংখ্যায়; যখন দেখলুম যে খেলায় ঐ সংখ্যাটাই উঠল, আমি ছত্রিশটা মেডেল পেয়ে গেলুম।" কর্মচারীটির এই ব্যাখ্যা অনেকটা *Effronté's* নাটকের জিবো-ইয়ের (Giboyer) দেওয়া যুক্তির মত। চল্লিশ বছর বয়সের এক কনের বিয়ের গাউন fleurs d'oranger[৩৫] বা কমলালেবুর ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে দেখে জিবোইয়ের বলে, "ওর শুধু কমলা ফুল কেন, কমলালেবুই তো পাওনা হয়ে গেছে।"

কিন্তু হাস্যকৌতুকের যে নিয়মগুলি আমরা উল্লেখ করেছি তাদের প্রত্যেকটিকে যদি আমরা ভাষার স্তরে প্রয়োগ করে দেখাবার চেষ্টা করি আমাদের এই আলোচনা শেষই হবে না। তাই এর আগের অধ্যায়ের যে তিনটি সাধারণ সূত্র বা নীতি (lois) আমরা গ্রহণ করেছি সেগুলির মধ্যেই আমরা এই অনুসন্ধানকে সীমিত রাখতে চাই। আমরা দেখাতে চেয়েছি যে কোন ঘটনাক্রম তিনটি পদ্ধতিতে সাজানো হলে হাস্যকর হয়ে ওঠে:

পুনরাবৃত্তি, বৈপরীত্য ও দুই বা ততোধিক স্বতন্ত্র ঘটনাপ্রবাহের আন্তরন্থ-প্রবেশের ফলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি। এখন আমরা দেখব উচ্চারিত শব্দস্রোতের মধ্যে কৌতুকহাস্যের অস্তিত্বের পেছনেও এই পদ্ধতিগুলো সক্রিয় কিনা।

কোন ঘটনাক্রমকে একটু আলাদা সুরে এবং কিছুটা ভিন্ন পরিবেশে পুনরাবৃত্তি করা, কিংবা তাদের তাৎপর্যকে সম্পূর্ণ নষ্ট না করে একটু বিপরীত জাতের পরিস্থিতিতে পরিবেশন, কিংবা ঘটনাগুলোকে এলোমেলো করে মিশিয়ে তাদের স্বকীয় তাৎপর্যের মধ্যে ভুলবোঝাবুঝির সৃষ্টি—এ সমস্ত প্রক্রিয়ার সবগুলিই হাস্যকর হয়ে ওঠে কারণ এই ধরনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে জীবনকে একটা যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী বা পদ্ধতির মাধ্যমে দেখা যায়। কিন্তু আমাদের চিন্তা জিনিসটাই একটা প্রাণবন্ত ব্যাপার। সেই চিন্তাকে রূপ দেয় যে ভাষা তাকেও ঠিক অনুরূপভাবে জীবন্ত হতে হবে। তাই সহজেই অনুমান করা যায় যে কোন বাক্যের স্বাভাবিক বিন্যাস উল্টে গিয়েও সেটি যদি অর্থবহ থাকে তা হলে তা আমাদের কৌতুকের সৃষ্টি করে; কিংবা যখন বিপর্যস্ত বাক্যক্রম সমান সাফল্যের সঙ্গে দুটো একেবারে আলাদা চিন্তার বাহক হিসেবে কাজ করে, কিংবা, পরিশেষে, যদি কোন বাক্য তার ঈপ্সিত অর্থের দ্যোতক না হয়ে অন্য কোন অনভিলষিত চিন্তা বা ভাবের ব্যঞ্জনা আনে তখনও তা হাস্যকর হয়। বাক্যের কৌতুকপ্রদ রূপান্তরের পেছনে এই তিনটিই প্রধান কারণ। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে ব্যাপারটিকে বিশদ করা যেতে পারে।

প্রথমেই বলে নেওয়া দরকার যে হাস্যকৌতুকের সূত্র হিসেবে এই তিনটির সবগুলি সমান গুরুত্বপূর্ণ নয়। এদের মধ্যে বৈপরীত্য বা inversion জাতীয় প্রক্রিয়াটি সবচেয়ে কম আগ্রহ জাগায়। কিন্তু প্রয়োগের দিক থেকে এইটিই সহজতর, কারণ দেখা যায় যে পেশাদার বিদূষক বা ভাঁড় যখনই কোন কথা উচ্চারিত হতে শোনে, সে সঙ্গে সঙ্গে দেখতে চায় উক্তিটিকে উল্টে ফেললেও তার কোন মানে হয় কিনা—যেমন কর্তার জায়গায় কর্ম, আর কর্মের স্থানে কর্তাকে স্থানান্তরিত করে। হাল্কা ধরনের কৌতুকের সাহায্যে কোন চিন্তা বা বক্তব্যকে খণ্ডন করার উদ্দেশ্যে এই

পদ্ধতি ব্যবহার করার দৃষ্টান্ত অস্বাভাবিক বা বিরল নয়। লাবিশের লেখা একটা প্রহসনে একটি চরিত্র তার বাড়ির ওপর তলার যে প্রতিবেশী প্রায়ই তার দালানে জঞ্জাল আর নোংরা ফেলে তাকে উদ্দেশ করে চেঁচিয়ে বলে, “কি ব্যাপার? আপনার নর্দমার ময়লা কেন আমার বারান্দায় উপুড় করেন?” প্রতিবেশীও তেড়ে জবাব দেয়, “আপনিই বা কেন আপনার দালানটা ঠিক আমার নালার তলায় রাখেন?” এ-ধরনের ভাঁড়ামোর বেশি উদাহরণ দেবার দরকার নেই কারণ এমন দৃষ্টান্ত অসংখ্য পাওয়া যাবে।

একই বাক্যের মধ্যে দুটো আলাদা চিন্তার পারস্পরিক অনুপ্রবেশের ফলে অসংখ্য উদ্ভট কৌতুকহাস্যের জন্ম হতে পারে। বাক্যের একটি অর্থ দিয়ে অন্য আর একটি অর্থকে বিম্বিত করার একাধিক উপায় ভাবা যেতে পারে। যেমন, আপাতরূপে পরস্পরের সঙ্গে মিলে যেতে পারে এমন দুটো স্বতন্ত্র অর্থ একই উক্তির মধ্যে সহাবস্থান করতে পারে। এই জাতীয় সবচেয়ে বেশি চলতি এবং সাধারণ অর্থালঙ্কার হোল শ্লেষ (calambour or pun)। এই অলঙ্কারে একই বাক্য বা শব্দ দুটো পৃথক্ অর্থ প্রকাশ করে; কিন্তু এ-হেন ক্ষেত্রে সমস্ত জিনিষটাই বাইরের, বা আপাত। আসলে এ-ক্ষেত্রে আমরা যা পাই তা হোল আলাদা দুটো শব্দ দিয়ে তৈরি দুটো স্বতন্ত্র বাক্য। শব্দগুলোকে অভিন্ন বলে মনে হয় কারণ দুটো শব্দই শুনতে এক রকম। এই জাতের শব্দালঙ্কার থেকে শুরু করে আমরা আরও সমৃদ্ধ শব্দভিত্তিক অর্থালঙ্কারে চলে যেতে পারি, যেখানে শব্দ নিয়ে যথার্থ লীলা বা খেলা চলে (jeu de mots)। এখানে আসলে এক বা অভিন্ন বাক্য বা শব্দ দিয়ে দুটো আলাদা চিন্তা প্রকাশ করা হয়, অথচ আমরা কেবল একটি বাক্যের সাহায্যেই সেই দুই ভিন্ন অর্থসমৃদ্ধি সম্বন্ধে সচেতন হই। বক্তা বা লেখক একই শব্দের একাধিক তাৎপর্যকে এখানে কাজে লাগান, বিশেষ করে শব্দের বাচ্যার্থের চেয়ে তার ব্যঙ্গার্থ বা ব্যঞ্জনাকে প্রাধান্য দিয়ে। তাই দেখা যাচ্ছে, শব্দ দিয়ে ‘শ্লেষ’ করা এবং শব্দকে রূপকার্থে ব্যবহার করার মধ্যে যে পার্থক্য তা খুবই সূক্ষ্ম। বুদ্ধিদীপ্ত উপমা বা তুলনা এবং উল্লেখযোগ্য চিত্রকল্পের ব্যবহার ভাষা ও প্রকৃতির মধ্যে নিকট-সম্বন্ধকে

আমাদের কাছে স্পষ্ট করে তোলে—তাখাকে প্রকৃতির সমান্তরাল একটি শক্তি বলে আমাদের মনে হয়। অন্যপক্ষে, শুধুমাত্র শ্লেষের ব্যবহার ভাষার ব্যবহারে লেখক ও বক্তার আলস্য বা অবহেলার ধারণা সৃষ্টি করে—মনে হয় অন্তত ঐ বিশেষ মুহূর্তটিতে ভাষা তার সঠিক দায়িত্ব পালন করতে ভুলে গেছে; বস্তুর মধ্যে নিজেকে লীন না করে বস্তুকে নিজের মধ্যে সীমিত রাখতে চাইছে। তাই 'শ্লেষ'-এর ব্যবহার সব সময়েই সাময়িক ভাষাগত অন্যমনস্কতার (distraction momentaire) সূচনা করে, এবং ঠিক ঐ কারণেই শ্লেষের ব্যবহার আমাদের কাছে কৌতুকপ্রদ লাগে।

বৈপরীত্য (inversion) আর দুই বা তার চেয়ে বেশি স্বতন্ত্র চিন্তার মধ্যে যে পারস্পরিক অনুপ্রবেশ (interférence) তা আসলে শব্দের চতুর ব্যবহারে পারদর্শী মনেরই একটি খেলাবিশেষ। তার চেয়েও গভীরতর ব্যাপার হোল একটি শব্দের জায়গায় অন্য কোন শব্দ ব্যবহারের (transposition) ফলে উদ্ভূত হাস্যরস। বলা চলে, প্রহসনে একই ব্যাপারের পুনর্ঘটন আর ভাষার ক্ষেত্রে শব্দের পারস্পরিক স্থান বিনিময় (transposition) মূলত একই জিনিষ।

এর আগে আমরা বলেছি যে প্রহসনের একটা চিরায়ত বা শাশ্বত পদ্ধতি হোল 'পুনরাবৃত্তি' (repétition)। সেখানে হয় নতুন কোন পটভূমি বা পরিবেশে পুরানো কোন দৃশ্যের পুনরবতারণা করা হয় একই চরিত্রদের নিয়ে, কিংবা পুরানো পরিবেশে নতুন চরিত্রদের কাজে লাগিয়ে। যেমন, বাড়ির মনিবরা যে ঘটনায় অংশ নিয়েছেন, তার ঠিক অনুরূপ ঘটনায় ঐ পরিবারের চাকর-বাকরদের অংশ নিতে দেখা যায়। শুধু তাদের কথাবার্তার ভাষা একটু অমার্জিত হয়। ধরুন, কোন চিন্তা উপযুক্ত ভাষায় প্রকাশিত হচ্ছে আর তার স্বাভাবিক পরিবেশে রূপ পাচ্ছে। এবার এমন কোন পদ্ধতির কথা ভাবুন যার সাহায্যে ঐ একই পরিস্থিতিকে নতুন কোন পরিমণ্ডলে স্থানান্তরিত করা হয়েছে; অথবা ধরুন একেবারে নতুন ঢং-এ চরিত্রগুলোকে দিয়ে তাদের প্রতিক্রিয়াগুলোকে প্রকাশ করানো হয়েছে।

এর ফলে দেখা যাবে চরিত্রগুলোর মুখের ভাষাই সেখানে কৌতুকহাস্যের উৎস হিসেবে কাজ করছে অর্থাৎ ভাষা নিজেই হাস্যকর হয়ে উঠেছে। তা ছাড়া, এই রকম কোন পরিস্থিতিতে একই ভাব ও বিষয়ের স্বাভাবিক প্রকাশপন্থা আর তার জায়গায় ব্যবহৃত বিকল্প কোন রূপকে আলাদা করে দেখানোর কোন দরকারই হবে না। তার কারণ, স্বাভাবিক প্রকাশভঙ্গীর ভাষার সঙ্গেই আমরা সাধারণত পরিচিত, কারণ ঐ প্রকাশভঙ্গী আমাদের যাবতীয় সহজ প্রবণতার সঙ্গে ওতপ্রোত। তাই কৌতুকহাস্য সৃষ্টির প্রয়াস যদি শুধুই ঐ বিকল্প প্রকাশভঙ্গীর আবিষ্কারের কাজে লাগানো হয় তাহলেই যথেষ্ট হবে, আমরা নিজের থেকেই স্বাভাবিক বা প্রচলিত প্রকাশ পদ্ধতিটিকে তুলনার জন্য মনে করব। অতএব এই আলোচনার থেকে এই সূত্রটি বেরিয়ে আসে: কোন চিন্তা বা ভাবনার স্বাভাবিক প্রকাশভঙ্গীর স্থানে যখন কোন বিকল্প ভঙ্গীতে ঐ চিন্তা বা ভাবনাকেই প্রকাশ করা হয় তখন তা আমাদের কাছে হাস্যকর হয়ে ওঠে।

এই বিকল্প প্রকাশভঙ্গী ব্যবহারের পদ্ধতি এত অসংখ্য এবং বিচিত্র, ভাষা এত সৌন্দর্য আর সৌকর্যের সঙ্গে সেখানে এত বিভিন্ন বিষয়ে অনুপূর্ব যোগাতে পারে, অতি নিচুস্তরের ভাঁড়ামো থেকে শুরু করে উচ্চতম মার্গের রসিকতা ও ব্যাজস্তুতির এত বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে ভাষা সেখানে এগোতে পারে যে তার সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া সম্ভবপর নয়। সূত্রটি উল্লেখ করার পর আমরা শুধু কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে তার প্রয়োগপদ্ধতি লক্ষ করব।

প্রথমেই ভাষাপ্রয়োগের মাপকাঠিতে দুটো চরম এবং পরস্পরবিরোধী শৈলীর মধ্যে পার্থক্য লক্ষ করা যায়—একটি হোল গুরুগম্ভীর আর সম্ভ্রম-সূচক, অন্যটি ঘরোয়া, সাধারণ বা আটপৌরে। এদের একটির জায়গায় অন্যটিকে ব্যবহার করে আমরা খুব পরিষ্কার ভাবে প্রতিক্রিয়া বুঝতে পারি এবং তার ফলে উৎপন্ন কৌতুককল্পনার দুটো বিপরীতমুখী স্রোত আমরা কাজে লাগাতে পারি।

ঘরোয়া জিনিষের ওপর গুরুগম্ভীর সুর আরোপ করলে আমরা পাই প্যারডি বা বিদ্রূপাত্মক হাসি। এইভাবে যদি প্যারডির সংজ্ঞা নিরূপিত হয়

তাহলে দেখা যাবে যে তার রেশ ঘরোয়া ভাষায় প্রকাশিত এমন সব ভাবের জগতেও অনুসৃত হয় যেগুলি প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী অন্য ভাষায় এবং ভঙ্গীতে প্রকাশ করা দরকার। যেমন জঁ্য পোল রিখ্‌টার[৩৬] (Jean Paul Richter) উল্লিখিত ভোরের আকাশের এই বর্ণনাটি : আকাশ কাল থেকে লাল রং-এ বদলাতে শুরু করেছিল, মনে হচ্ছিল যেন একটা গল্‌দা চিংড়ি সেদ্ধ হচ্ছে।" লক্ষ করা যেতে পারে যে পুরানো কোন ব্যাপারকে হঠাৎ আধুনিক জীবনের অনুষঙ্গে বেঁধে ফেললে ঠিক অনুরূপ ফল পাওয়া যায়, কারণ প্রাচীন জগৎ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা বা কল্পনাকে একটা কাব্যসুলভ দ্যুতি ঘিরে রেখেছে।

বিদ্রূপ বা প্যারডির মধ্যে প্রচ্ছন্ন কৌতুকবোধ আলেকজাণ্ডার বঁ্যা[৩৭] (Alexander Bain)-এর মত কিছু কিছু দার্শনিকের কাছে কমেডির লক্ষণের মধ্যে এক ধরনের অবনমন বা বিকৃতির সূচনাকে প্রকট করেছে। আগে যা শ্রোতা, পাঠক বা দর্শকের সম্ভ্রম জাগাতো তাকে হেয় এবং হাস্যকর করে তোলাই তাঁদের মতে কৌতুকহাস্যের লক্ষ্য। কিন্তু এ-পর্যন্ত আমরা যে-বিশ্লেষণ করেছি তা যদি ঠিক হয় তাহলে এই অবনমন প্রক্রিয়া আরোপ (transposition) পদ্ধতির অনেকগুলির অন্যতম। আবার আরোপ পদ্ধতি ছাড়াও কৌতুকহাস্য জাগাবার অন্য অনেক উপায় আছে, এবং হাসির উৎস খুঁজতে গেলে আমাদের আরও একটু পিছিয়ে যেতে হবে। বেশি পেছনে না গিয়েও আমরা দেখি গাম্ভীর্য থেকে তারল্যে, শ্রেয়ঃ থেকে হেয়তে অবনমন যেমন হাসির কারণ হতে পারে, তেমনি তার বিপরীত শ্রেণীর আরোপ পদ্ধতি বোধ হয় আরও বেশি কৌতুকোদ্দীপক হতে পারে।

এই দ্বিতীয় জাতের আরোপপদ্ধতি প্রথম শ্রেণীটির মতই বহুল ব্যবহার হতে দেখা যায়। কখনও কোন বস্তুর বাহ্যরূপ, কখনও বা আবার তার আভ্যন্তরীণ বা নৈতিক বৈশিষ্ট্যকে কেন্দ্র করে এই পদ্ধতি সক্রিয় হয়।

ছোট ব্যাপারকে বড় করে দেখানোর যে প্রক্রিয়া তাকে বলা হয় অতিরঞ্জন। যখনই 'অতিরঞ্জন' পদ্ধতিটিকে বেশিক্ষণ চালানো হয় তখনই

তা কৌতুকপ্রদ হয়ে দাঁড়ায়—বিশেষ করে যখন এই পদ্ধতিটি রীতিমত এবং সুসমঞ্জভাবে প্রযুক্ত হয়। তখনই 'অতিরঞ্জন'কে আরোপ পদ্ধতির অন্ত একটা উপ-পদ্ধতি বলে ধরে নেওয়া যায়। এই পদ্ধতির দক্ষ প্রয়োগ এমন প্রবল হাসির উদ্রেক করে যে কোন কোন সাহিত্যিক কৌতুকহাস্তকে 'অতিরঞ্জন' বলেই অভিহিত করেছেন, যেমন অন্ত কিছু সাহিত্যসমালোচক কৌতুকহাস্তকে গ্রন্থর 'অবমূল্যায়ন' এই আখ্যা দিতে চেয়েছেন। বাস্তবিক, অবমূল্যায়নের মত অতিরঞ্জনও কৌতুকহাস্তের বিভিন্ন সৃজনী পদ্ধতির মধ্যে একটি। তবুও এই পদ্ধতিটিও আমাদের ওপর বেশ প্রভাব বিস্তার করে। এর থেকেই বিদ্রূপাত্মক বীররসের (héroi-comique) কাব্যের জন্ম হয়েছে; অবশ্য, এ-ধরনের কাব্য যে কিছুটা সেকেলে তা অনস্বীকার্য; তবুও যে-সব লোক বেশ নিয়মমাফিক গুছিয়ে অতিরঞ্জন করার প্রবণতা দেখান তাঁদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য এখনও কিছুটা অবশিষ্ট আছে। বলা যায় মানুষের আত্মশ্লাঘার মধ্যে যে মেকি-বীরত্বের (moque-héroique) ব্যাপারটা দেখা যায় তাই আমাদের হাসির কারণ হয়।

এর থেকে অনেক বেশি কৃত্রিম অথচ পরিশীলিত জিনিস হোল নিম্নস্তরের ব্যাপারকে উচ্চমার্গে উন্নীত করার প্রয়াস; বিশেষ করে যখন বস্তু বা ব্যক্তির বাহ্য আকৃতিকে বাদ দিয়ে তার নৈতিক মূল্য বা মানের ওপর এই পদ্ধতি আরোপিত হয়। কোন গর্হিত ঘটনা বা চিন্তা যখন মার্জিত এবং সুষ্ঠুভাবে ভাষার সাহায্যে উপস্থাপিত হয়, যখন কলঙ্কজনক কোন অবস্থা বা পরিস্থিতি, অথবা হীন কোন বৃত্তি কিংবা নিন্দনীয় ব্যবহার অত্যন্ত মর্যাদাসূচক ভাষায় উপস্থাপনা করা হয় তখন সাধারণত তা হাসির কারণ হয়ে ওঠে। এখানে 'Respectability' এই ইংরাজি শব্দটি ইচ্ছা করেই ব্যবহার করা হয়েছে কারণ এই গুণটি এবং সেই সঙ্গে এই পদ্ধতিটিও ইংরাজ জাতির একটা বিশেষ চারিত্রিক লক্ষণ। ডিকেন্স ও থ্যাকারের উপন্যাসে এই ধরনের অনেক নজির পাওয়া যাবে—হয়তো গোটা ইংরাজি সাহিত্যই এই জাতের অসংখ্য দৃষ্টান্তে পূর্ণ। যখন একটি মাত্র শব্দের ব্যবহারই কোন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে স্বীকৃত এই

আরোপ পদ্ধতির ইঙ্গিত বয়ে আনে তখন ঐ বিশেষ শব্দটিই এই বিশেষ শ্রেণীর কৌতুকহাস্ত সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট হয়। তখন মনে হয় এই ধরনের শব্দ যেন কোন দুর্নীতিকে শব্দের সাহায্যে একটা নীতিসম্মত রূপ দিয়েছে। গোগোলের (Gogol) এক উপন্যাসে কোন উচ্চপদস্থ কর্মচারী তার অধীনস্থ কর্মীকে যখন বলে "আপনার মত কর্মচারীর পক্ষে অর্থ নৈতিক দুর্নীতি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে', তখন বক্তব্য ও বাচনভঙ্গীর মধ্যে অসামঞ্জস্য আমাদের কৌতুক জাগায়।

এ-পর্যন্ত যা আলোচনা করা হোল তার মর্মার্থ দাঁড়ায় এই যে তুলনা করার জন্ম একেবারে বিপরীতধর্মী দুটি চরম পদ্ধতি আছে: হয় কোন ব্যাপারকে খুব বাড়িয়ে বলা, নয়তো তাকে একেবারে হেয় করে উপস্থাপিত করা। উৎকৃষ্ট আর অপকৃষ্ট, এই দুই চরম সীমার মধ্যে আরোপ (transposition) পদ্ধতিকে একদিকে বা তার একেবারে উল্টো দিকে সক্রিয় হতে হবে। এখন, এই দুই চরম আর পরস্পরবিরোধী পদ্ধতির মধ্যবর্তী ব্যবধানকে যদি ক্রমশ কমিয়ে আনা হয় তা হলে উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে বৈসাদৃশ্যগত বিরোধ আস্তে আস্তে কমে আসবে, কিন্তু তার পেছনে সক্রিয় কৌতুকহাস্তের আরোপবৈচিত্র্যের মধ্যেও নানা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কলাকৌশল অনুপ্রবিষ্ট করবে।

এই বৈষম্যভিত্তিক তুলনায় (les oppositions) সবচেয়ে সাধারণ রূপ বোধ হয় বাস্তবের সঙ্গে আদর্শের, যা ঘটছে তার সঙ্গে যা ঘটা উচিত তার তুলনা। এখানেও আবার আরোপ এবং বিনিময় এই দুটি পদ্ধতির যে-কোন একটি প্রাবল্য পেতে পারে। কখনও কখনও যা করা উচিত আমরা তার উল্লেখ করি এবং ভাণ করি যেন বাস্তবিক তাই ঘটছে। এ-হেন ক্ষেত্রে আমরা irony বা ব্যাজস্তুতির ব্যবহার করি। অন্তপক্ষে, কখনও কখনও খুব সূক্ষ্মভাবে যা প্রকৃতপক্ষে ঘটছে তাকে এমনভাবে বলা হয় যেন মনে হয় তাই ঘটা উচিত। হাস্যরস জাগাবার জন্ম প্রায়ই এই পদ্ধতির ব্যবহার দেখা যায়। এইভাবে বিশ্লেষণ করলে কৌতুকহাস্ত ব্যাজ-স্তুতির বিপরীত বা প্রতিপক্ষ একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এই দুটি

পদ্ধতিই ব্যঙ্গাত্মক রচনার দুটি আলাদা রূপ; কিন্তু ব্যাজস্তুতিতে যেমন বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের (oratoire) সংস্পর্শ আছে, তেমনি কৌতুকহাস্যে পাওয়া যায় বিজ্ঞানসুলভ মননের স্পর্শ। আমরা যত বেশি আদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হই ব্যাজস্তুতির চরিত্র ততই জোরালো হয়। সেই কারণেই ironie বা ব্যাজস্তুতি আমাদের মধ্যে এত বেশি উত্তাপ ও উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে যে তা অনেক ক্ষেত্রে আমাদের উক্তিকে বজ্রগর্ভ আর জ্বালাময়ী করে তোলে। বিপরীত পক্ষে, বাস্তব জগতের অন্যায় আর দুর্নীতির ব্যাপকতা আর গভীরতা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়ে নিরুত্তাপ অনীহার সুরে তার খুঁটিনাটি ব্যাপার বর্ণনায় আমরা যত বেশি মন দেব হাস্যকর ব্যাপারটা তত বেশি প্রকট হয়ে উঠবে। জঁ পোল (Jean Paul) এর মত কিছু লেখক লক্ষ করেছেন যে বাস্তব ঘটনা, যান্ত্রিক পদ্ধতিতে খুঁটিনাটির বর্ণনা প্রভৃতিকে ঘিরে হাস্যরস দানা বেঁধে ওঠে। আমাদের বিশ্লেষণে যদি ভুল না থাকে তবে স্বীকার করতে হবে যে এগুলো কৌতুকহাস্যের গৌণ বা আকস্মিক অনুষঙ্গ তো নয়ই, বরং এগুলোকে ভিত্তি করেই কৌতুকহাস্য জন্ম নেয়। আসলে হাস্যকৌতুকের স্রষ্টা মূলত একজন নীতিনিষ্ঠ ব্যক্তি যিনি বিজ্ঞানীর ছদ্মবেশে, কখনও বা শরীরবিশেষজ্ঞ (anatomist) হিসেবে মানুষের চরিত্র ও সমাজব্যবস্থার ব্যবচ্ছেদ করেন এবং তাঁর এই ক্রিয়া-কাণ্ডের পেছনে একমাত্র উদ্দেশ্য মনুষ্যসমাজ সম্বন্ধে আমাদের বীতশ্রদ্ধ করে তোলা। ফলে, যে সীমিত অর্থে হাস্যকৌতুক বা humeur শব্দটি আমরা এখানে ব্যবহার করছি আসলে তা কোন নৈতিক সমস্যার বিজ্ঞানধর্মী বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনা।

এই পক্ষান্তরীকরণ বা transposition পদ্ধতি দুটি ব্যাপারের মধ্যে যে ব্যবধান তাকে আরও কমিয়ে এনে অনেক বিশেষ ধরনের (specialisé) কৌতুককর বিনিময় পদ্ধতির (types de transposition) উদ্ভাবনা করতে পারে।

যেমন, আমরা জানি যে কতকগুলি বৃত্তির বিশেষ কিছু পরিভাষা আছে। সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের ধ্যানধারণাকে ঐ সব বৃত্তির সঙ্গে

মিশিয়ে কি প্রচণ্ড কৌতুকহাস্যের সৃষ্টি করা যায় তা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। দেখা গেছে যে ব্যবসায়সংক্রান্ত পরিভাষাকে যখন আমাদের সামাজিক ব্যাপারে প্রয়োগ করা হয় তা আমাদের কাছে খুবই কৌতুকপ্রদ মনে হয়। যেমন লাবিশের কোন নাটকের কোন চরিত্র একটা নিমন্ত্রণ পত্র পেয়ে তার উত্তর দেয়, 'আপনার গত তিন তারিখের দাক্ষিণ্যপূর্ণ পত্রের উত্তরে"— অর্থাৎ তিনি তাঁর বৃত্তিগত অভ্যাসমত ব্যবসায় বাণিজ্য সংক্রান্ত চিঠিপত্র লেখার ভঙ্গীতে একটা সামাজিক অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণপত্রের জবাব দিচ্ছেন। যখন এই ধরনের চিঠিতে লেখকের পেশার ইঙ্গিত পাওয়া ছাড়াও তার চরিত্রের কোন ত্রুটি প্রকট হয়ে ওঠে তখন হাস্যরসে একটা বিশেষ তাৎপর্য প্রকাশ পায়। এই প্রসঙ্গে Faux Bonhommes আর Famille Benoiton নাটক দুটির উল্লেখ করা যেতে পারে। দুটি নাটকেই বিয়ে জিনিষটাকে একটা ব্যবসা মনে করে আবেগ ও অনুভূতির ব্যাপারগুলোকে একেবারে আবেগশূন্য আর্থনীতিক এবং ব্যবসায় সংক্রান্ত ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে।

আমাদের আলোচনা এখন এমন একটা স্তরে পৌঁছেছে যেখানে ভাষার অভিনবত্ব কিভাবে চরিত্রের অস্বাভাবিকতার সূচক হয়ে ওঠে তা আমরা বুঝতে পারছি। পরের অধ্যায়ে এই ব্যাপারটাকেই আমরা আরও একটু খুঁটিয়ে দেখব। সুতরাং, যে আশা নিয়ে আমরা এই আলোচনা শুরু করেছিলাম এবং এতক্ষণ বিশ্লেষণের পর যা দেখা গেল তা হোল এই তত্ত্ব যে ভাষাজনিত কৌতুকহাস্য আর পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত কৌতুকাস্য খুব ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট, এবং শেষ পর্যন্ত এই দু'রকমের কৌতুকহাস্যই চরিত্রের ত্রুটি থেকে উদ্ভূত কৌতুকহাস্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। ভাষা যে কৌতুকের উৎস হয়ে ওঠে তার একমাত্র কারণ তা মানুষের তৈরি, মানুষের সঙ্গে অত্যন্ত নিকট সম্বন্ধে জড়িত, আর যতটা সম্ভব অবিকল মানুষের মনের আদলে গড়া। আমরা অনুক্ষণ অনুভব করি কি ভাবে ভাষার মধ্যে আমাদের অস্তিত্বের অনেকগুলো জীবন্ত আর মৌল উপাদান বর্তমান। যদি ভাষার সত্তা স্বয়ংসম্পূর্ণ আর ত্রুটিহীন হোত, যদি তাতে গতানুগতিক কিছু না

থাকত—এক কথায়, ভাষা যদি সম্পূর্ণভাবে এমন একটা সুসংবদ্ধ আর স্বতন্ত্র জিনিষ হোত যাকে ক্ষুদ্রতর স্বয়ংসম্পূর্ণ অন্য কোন রূপে ভাগ করা যায় না তাহলে সমাহিত আর সুসমন্বিত আত্মার মত ভাষাও কৌতুকহাস্যের স্পর্শ এড়িয়ে চলতে পারত—ঠিক যেমন পূর্ণ ও শান্ত জলাধারের ওপর বাতাস কোন রকমের চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে পারে না। কিন্তু আসলে এমন কোন জলাধার নেই যার বুকের ওপর একটা না একটা শুকনো পাতা ঝরে না পড়ে, তেমনি এমন কোন মানুষ নেই যার চরিত্রে অন্ততঃ একটা অনমনীয় দৃঢ়মূল অভ্যাস তাতে এক ধরনের জাড্যের সৃষ্টি করে তার সাবলীলতা নষ্ট না করে। বস্তুতঃ এমন কোন ভাষা নেই যা সব দিক থেকেই জীবনীশক্তির প্রকাশে চলমনে, যা সব সময়েই অভিস্পন্দ ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ, যা গতানুগতিক অভিব্যক্তি আর শব্দের চিন্তাহীন ব্যবহারকে সব দিক থেকে এড়িয়ে চলতে পারে, যা অবস্থার বিনিময়, বৈপরীত্য, পুনরাবৃত্তি ইত্যাদি যান্ত্রিক প্রক্রিয়াগুলিকে একেবারে বর্জন করতে পারে। প্রাণহীন কোন বস্তুর ওপর এইসব প্রক্রিয়াকে আমরা যেমন প্রয়োগ করতে পারি, ভাষার ব্যবহারেও এইসব পদ্ধতি প্রয়োগ করে আমরা পরীক্ষা করতে পারি। একদিকে প্রয়োজন অনুসারে নমনীয়, অনুক্ষণ পরিবর্তনক্ষম এবং জীবন্ত সাবলীলতা, অন্যদিকে অনড় আর একেবারে পরিবর্তনবিরোধী যান্ত্রিকতা ; একদিকে অন্যমনস্কতা, অন্য-দিকে অতন্দ্র সতর্কতা—এক কথায়, একদিকে মুক্ত আর সলীল সক্রিয়তা, অন্য দিকে যন্ত্রসদৃশ বৈচিত্র্যহীন স্বয়ংক্রিয়তা—কৌতুকহাস্য দ্বিতীয়শ্রেণীর ত্রুটিগুলোকে শোধরাবার চেষ্টা করে। কৌতুকহাস্যের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এই বিশেষ ব্যাপারটাকেই মনে রাখবার জন্য পাঠকদের কাছে আবেদন জানিয়েছিলাম। আমাদের আলোচনাপথের বিভিন্ন মোড়ে (les tournants décisifs) এই সত্যের আলোককেই আমরা উজ্জ্বল হতে দেখেছি। এই আলোকের সাহায্য নিয়েই আমরা এবার আরও গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধানে প্রয়াসী হবো, এবং আশা করব এই অনুসন্ধান আমাদের কাছে আরও বেশি শিক্ষাপ্রদ হবে। এবার আমরা কৌতুকপ্রদ চরিত্রের বিশ্লেষণ করব—অন্য-ভাবে বলতে গেলে, সূক্ষ্ম বিচারের সাহায্যে দেখব কোন্ কোন্ অপরিহার্য

বৈশিষ্ট্য থাকলে কোন চরিত্রকে হাস্যকর বলে মনে করা যায়। সেই সঙ্গে এই অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের সাহায্যে শিল্পের যথার্থ রূপ, এবং শিল্প ও জীবনের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আরও পরিচ্ছন্ন উপলব্ধি লাভ করাও হবে আমাদের অন্য এক লক্ষ্য।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চরিত্রোদ্ভূত কৌতুকহাস্য

। এক ।

কৌতুকহাস্যকে তার সর্পিল গতিপথে অনুসরণ করে আমরা বোঝবার চেষ্টা করেছি কিভাবে তা একটা বিশেষ রূপ ধারণ করে, একটা বিশেষ মানসিকতায় প্রকট হয় এবং কি ধরনের হাবভাব ও চালচলনের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। কৌতুকহাস্য কখনও রূপ পায় কোন একটা বিশেষ পরিস্থিতি ও ঘটনায়, কখনও আবার কোন ভাষাগত বা বাচনগত অভিনবত্বের মধ্যে। কোন কৌতুকপ্রদ চরিত্রের বিশ্লেষণ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বর্তমান বিশ্লেষণের সবচেয়ে মূল্যবান্ আর তাৎপর্যপূর্ণ স্তরে পৌঁছেছি। আমরা যদি সহজে লক্ষণীয় এবং সুস্পষ্ট দৃষ্টান্তের ভিত্তিতে কৌতুকহাস্যের লক্ষণ বা সংজ্ঞা নির্দ্ধারণের প্রলোভনে পড়ে যেতাম তাহলে আমাদের কাজ আরও কঠিন হয়ে উঠত। কারণ, সে অবস্থায় যত উচ্চস্তরের কৌতুকহাস্যের দৃষ্টান্তের দিকে আমরা এগোতাম ততই আমরা লক্ষ করতাম আমাদের সংজ্ঞার মধ্যে যে বড় বড় ফাঁক রয়েছে তার মধ্য দিয়ে প্রকৃত কৌতুকহাস্যের অনেক দৃষ্টান্ত বেরিয়ে যাচ্ছে। তাই আমরা ঠিক বিপরীত পদ্ধতি অনুসরণ করেছি। হাস্য-কৌতুকের সামাজিক অর্থ ও তাৎপর্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে, এবং এই বিশ্বাস নিয়ে যে কোন হাস্যকর ঘটনা, উক্তি বা চরিত্র সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সঙ্গতি রক্ষার অক্ষমতাকে উদ্ঘাটন করে, এবং মানুষকে বাদ দিয়ে কোন হাস্যকর ব্যাপারের অস্তিত্বই থাকতে পারে না। আমরা এ-পর্যন্ত মানুষ ও তার চরিত্রকে আমাদের আলোচনার মূল বিষয় হিসেবে ব্যবহার করেছি। কিন্তু মানুষের সঙ্গে সম্পর্কহীন ঘটনা ও পরিস্থিতিও কিভাবে কখনও কখনও হাসির উৎস হয়ে ওঠে তার ব্যাখ্যা করাই সবচেয়ে দুরূহ সমস্যা বলে প্রতিভাত হয়েছে। কোন সূক্ষ্ম শক্তি কোন মনুষ্যচরিত্রের উপস্থিতি ছাড়াই কোন পরিস্থিতিকে

কিংবা কোন নৈর্ব্যক্তিক উক্তিকে অর্থগর্ভ, সুসমঞ্জস এবং সুবিন্যস্ত করে তার মধ্যে কৌতুকোদ্দীপক গুণ অনুপ্রবিষ্ট করে তা আমাদের কাছে রহস্যময় বলে মনে হয়েছে। এখন পর্যন্ত আমরা এইসব ব্যাপারই আলোচনা করেছি। আমরা আলোচনা শুরু করেছিলাম নিখাদ ধাতু নিয়ে, আমাদের সমস্ত প্রয়াসকে লাগানো হয়েছে সেই খনিজ আকরের অন্বেষণে যার থেকে এই ধাতুর উৎপত্তি। এইবার আমরা সেই ধাতুর স্বকীয় চরিত্রের অনুশীলনে মন দেব। এর চেয়ে সহজ কাজ আর নেই, কারণ একটি সরল ও মৌলিক উপাদান এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় হবে। খুব কাছ থেকে পরীক্ষা করে দেখা যাক্ কিভাবে এই উপাদানটি সংশ্লিষ্ট অন্য সব জিনিষকে প্রভাবিত করে।

আমরা বলেছি, এমন কতকগুলি মানসিক অবস্থা আছে যেগুলি উপলব্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা অভিভূত হই। যেমন কারুর সুখ ও দুঃখের অনুভূতি হলে আমরা তাকে অভিনন্দন ও সহানুভূতি জানাই, কু-প্রবৃত্তি ও নানা পাপবাসনা আমাদের মনে বেদনাবিমিশ্রিত ঘৃণা, ত্রাস বা অন্য কোন উপযুক্ত অনুভূতি জাগায়। এক কথায়, কোন শক্তিশালী অনুভূতি এক থেকে বহুর মধ্যে স্পন্দন জাগায়। এ-সবই জীবনের মৌল ব্যাপার। এগুলো সবই খুব গুরুত্বপূর্ণ আর গম্ভীর ব্যাপার। কখনও কখনও আবার বিয়োগান্ত আর শোচনীয়। কিন্তু যখনই আমাদের প্রতিবেশী বা সতীর্থ কেউ আমাদের মনে অনুভূতি জাগাতে ব্যর্থ হন তখনই শুরু হয় কৌতুকহাস্যের অভিযান। অর্থাৎ যে সব জিনিষকে সমাজজীবনের প্রতি নির্মম এবং উদাসীন বলা যায় সেগুলি দিয়েই কৌতুকহাস্যের সূত্রপাত। যখন কেউ সমাজের অন্যান্য মানুষ সম্বন্ধে অনাগ্রহী থেকে নিজ অভিরুচি অনুযায়ী যন্ত্রের মত চলাফেরা করে সে তখন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের পাত্র হয়ে দাঁড়ায়। তাই চারিত্রিক অনবধানতার জন্যে মানুষকে ভর্ৎসনা করে তাকে তার স্বপ্নের জগৎ থেকে বাস্তব সামাজিক ভূমিতে ফিরিয়ে আনাই হোল কৌতুকহাস্যের ভূমিকা। গুরুগম্ভীর ব্যাপারের সঙ্গে তুচ্ছ জিনিষের তুলনা করায় যদি কোন বাধা না থাকে তাহলে এখানে সামরিক শিক্ষালয়ে শিক্ষার জন্য সদ্য ভর্তি হওয়া যুবকের অভিজ্ঞতার দৃষ্টান্ত

তুলে ধরা যেতে পারে। ভর্তির কঠিন অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরেই যুবকটি আবিষ্কার করে যে তাকে আরও এমন অনেক পরীক্ষা দিতে হবে যেগুলো তার চেয়ে উঁচু ক্লাসের ছাত্ররা তাকে তার নতুন শিক্ষাক্ষেত্রের উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্ত পরিকল্পনা করেছে—যাতে তার অর্বাচীনত্ব কেটে গিয়ে সে শক্ত হয়ে ওঠে। বৃহত্তর সমাজের মধ্যে যখন একটা ক্ষুদ্রতর বিশেষ গোষ্ঠী তৈরি করা হয়, তখন সেই গোষ্ঠী বিধিমতে না হলেও সহজ কতকগুলি প্রবৃত্তির সাহায্যে এমন কিছু নিয়ম আর উপায় উদ্ভাবন করে যার দ্বারা অন্ত জায়গায় তৈরি কতকগুলো গতানুগতিক অভ্যাসকে ভেঙে দিয়ে অন্ততঃ আংশিকভাবে সেগুলোর পরিবর্তন আর সংশোধন সম্ভবপর হয়। যাকে আমরা বলি সমাজ তাও ঠিক এই পদ্ধতিতেই নিয়ন্ত্রিত হয়। সমাজের প্রত্যেকটি সভ্যকে পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা সম্বন্ধে অতন্দ্র সচেতনতা দেখাতে হয়, নিজেকে পরিবেশ অনুসারে গড়ে তুলতে হয়। এক কথায়, সমাজের বাইরে একান্তে নিজের তৈরি স্বপ্নালয় থেকে বেরিয়ে অন্ত সকলের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রত্যেক সামাজিক মানুষকে চলতে হয়। তাই প্রত্যেক সদস্যের ওপর সমাজ তার অনুশাসনের তর্জনী উঁচিয়ে না রাখলেও প্রয়োজন হলে সময়ে সময়ে তাকে ধিক্কার দেবার যে অধিকারটি বজায় রেখেছে তা খুব মারাত্মক না হলেও তাকে ভয় না করে পারা যায় না। তাই কৌতুকহাস্তের দায়িত্ব খানিকটা এই ধরনের হতেই হবে। যার উদ্দেশ্তে কৌতুকহাস্তের শর নিক্ষিপ্ত হয় তার কাছে সেটা নিশ্চয়ই একটু আঘাতজনক। তাই মূলতঃ কৌতুকহাস্ত সমাজনিয়ন্ত্রিত এবং সমাজের দ্বারা অনুমোদিত এক ধরনের 'ragging' (brimade social) বলা যায়।

এই কারণেই কৌতুকহাস্ত ব্যাপারটা দ্বিমুখী—তাকে নিছক শিক্ষামূলক, কিংবা নির্ভেজাল জীবননিষ্ঠ বাস্তবতা বলে ধরা যাবে না। কারণ, একদিকে বাস্তবজীবনে মানুষের ক্রিয়াকলাপ দেখে আমাদের হাসির উদ্রেক হবে না বা আমরা কৌতুকবোধ করব না যদি থিয়েটারের আসনে বসে যে পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার বলে মঞ্চের ওপরের চরিত্রগুলোর কাণ্ডকারখানা দেখে আমরা হাসি সেই ক্ষমতা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার শক্তি আমাদের না

থাকে। নাটকের চরিত্রগুলি আমাদের কাছে হাস্যকর হয় তার কারণ তারা আমাদের সামনে এক ধরনের প্রহসন সৃষ্টি করে। অন্যপক্ষে, কৌতুকনাটক আমাদের যে উপভোগের সুযোগ দেয় তা অবিমিশ্র আনন্দের নয়। আমরা সেখান থেকে যেটুকু আনন্দ পাই তা যেমন নিখাদ নান্দনিক চরিত্রের নয়, তেমনি তার থেকে পাওয়া দর্শকদের যে উপভোগ তাও একেবারে নিঃস্বার্থ নয়। এই উপভোগের মধ্যে সব সময়ে লুকিয়ে থাকে একটা অনুক্ত ও অবচেতন উদ্দেশ্য; অবশ্য এ উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত ভাবে বিশেষ কারুর পক্ষ থেকে না হলেও, সামগ্রিকভাবে সমাজের পক্ষ থেকে প্রযুক্ত বলা যায়। হাস্যকৌতুকের মধ্যে সব সময়ে কারুর আত্মাভিমানে আঘাত করার প্রচ্ছন্ন বাসনার অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়; যদিও সেই আঘাতের পেছনে যে প্রয়াস থাকে তা আমাদের প্রতিবেশী মানুষের মনকে না হলেও তার কাজ ও ব্যবহারকে সংশোধন করার বাসনার দ্বারা সক্রিয় হওয়ার কারণেই বোধ করি সাধারণ নাটকের চেয়ে কৌতুকহাস্যসমৃদ্ধ নাটক অনেক বেশি জীবনমুখী। নাটক যত মহত্বপূর্ণ আর উচ্চচিন্তার বাহক হবে, জীবনের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা আর ঘটনা থেকে নেওয়া উপাদান থেকে নিছক বিয়োগান্ত বা ট্রাজিক সত্য বের করার জন্য নাট্যকারকে তত বেশি গভীর বিশ্লেষণের সাহায্যে নিতে হবে। অপর দিকে, কমেডির প্রহসন বা ভাঁড়ামো (Vaudeville et la farce) জাতীয় অপেক্ষাকৃত লঘু সংস্করণে জীবন ও নাটকের মধ্যে একটা বৈষম্য বা ব্যবধান লক্ষ করা যায়। কমেডিও যত উচ্চস্তরের হয় জীবনের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা বা নৈকট্য তত বাড়ে। সত্যিই, আমাদের বাস্তবজীবনের অনেক ঘটনা উচ্চমার্গের কৌতুকনাটকের এত কাছে যে বহু ক্ষেত্রে সেই ঘটনাগুলির কোন ভাষাগত পরিবর্তন না করেও তাদের নাট্যরূপে মঞ্চস্থ করা যায়। এই সব ব্যাপার দেখে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে বাস্তবজীবনের হাস্যকর চরিত্র এবং প্রহসনজাতীয় নাটকের কৌতুকজনক চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি এক এবং অভিন্ন। এই বৈশিষ্ট্যগুলি কি তা অনুমান করা দুরূহ ব্যাপার হবে না।

প্রায়ই শোনা যায় যে আমাদের মানুষভাইদের চরিত্রের হালকা ধরনের

ত্রুটিগুলো আমাদের কৌতুকের কারণ হয়। এই মতের মধ্যে যে বড় সত্য নিহিত আছে তা স্বীকার করতে হয়; তবুও কথাটাকে একেবারে নিখাদ সত্য বলে মেনে নেওয়া যায় না। প্রথমতঃ, চারিত্রিক দোষের ব্যাপারে গুরু ও লঘু এই দুইয়ের মধ্যে সীমারেখা টানা বেশ কঠিন। চরিত্রের একটা দোষ শুধু লঘু বলেই আমাদের হাসির কারণ নাও হতে পারে। বরঞ্চ, যেহেতু ঐ দোষটি আমাদের হাসায় সেই কারণেই তাকে আমরা 'লঘু' বলে মনে করি। তার কারণ হাসি ছাড়া আর কোন জিনিস আমাদের ক্রোধ বা বিরাগকে উপশম করার ক্ষমতা রাখে না। কিন্তু আমরা আরও একটু এগোতে পারি; বলতে পারি যে অনেক দোষকে গর্হিত জেনেও সেগুলির প্রকাশ দেখে আমরা হাসি। যেমন আরপাগোঁর (Harpagon) অর্থলালসা। এরপর কিছুটা খুঁতখুঁত করেও আমরা স্বীকার না করে পারি না যে আমাদের প্রতিবেশী মানুষদের চারিত্রিক দোষ দেখেই আমরা শুধু হাসি না, কখনও কখনও তাদের গুণপনা আর মহত্বও আমাদের কৌতুকের কারণ হয়। আমরা আলসেস্তিস (Alcestice)-কে দেখেও হাসি। অনেকে বলতে পারেন, আমাদের কৌতুকবোধ করার কারণ আলসেস্ত্-এর আন্তরিকতা বা হৃদয়বত্তা নয়, বরঞ্চ তার ঐ আন্তরিকতা যে বিশেষ রূপে প্রকাশ পায় তাই আমাদের কৌতুকবোধকে জাগিয়ে তোলে। তার চরিত্রের যে খেয়ালিপনা তার সততাকে বিদঘুটে ঢং-এ আমাদের কাছে স্পষ্ট করে তোলে তারই রূপ আমাদের কাছে হাস্যকর ঠেকে। এ ব্যাপারে আমাদের দ্বিমত নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও মিথ্যে নয় যে আলসেস্ত-এর চরিত্রের যে খেয়ালি-পনা আমাদের হাসির কারণ হয় তা তার আন্তরিকতা আর সততাকেও হাসির ব্যাপার করে তোলে। এইটেই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য জিনিস। অতএব আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে সব হাসির ব্যাপারই মানুষের চারিত্রিক বা নৈতিক ত্রুটি থেকে উদ্ভূত হয় না, এবং সমালোচকরা যদি সেখানে ত্রুটির ব্যাপারকেই বেশি গুরুত্ব দিতে চান এবং তাঁদের মতে সেই ত্রুটি যদি লঘু চরিত্রের হয় তবে তাঁরা সেই সঙ্গে আমাদের বলে দেবেন 'লঘু' ও 'গর্হিত' এই দুই ধরনের ত্রুটি নির্ণয়ের পদ্ধতি কি হবে।

কিন্তু আসলে অনেক সময় নৈতিক দিক থেকে ত্রুটিশূন্য চরিত্রও আমাদের কাছে হাস্যাস্পদ বলে মনে হয়। হাস্যকরতা থেকে মুক্ত হতে হলে চরিত্রকে শুধু সামাজিক রীতি-নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলতে হবে। আলসেস্ত্ একজন খাঁটি মানুষ। কিন্তু তিনি অসামাজিক, এবং এই কারণেই তিনি হাসির পাত্র। অবস্থানুযায়ী নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় এমন কোন দোষের চেয়ে কোন অনমনীয় গুণও অনেক বেশি কৌতুককর। অন্তপক্ষে, যদিও আলসেস্ত্-এর অনমনীয় আন্তরিকতা আমাদের কাছে হাস্যকর মনে হয়, বস্তুতঃ সেই অনমনীয়তা তার চরিত্রের নির্ভেজাল সততারই পরিচয় দেয়। যে লোক ব্যক্তিগত বিশ্বাস আর ধারণার খোলসের মধ্যে আবৃত থেকে সমাজ থেকে আলাদা থাকতে চায় সে সাধারণ মানুষের কাছে হাস্যকর হয়ে উঠবেই, কারণ কৌতুক ব্যাপারটিই মূলতঃ সমষ্টি থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেবার প্রবণতাকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। এই জন্যই প্রহসনজাতীয় রচনা প্রায়ই মানুষের আচরণ অথবা ধারণাকে ভিত্তি করে লেখা হয়, কিংবা আরও একটু স্পষ্ট করে বলা যায়, বিশেষ কোন সমাজের কতকগুলি অযৌক্তিক সংস্কার আর রীতি প্রহসনের উৎস।

কিন্তু স্বীকার করতে হবে যে মনুষ্যসমাজের একটা গৌরব যে সেখানে সামাজিক ও নৈতিক আদর্শের মধ্যে কোন মৌলিক ভেদ বা ব্যবধান নেই। তাই সাধারণ নিয়ম হিসেবে আমরা ধরে নিতে পারি যে অপরের দোষ-ত্রুটি দেখেই আমরা হাসি ; কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও বলে নেওয়া দরকার যে তাদের দুর্নীতির চেয়ে তাদের অসামাজিকতাই আমাদের কৌতুকের কারণ হয়। তা হলে প্রশ্ন ওঠে, ঠিক কোন্ চারিত্রিক ত্রুটিগুলো আমাদের কৌতুকবোধ জাগাতে পারে এবং ঠিক কোন্ পরিস্থিতিগুলোতে সেই ত্রুটিগুলো এমন গুরুতর রূপ নেয় যেখানে সেগুলোকে আর কৌতুককর বা লঘু বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না ?

কিন্তু একেবারে স্পষ্টভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে আমাদের আলোচনার মধ্যেই যে এই প্রশ্ন দুটির উত্তর নিহিত আছে, একথা দাবী করা যায়। আমরা বলেছি যে হাস্যকর ব্যাপারের আবেদন বিশুদ্ধ মেধা বা

যুক্তিবুদ্ধির কাছে। বলেছি যে আবেগ ও অনুভূতির সঙ্গে কৌতুকহাস্তের সহাবস্থান অসম্ভব। যতদূর সম্ভব হাল্কা চরিত্রের যে কোন ত্রুটি যদি এমন ভাবে তুলে ধরা হয় যাতে আমাদের ভয়, সমবেদনা বা করুণা জাগতে পারে, দেখা যাবে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে কৌতুকহাস্তের বিনাশ ঘটবে। আমাদের পক্ষে হাসা অসম্ভব হয়ে পড়বে। অন্তপক্ষে, সাধারণত ধিক্কৃত এবং গর্হিত বলে নিন্দিত কোন পাপকে যদি আবেগমুক্ত রূপে মঞ্চে উপস্থাপিত করা হয়, দেখা যাবে তার দ্বারা আমাদের কৌতুকবোধ উদ্দীপিত হবেই। তার অর্থ এই নয় যে পাপ বা দুর্নীতি জিনিষটাই হালকা কৌতুকের উপাদান হয়ে দাঁড়াল; শুধু সেই মুহূর্তে নাট্যকারের উপস্থাপনা পদ্ধতির গুণে ব্যাপারটা দর্শকদের মনে কৌতুকবোধ জাগিয়ে তুললো। কৌতুকবোধ জাগাতে হলে পাপ, কুপ্রবৃত্তি, চারিত্রিক ত্রুটি প্রভৃতির সাহায্যে আমাদের আবেগ-প্রবণতাকে সক্রিয় করে তোলা চলবে না। এটা একটা অবশ্য পালনীয় শর্ত, যদিও কৌতুকহাস্য সৃষ্টির জন্য এইটিই একমাত্র শর্ত নয়।

কিন্তু কৌতুকহাস্তের শিল্পী ঠিক কি করে আমাদের আবেগ-অনুভূতির উদ্রেককে ব্যাহত করবেন? প্রশ্নটা সত্যিই একটু জটিল। ব্যাপারটাকে তলিয়ে দেখতে হলে একটু নতুন ধরনের অনুসন্ধানে নামতে হবে। যে কৃত্রিম সমবেদনা নিয়ে আমরা নাটক দেখি তাকে বিশ্লেষণ করতে হবে এবং দেখতে হবে কি রকম পরিস্থিতিতে আমরা নাটকের কাল্পনিক দুঃখ বা আনন্দে অংশ নিই, আবার কোন্ পরিস্থিতিতে আমরা সেগুলিকে এড়িয়ে চলি। আমাদের আবেগ-অনুভূতিকে নিষ্ক্রিয় করে তাদের জন্য অন্য স্বপ্নের জগৎ সৃষ্টি করার বিশেষ কৌশল ও শিল্প আছে—ঠিক যে-ধরনের কৌশল কোন সম্মোহিত ব্যক্তির (sujet magnetisé) ওপর প্রয়োগ করা হয়। অনুরূপ কোন কৌশলের সাহায্যে আমাদের মানবিক বৃত্তি ও প্রতিক্রিয়াগুলো —করুণা, সহানুভূতি, বিপদবোধ ইত্যাদি—জাগবার আগেই তাদের উদ্ভব রোধ করে দেওয়া যায়। ফলে, পরিস্থিতি খুব শোচনীয় হলেও তার গুরুত্ব উপলব্ধি করার মানসিকতা দর্শকদের থাকে না। আমার ধারণা এই কৌশল বা কলা দুটি বিশেষ পদ্ধতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, এবং কৌতুকহাস্তের স্রষ্টা

কিছুটা নিজের অজ্ঞাতেই এই পদ্ধতি দুটি ব্যবহার করে থাকেন। প্রথম কৌশল হোল মঞ্চের ওপর নিয়ে আসা চরিত্রে ঐ অনুভূতিটিকে পরগাছার মত আলাদা একটা সত্তা দেওয়া। সাধারণত যে কোন তীব্র অনুভূতি আমাদের আর সব মানসিক অবস্থাকে ক্রমশঃ আচ্ছন্ন করে ফেলে, তাদের ওপর নিজের রঙ চাপিয়ে দেয়। যদি আমরা জোরালো কোন বিশেষ আবেগের দ্বারা অন্য সব প্রতিক্রিয়াকে আচ্ছন্ন হতে দেখি, আমাদের মনও ঐ আবেগটির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে। অপর একটি চিত্রকল্প ব্যবহার করে বলা যায়, যখন কোন বিশেষ আবেগের নানা অভিব্যক্তির মধ্যে একই সুর ধ্বনিত হয় তখন তা নাটকীয়, সংবেদনসমৃদ্ধ আর সংক্রামক হয়ে ওঠে। তাই যথার্থ অভিনেতা যখন তাঁর সমগ্র সত্তা দিয়ে একটা অনুভূতিকে উপলব্ধি ও প্রকাশ করেন, দর্শকও নিজের মধ্যে তার অনুরণন পান। বিপরীতপক্ষে, যে অনুভূতি বা আবেগ আমাদের মধ্যে সাড়া জাগায় না এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই হাস্যকর বলে মনে হয়, যার মধ্যে সব সময় একটা যান্ত্রিকতা আর অনমনীয়তার প্রভাব উপলব্ধি করা যায় তা আমাদের মনে সর্বাত্মক কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। সময়মত এই অনমনীয়তা চরিত্রের নিষ্প্রাণ পুতুলসদৃশ চলাফেরায় মূর্ত হয়ে ওঠে এবং দর্শকদের কৌতুকবোধকে জাগিয়ে তোলে। কিন্তু এই ব্যাপার ঘটার আগেই দর্শকদের অনুভূতি ও সংবেদনশীলতার সঙ্গে তার বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হয়ে যায়। আসলে যে সত্তার নিজের মধ্যেই কোন একাত্মতা বা পারম্পর্য নেই (qui n'est pas à unisson d'elle-même) তার সঙ্গে দর্শকমনের একাত্মতা প্রতিষ্ঠিত হ'বে কি করে? মোলিয়েরের 'কৃপণ, (*l'Avare*) কৌতুকনাটকের একটি দৃশ্য প্রায় ট্রাজেডির কাছাকাছি চলে যায়। দৃশ্যটিতে পরস্পরের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়হীন এক দেনদার আর পাওনাদার একদিন হঠাৎ মুখোমুখি হয়ে যায় আর দেখে যে আসলে তারা বাবা ও ছেলে। এখানে একটা গভীর আবেগপূর্ণ নাটকীয় পরিস্থিতি তৈরি হতে পারত, যদি আরপাগোঁর (Harpagon) মনে অর্থলোভ ও সন্তান বাৎসল্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব একটা নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি করত। কিন্তু দৃশ্যটিতে

দিকে আকৃষ্ট হয় তখনই আমরা কৌতুকহাস্যের জগতে ঢুকে পড়ি। যদি আমরা তারতুফের কথাগুলোই মনে রাখতাম তাহলে তার চরিত্রকে ট্র্যাজিক বা গম্ভীরস্বরের নাটকের উপযুক্ত বলে ভাবতাম। কিন্তু যখন শুধু তার হাবভাব, চালচলন ও আকার ইঙ্গিতের দিকে আমরা নজর দিই সে আমাদের চোখে কৌতুককর চরিত্র হয়ে ওঠে। মনে করার চেষ্টা করুন তারতুফ্ কিভাবে মঞ্চে ঢুকতে ঢুকতে বলে, "Laurent, serrez ma haire avec ma discipline" (লোরাঁ, আমার পশুলোমে তৈরি অনুতাপীর আচ্ছাদন আর আমার ওপর বর্ষিত এত অভিশাপ এক সঙ্গে আলমারিতে রেখে আয়।") তারতুফ্ জানে দোরিন্ (Dorine) আড়ি পেতে তার কথা শুনছে, কিন্তু নিঃসন্দেহে বলা যায় যে দোরিনের অনুপস্থিতিতেও তারতুফ্ ঐ কথাগুলোই বলত। সে এমন কায়মনোবাক্যে এক ভণ্ড চরিত্রের ভূমিকায় নেমেছে যে পরিপূর্ণ আন্তরিকতার সঙ্গে সে ঐ ভূমিকায় অভিনয় করে চলেছে। এই উপায়ে, এবং শুধুমাত্র এই উপায়েই সে কৌতুকচরিত্র হিসেবে সফল হতে পারে। অত্যন্ত স্থূলভাবে যদি সে এই আন্তরিকতা না দেখাতো, যদি একজন প্রকৃত ভণ্ডের মানসিকতা তার না থাকতো, যদি বহুদিনের অভ্যাসের ফলে এক কপট চরিত্রের ভাষা তার স্বাভাবিক বাচন-পদ্ধতি হয়ে না দাঁড়াতো তাহলে চরিত্র হিসেবে তারতুফ্ শুধুই ঘৃণ্য হোত, কারণ সে ক্ষেত্রে আমরা তার আচরণের পেছনে শুধু তার উদ্দেশ্য ও ইচ্ছার কথাই ভাবতাম। তাই আমাদের বুঝতে হবে কেন ক্রিয়াকলাপ (action) প্রকৃত কৌতুক নাটকের পক্ষে অপরিহার্য, অথচ প্রহসনের পক্ষে তা শুধু আনুষঙ্গিক উপাদানগুলির মধ্যে একটি। আমার বিশ্বাস কমেডি বা কৌতুক-নাটকে কোন চরিত্রকে প্রথমবার দর্শকদের সামনে হাজির করার জন্য আরও অনেক উপায় আছে, যেগুলির মধ্যে যে-কোন একটি ব্যবহার করা যেত। পরিস্থিতি আলাদা হলেও চরিত্রটি সে ক্ষেত্রেও একই মানসিকতার পরিচয় দিত। কিন্তু গম্ভীর (serieux) নাটক সম্বন্ধে আমাদের উপলব্ধি অন্যরকম। সেখানে চরিত্র আর পরিস্থিতি একটা অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে বাঁধা, কিংবা বলা যায় সেখানে ঘটনাবলী আর চরিত্র পরস্পরের পরিপূরক। তাই যে-কোন

নাটক যদি আমাদের কাছে অন্য কোন কাহিনী সমেত উপস্থাপিত হয় তার শিরোনামা এক হলেও, নাটক ও নায়কের স্বরূপ হবে একেবারে স্বতন্ত্র।

তাই কৌতুকনাটকের কোন চরিত্র ভালো না মন্দ এ প্রশ্নটা বড় নয়, লক্ষণীয় ব্যাপার হোল চরিত্রটি যদি অসামাজিক হয় তাহলেই তার মধ্যে কৌতুকপ্রদ হবার উপাদান থাকবে। এখন বোঝা যাচ্ছে যে কোন ঘটনা বা পরিস্থিতির গুরুত্ব বা গাম্ভীর্য কৌতুকনাটকের পক্ষে অপরিহার্য নয়; লঘু বা গুরু যে জাতেরই হোক্ পরিস্থিতিকে যদি আমাদের আবেগ বা অনুভূতি জাগাতে না দেওয়া হয় তা হলেই তা আমাদের কৌতুকবোধকে জাগাবার ক্ষমতা রাখে। একদিকে অভিনীত চরিত্রের অসামাজিকতা, অন্যপক্ষে দর্শকমনের আবেগহীনতা—এই দুটির পারম্পর্য হোল কৌতুকসৃষ্টির অপরিহার্য শর্ত। এই দুটির মধ্যে তৃতীয় আর একটি শর্ত নিহিত আছে। যেটির অন্বেষণে এতক্ষণ বিশ্লেষণের চেষ্টা হয়েছে।

কৌতুকহাস্যের এই তৃতীয় শর্তটি হোল চরিত্রের যন্ত্রসদৃশ স্বয়ংক্রিয়তা (l'automatisme)। আমাদেব এই অনুসন্ধানের শুরু থেকেই এই ধর্মটির দিকে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা চলেছে। যে জিনিসটা মানুষ বুদ্ধিবিবেচনাহীন জড়যন্ত্রের মতো করে চলে তার চেয়ে হাস্যকর জিনিস আর হতে পারে না। মানুষের দোষের মধ্যে, এমন কি তার সদ্‌গুণের মধ্যেও, সেই ব্যাপারটিই হাস্যকর যেটি তার নিজের অজ্ঞাতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তার কাজকর্ম ও হাবভাবে প্রকাশিত হয়ে তার চরিত্রের কোন দৃঢ়মূল বৈশিষ্ট্যকে রূপ দেয়—যেমন কোন অনিচ্ছাকৃত অঙ্গভঙ্গী বা মুদ্রাদোষ, কিংবা অবচেতন মানস থেকে বেরিয়ে আসা কোন উক্তি। অন্যমনস্কতা প্রায়শই হাস্যকর। একথাও বলা চলে যে এই অন্যমনস্কতা যত গভীর হয়, তা তত বেশি মাত্রায় কৌতুকোদ্দীপক হয়ে দাঁড়ায়। যখন এই অন্যমনস্কতা ক্রমান্বয়ে এবং নিয়মিত প্রকাশ পায় তখন তার চেয়ে হাস্যকর ব্যাপার আর দেখা যায় না—যেমন ডন কিহোটের (Don Quixote) অন্যমনস্কতা এবং বাস্তবজীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন মানসিকতা। ডন কিহোটের চরিত্রে নিখাদ হাস্য-

রসকে যেন তার উৎস থেকে টেনে বের করে আনা হয়েছে। অন্য যে-কোন কৌতুকপ্রদ চরিত্রের কথা ভাবুন; যত সতর্কতার সঙ্গে আর সচেতনভাবেই সে কাজ করুক বা কথা বলুক, সে হাস্যকর হয়ে উঠবেই, যখন নিজের চরিত্রের কোন একটা দিক তার কাছে অজানা থাকবে, কিন্তু তার কথায় ও কাজে তার অজান্তেই সেই দিক্‌টা প্রকট হয়ে পড়বে। শুধু এই বৈশিষ্ট্যটি নিয়েই চরিত্রটি আমাদের কাছে হাসির হয়ে পড়বে। যে ধরনের কথাবার্তার মাধ্যমে চরিত্রের কোন দোষ একেবারে নগ্ন হয়ে প্রকাশ হয়ে পড়ে তাই হোল সবচেয়ে গভীর হাস্যরসের দ্যোতক। নিজের ঐ দোষটি সম্বন্ধে সজাগ থাকলে চরিত্রটি কি এইভাবে ধরা দেয়? অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কৌতুককর কোন চরিত্র অপরের যে সব আচরণের নিন্দা আর সমালোচনা করছে, কিছুক্ষণ পরে নিজেই কাজকর্মে সেই স্বনিন্দিত আচরণের পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছে। যেমন মঃ জুর্দ্যাঁর[৩৯] (*M. Jourdain*) দর্শনশাস্ত্রের শিক্ষক ক্রোধরিপুর বিরুদ্ধে একটা সুদীর্ঘ উপদেশ দেবার অব্যবহিত পরেই নিজেই রেগে আগুন হন। আবার কাব্যপ্রেমিকদের লক্ষ করে অজস্র বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করার পরেই ভাদিউস[৪০] (Vadius) নিজের পকেট থেকে একটা কবিতা বের করেন। চরিত্রগুলির কাজ ও কথার মধ্যে এই গরমিল দেখানোর পেছনে নিজের সম্বন্ধে তাদের অজ্ঞতা ও অনবধানতাকে প্রকট করা ছাড়া আর কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে? এসব ক্ষেত্রে চরিত্রটির নিজের সম্বন্ধে অজ্ঞতা আর তারই ফলে অন্যদের সম্বন্ধেও একই ধরনের সচেতনতার অভাব আমাদের কাছে খুব পরিষ্কার হয়ে পড়ে। ব্যাপারটিকে আরও একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে আমরা যাকে অসামাজিকতা বলি এ-ধরনের অন্যমনস্কতা তারই প্রকারভেদ মাত্র। মানুষের চরিত্রের যান্ত্রিকতার মূল কারণ চারপাশের জগৎকে লক্ষ্য না করা এবং তাতে আগ্রহবোধ না করা। নিজের চরিত্র সম্বন্ধে ঔদাসীন্য ও অনবধানতাও এর পেছনে কাজ করে। কারণ প্রশ্ন হোল, মানুষ নিজেকে কোন্ আদর্শ অনুযায়ী এবং কেমন করে তৈরি করবে যদি সে নিজের আর তার প্রতিবেশীদের চরিত্র অনুশীলনে যত্ন না নেয়, আগ্রহবোধ না করে?

অনমনীয়তা, যান্ত্রিক স্বয়ংক্রিয়তা, অন্যমনস্কতা আর অসামাজিকতা—এই বৈশিষ্ট্যগুলো অবিচ্ছেদ্যভাবে পরস্পরের সঙ্গে জড়িত এবং তাদের প্রত্যেকটি আবার এককভাবে কোন হাস্যকর চরিত্র সৃষ্টির উপাদান।

মোট কথা, মানুষের ব্যক্তিত্ব নিয়ে চিন্তা করতে গিয়ে যদি একদিকে আমরা তার আবেগ ও অনুভূতিপ্রবণ দিকটাকে আলাদা করি, দেখা যাবে তার ব্যক্তিত্বের বাকী অন্য যা কিছু জিনিস হাস্যোদ্দীপক হয়ে দাঁড়াবে, আর সেই হাস্যকরতার তীব্রতা বা ক্ষীণতা নির্ভর করবে তার চরিত্রের যান্ত্রিক অনমনীয়তা বা জাড্যের অনুপাতের ওপর। এই বিশ্লেষণের প্রথম থেকেই এই চিন্তাগুলিকেই আমরা সূত্রবদ্ধ করছি (avons formulé)। এই সূত্রের প্রধান কতকগুলি দৃষ্টান্ত আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি এবং এইমাত্র সেগুলিকে হাস্যরসের সূত্রনির্ণয়ের কাজে ব্যবহার করেছি। এবার আমরা রহস্যটিকে আরও একটু কাছ থেকে দেখার চেষ্টা করব, এবং দেখব যে বিভিন্ন শিল্পে হাস্যকৌতুক কিভাবে স্থান অধিকার করে তা বুঝতে এই সূত্রগুলি আমাদের সাহায্য করে।

এক অর্থে বলা যায় সব চরিত্রই হাস্যকর—বিশেষত 'চরিত্র' বলতে আমরা যখন মানুষের সত্তার মধ্যে বাঁধাধরা, তৈরি-অবস্থাতেই-পাওয়া (tout fait) বৈশিষ্ট্যগুলিকে বোঝাতে চাই—অর্থাৎ চরিত্রের সেই যন্ত্রসদৃশ, আবেগ-বিবেচনাহীন দিকটা, যা অনুক্ষণ দম-দেওয়া একটা ঘড়ির মতো নিজের থেকেই চলতে থাকে। বলতে পারেন এটা সেই জিনিস যার সাহায্যে আমরা অবিরাম নিজেদের অনুকরণ করে চলেছি। ঐ কারণেই আবার ঐ জিনিসটা আমাদের অন্যদেরও অনুকরণ করতে শেখায়। প্রত্যেকটি হাস্যকর চরিত্র যেমন একটা বিশেষ শ্রেণীর (un type) তেমনি কোন শ্রেণীর চরিত্রের সঙ্গে অন্য কারুর সাদৃশ্যের মধ্যেও হাস্যকর একটা কিছু আছে। কোন লোকের সঙ্গে দীর্ঘ ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও তার মধ্যে কৌতুকপ্রদ কোন বৈশিষ্ট্য আমরা আবিষ্কার করতে নাও পারি। কিন্তু ঘটনাক্রমে যদি কোন নাটক বা উপন্যাসের পাতায় পাওয়া কোন চরিত্রের সঙ্গে তার তুলনা করার কারণ এসে যায় তাহলে অন্ততঃ স্বল্প সময়ের জন্য হলেও সে আমাদের হাসির

উদ্রেক করবে। অথচ উপন্যাস বা নাটকের চরিত্রটি হয়তো কোনমতেই হাস্যকর ব্যক্তিত্ব নন। কিন্তু বাস্তবজীবনে আর একজনের তাঁর মতো হওয়ার মধ্যে কৌতুকের ব্যাপার আছে। অর্থাৎ আপন অনন্ত ব্যক্তিত্বের গণ্ডী থেকে দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে অন্য এক চরিত্রের মতো হওয়ার মধ্যে কৌতুকের কোন কারণ আছে। কোন ধরাবাঁধা, আগে থেকে তৈরি নক্‌শার মধ্যে পড়ে যাওয়াটাই হাস্যকর। সবচেয়ে বেশি হাসির ব্যাপার হয় যখন কোন চরিত্র স্বয়ং একটা শ্রেণীর এমন দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হয়, যাকে দেখে অন্যেরা তাদের ব্যক্তিত্বকে গড়ে তুলতে চায়—এ যেন কোন তৈরি ছাঁচের মধ্যে নিজেদের ফেলে দেওয়া। কোন ধরাবাঁধা পূর্বপরিকল্পিত চরিত্র হিসেবে ছাঁচের মধ্যে জমে যাওয়া।

তাই উঁচু জাতের কৌতুকনাটকের (de comédie haute) উদ্দেশ্য সাধারণ কতকগুলো শ্রেণীর প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্র সৃষ্টি করা। একথা অনেকবার বলা হয়েছে। কিন্তু কথাটা আর একবার বলাতে দোষের কিছু নেই, কারণ এর চেয়ে ভালো লক্ষণ কৌতুকহাস্যের হতে পারে না। কিন্তু আমাদের একথা বলা ঠিক হবে না যে কৌতুকনাটক শুধু কতকগুলো সাধারণ বর্গের চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের অবহিত করে; সেই সঙ্গে আমাদের আরও বলতে হবে যে কৌতুকহাস্যই একমাত্র শিল্প যা সাধারণ বা সামান্য সত্যকে উদ্‌ঘাটন করতে চায়। তাই, যখন তার এই উদ্দেশ্যের উল্লেখ করা হয় তখনই তার প্রধান বৈশিষ্ট্যটি উল্লিখিত হয়ে যায় এবং বলে দেওয়া হয় যে অন্য আর কোন শিল্প এই উদ্দেশ্যটি সাধন করতে পারে না। কৌতুকহাস্যের আর কৌতুকসাহিত্যের মূল বৈশিষ্ট্য যে এইখানে তা প্রমাণ করতে হলে, এবং কৌতুকনাটক বা কমেডি যে এদিক থেকে ট্র্যাজেডির ঠিক বিপরীত তা দেখাতে হলে এই শিল্পের উন্নততর প্রকাশপদ্ধতিগুলির লক্ষণও আলোচনা করতে হবে; তারপর ক্রমশ প্রহসন জাতীয় রচনার ক্ষেত্রে নেমে এসে আমরা বুঝতে পারব যে এই জাতীয় নাটক জীবন ও শিল্পের মাঝামাঝি একটা সন্ধিস্থলে অবস্থিত, এবং আরও বুঝব যে বিষয়বস্তুর সামান্যতার (généralité) কারণে এই শিল্প অন্য যে কোন শিল্পমাধ্যম

থেকে আলাদা। কিন্তু এত ব্যাপক আর বিভিন্নমুখী অনুসন্ধানে এখনই আমরা নামতে পারি না। তবু তার প্রধান রূপরেখা আর ধর্মগুলি নিয়ে আলোচনা আমাদের করতেই হবে—তা না করলে প্রহসনমূলক নাটকের অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলো সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহলের অভাব পরিলক্ষিত হবে।

শিল্পের উদ্দেশ্য কি? যদি বাস্তব জগৎ মানুষের ইন্দ্রিয়বোধ আর চেতনার সঙ্গে সরাসরি সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারত, যদি বস্তুজগতের সঙ্গে আমাদের আত্মার তাৎক্ষণিক আদান-প্রদান সম্ভবপর হোত তা হলে শিল্প জিনিসটাই হয় নিষ্প্রয়োজন আর নিরর্থক হয়ে যেত, নয়তো আমরা সবাই শিল্পী হয়ে উঠতাম, কারণ সে ক্ষেত্রে অনুক্ষণ নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকৃতি আর চরম সত্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমাদের সত্তা অনুরণিত হতে থাকত; আমাদের স্মৃতিশক্তির সহায়তায় আমাদের দৃষ্টি অননুকরণীয় আর মনোমুগ্ধকর নানা দৃশ্য মহাপরিসরে খোদাই করত, মহাকালের ললাটে মুদ্রিত দেখত; প্রাচীন মহাভাস্করদের তৈরি মূর্তির মতো নয়নাভিরাম সব মূর্তি মানুষের দেহের জীবন্ত মর্মরে অবিরাম আমরা প্রত্যক্ষ করতাম; আভ্যন্তর আত্মার বিরামহীন সুরলহরী আমাদের অন্তরের গভীরতম কর্ণকুহরে নিরন্তর ধ্বনিত হোত। আর সেই সঙ্গীত প্রায়ই আনন্দের হলেও মাঝে মাঝে তাতে বেদনার সুরমূর্চ্ছনা শোনা যেত, তবু মানবমন তার দ্বারা অপার্থিব আনন্দের ধারায় ধৌত হয়ে শুদ্ধ হয়ে যেত। এই আনন্দের প্লাবন আমাদের ঘিরে রয়েছে এবং আমাদের হৃদয়ে নিহিত রয়েছে, তবুও আমরা তার সামান্যতম অংশও স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারি না। প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে—না, আরও সঠিকভাবে বললে, মানুষের সত্তা ও মানুষের চেতনার মধ্যে—যেন একটা যবনিকার ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণ মানুষের সামনে এই যবনিকা খুবই ঘন আর অস্বচ্ছ, কিন্তু শিল্পী আর কবিদের কাছে এই অজ্ঞতার অন্তরাল অপেক্ষাকৃত পাতলা আর স্বচ্ছ। কিন্তু এই যবনিকা কার সৃষ্টি? কোন্ পরী বা মায়াবিনীর? বৈর না প্রীতি; কোন্ মানসিকতা এই যবনিকা সৃষ্টির পেছনে সক্রিয়? আমাদের জীবিত থাকতে হবে, আর জীবন দাবী করে যে আমাদের প্রয়োজনের সঙ্গে

সম্বন্ধের ভিত্তিতে জীবনের যাবতীয় ব্যাপারের তাৎপর্য আমাদের বুঝে নিতে হবে। জীবনের ধর্ম তৎপরতা আর সক্রিয়তা। জীবন মানে যাবতীয় বস্তু ও ঘটনার মধ্য থেকে শুধু আমাদের পার্থিব প্রয়োজনের উপাদানগুলো বেছে নিয়ে যথাযথ প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে তাদের প্রতি সাড়া দেওয়া। বাকী অন্যসব প্রতিক্রিয়াকে অস্পষ্ট করে ফেলতে হবে, আমাদের কাছে তারা কায়াহীন ছায়ামাত্র হয়ে দাঁড়াবে। আমরা দৃষ্টিপাত করি আর তাকেই মনে করি দেখা, কান খুলে রাখি আর তাকেই মনে করি শোনা, নিজেকে বাইরে থেকে একটা মোটামুটি পরীক্ষা করে ভাবি নিজের অন্তরের গভীরতম প্রদেশ পর্যন্ত আমাদের জানা হয়ে গেছে। কিন্তু বহির্জগতের যতটুকু অংশ আমরা দেখি বা শুনি তা শুধু আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বেছে নেওয়া সেই কটি জিনিস যেগুলি আমাদের ব্যবহারিক জীবনের আচার-আচরণ ও ক্রিয়াকলাপে সাহায্য করে। ব্যক্তির অন্তঃস্থল থেকে নিঃসৃত যে সামান্য জিনিস তার আপাত ব্যবহার আর বাইরের কাজকর্মে রূপায়িত হয় মাত্র সেইটুকুই তার আত্মোপলব্ধি, নিজের সম্বন্ধে তার জ্ঞান সেইটুকু মাত্র। তাই আমাদের প্রত্যেকের ইন্দ্রিয়বোধ ও চেতনা আসলে প্রকৃত এবং পূর্ণ সত্যের একটা অতিসরলীকৃত এবং ব্যবহারিক জীবনের উপযোগী ধারণার চেয়ে বেশি কিছু নয়। আমাদের চারদিকের নানা ব্যাপার এবং আমার নিজের সম্বন্ধে তারা যে ধারণার সৃষ্টি করে তাতে আমাদের ঐহিক জীবনে উপযোগী ব্যাপারগুলো গুরুত্ব পাওয়ার ফলে জাগতিক দিক থেকে 'অপ্রয়োজনীয়' অন্য যাবতীয় ব্যাপার প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আমাদের কর্মধারা যে পথ ধরে বইতে থাকবে তাকে আগে থেকেই চিহ্নিত করে ফেলা হয়। আমাদের পূর্বসূরী মানুষরা যে পথ ধরে এগিয়ে গেছেন এ হোল সেই পথ। সমস্ত জিনিসকে এমনভাবে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভাজন করা হয়েছে যাতে তাদের দ্বারা মানুষ 'উপকৃত' হতে পারে। মানুষ এই বিন্যাসকে বস্তুর গঠন আর রঙের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব দেয়। সন্দেহ নেই যে অন্যান্য নিম্নস্তরের প্রাণীর চেয়ে মানুষ এ ব্যাপারে অনেক বেশি অগ্রসর। একটা নেকড়ে বাঘের চোখে একটা মেষশাবক আর একটা

ছাগলছানার মধ্যে কোন তফাৎ আছে বলে ভাবা যায় না। তার কাছে দুটোই সমানভাবে শিকারের জিনিস—একলাফে ঘাড়ে পড়ে মেরে ফেলার উদ্দেশ্যেই তৈরি। কিন্তু আমরা মানুষ, তাই আমাদের কাছে ভেড়া আর ছাগলের পার্থক্য খুব পরিষ্কার। কিন্তু দুটো ছাগলের মধ্যে, কিংবা দুটো ভেড়ার মধ্যে তফাৎটা কি আমরা অত সহজে ধরতে পারি? আমাদের সাংসারিক বা ঐহিক দিক থেকে লক্ষ করে প্রত্যেক বস্তু ও প্রাণীর মধ্যে লক্ষিত পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্যের দ্বারা আমরা যদি ঐহিক জীবনে উপকৃত না হই, তা হলে ঐসব বৈশিষ্ট্য ও পারস্পরিক পার্থক্য আমাদের দৃষ্টি বা মন কোনটাকেই আকৃষ্ট করে না। এমন কি যখন তাদের বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ করি, যেমন ব্যক্তিবিশেষকে অন্যদের থেকে আমরা আলাদা করে দেখি, তখন তাদের অনন্যতাই শুধু আমাদের দৃষ্টি আর মনে রেখাপাত করে না, অর্থাৎ তাদের আলাদা রূপ, রং আর গঠনের সংমিশ্রণই আমাদের লক্ষণীয় ব্যাপার হয় না, আমাদের লক্ষ্যের বিষয় হয় তাদের চেহারার শুধু সেই দু'একটা বৈশিষ্ট্য যাদের দ্বারা আমাদের ঐহিক প্রয়োজন সিদ্ধ হতে পারে।

অর্থাৎ আমরা প্রকৃত বা বাস্তব (actuel) জিনিসকে লক্ষ করি না; বেশিরভাগ সময় তাদের ওপর যে তকমা আঁটা থাকে তার মধ্যেই আমাদের লক্ষকে সীমিত রাখি। প্রয়োজনভিত্তিক আচরণের এই প্রবণতা ভাষার প্রভাবে আরও প্রকট হয়ে পড়ে। একমাত্র নামবাচক বা সংজ্ঞা-বাচক ক্ষেত্র ছাড়া, শব্দ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বর্গ বা মোটা ধাঁচের শ্রেণী-সূচক। অতি সাধারণ ক্রিয়া-কলাপ আর সাধারণ বৈশিষ্ট্যসূচক যে কোন শব্দ বস্তু ও দ্রষ্টা-মানুষের মধ্যে এক ধরনের ব্যবধান সৃষ্টি করে, যার দ্বারা বস্তুর আসল রূপটি আমাদের চেতনার বাইরে থেকে যায়। যে প্রয়োজন মেটাবার জন্য কোন বিশেষ শব্দের উদ্ভব হয়েছিল তার আড়ালে বস্তুর প্রকৃত রূপটি ঢাকা পড়ে যায়। শুধু বহির্জগতের বস্তুর ক্ষেত্রেই নয়, আমাদের মনের যে আভ্যন্তর, একান্ত এবং বিশেষ রূপ, তাও শব্দের এই সামান্যতার (généralité) দরুন অজ্ঞানের অন্ধকারে আবৃত হয়। যখন আমরা ভালোবাসা বা ঘৃণা অনুভব করি, যখন উল্লসিত বা বিষন্ন হই তখন

ঐ অসংখ্য ক্ষণস্থায়ী অর্থভারে যুক্ত অনুভূতিগুলি গভীর দ্যোতনা ও তার অনুরণন সমেত কি আমাদের চেতনায় পৌঁছয়? যদি পৌঁছত তা হলে আমরা সবাই ঔপন্যাসিক, কবি বা সঙ্গীতশিল্পী হয়ে উঠতাম। আসলে অধিকাংশক্ষেত্রে আমরা মানসিক অবস্থার বহিঃপ্রকাশকেই দেখি বা অনুভব করি। আমাদের বিভিন্ন আবেগ ও উপলব্ধির সামান্য বা নৈর্ব্যক্তিক বা নির্বিশেষ (impersonal) রূপটিই আমাদের চেতনায় মুদ্রিত হয় বা চোখে পড়ে—যে রূপটি ভাষা এক একটি পরিস্থিতি অনুযায়ী চিরকালের জন্য এক একটি বিশেষ রূপে মানুষের কাছে বেঁধে দিয়েছে। তাই আমাদের একান্ত আর অনন্য সত্তার বৈশিষ্ট্যও আমাদের অগোচরে থেকে যায়। আমরা সামান্যধর্মিতা বা প্রতীক-শাসিত রাজ্যে ঘুরে বেড়াই; আমরা যেন কোন সমরক্ষেত্রে উপস্থিত যেখানে দুটো পরস্পর-বিরোধী সৈন্যবাহিনী একে অপরের শক্তিকে প্রতিহত করার জন্য অনুক্ষণ প্রস্তুত। ঘটনা আর বাহ্য ক্রিয়াকলাপের আকর্ষণে প্রভাবিত আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রয়োজন-সিদ্ধির তাগিদে তারই দ্বারা নির্দিষ্ট যুদ্ধভূমিতে বদ্ধ থেকে এক মধ্যপরিসরে (une zone mitoyenne) অবস্থান করি, যার ফলে আমরা আমাদের স্বকীয় সত্তা আর বস্তুর প্রকৃত রূপ এই দুই জগতেরই বাইরে থেকে যাই, দুটির মধ্যে কোনটিরই অন্তরে প্রবেশ করার সুযোগ বা সম্ভাবনা আমাদের থাকে না। তবুও, কখনও কখনও প্রকৃতিদেবী অন্যমনস্ক হয়ে এমন কিছু ব্যক্তিত্বকে তুলে ধরেন যাঁরা জীবনমঞ্চ সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত উদাসীন। গভীর অভিনিবেশ ও দার্শনিকোচিত মনন-প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভূত না হওয়ার ফলে তাঁদের এই ঔদাসীন্য যুক্তিসমৃদ্ধ এবং দার্শনিকসুলভ নয়—সেখানে থাকে একটা সহজ অনৌৎসুক্য, চেতনার মধ্যেই নিহিত এক ধরনের নির্লিপ্তি—বলা যায় যে নির্লিপ্তভাব নির্দোষ ও অপাপবিদ্ধ ভাবে এইসব মানুষের দর্শন, শ্রবণ ও চিন্তনের মধ্যে সক্রিয় হয়। যদি ঐ ঔদাসীন্য অবিমিশ্র হোত, যদি এই সহজ বৈশিষ্ট্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আত্মা কোন ক্রিয়াকাণ্ডে অংশ না নিত তা হলে তা এমন এক শিল্পীর সত্তা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করত যা একই সঙ্গে যাবতীয় শিল্পমাধ্যমে প্রতিভার সমান উৎকর্ষ দেখাত কিংবা সমস্ত

শিল্পের বৈশিষ্ট্যকে একটি শিল্পের মধ্যে একাত্ম করে দিত। সেই প্রতিভা সমস্ত বস্তুকে তাদের আদি ও অকৃত্রিম স্বকীয়তার মধ্যে দেখত; বস্তুর গঠন, বর্ণ আর শব্দ থেকে মনোজগতের সূক্ষ্মতম প্রতিক্রিয়া পর্যন্ত তার কাছে সমান স্বচ্ছতার সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করত। কিন্তু প্রকৃতির কাছ থেকে এতটা দাবী করা যায় না। এমন কি আমাদের মধ্যে তিনি যে কিছু লোককে শিল্পী করেছেন, সেটাও কোন এক অপরিকল্পিত আকস্মিকতার ফল। তাঁদের জন্ত বিরাট রহস্যের একটা অংশের ওপর থেকে তিনি ঐ আবরণকে সরিয়েছেন মাত্র। এইসব শিল্পীদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একদিকের উপলব্ধিকে জাগতিক প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করতে তিনি ভুলে গেছেন। আর আমরা যেগুলিকে ইন্দ্রিয় (sens) বলি, যেহেতু সেগুলির প্রত্যেকটি কেবলমাত্র একদিকে প্রযুক্ত হতে পারে, শিল্পীও শুধু তাঁর একটি বিশেষ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে শিল্পসৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত হতে পারেন। এই কারণেই আদিতে বিভিন্ন শিল্পমাধ্যমের মধ্যে পার্থক্য ও বৈচিত্র্য আসে। ঠিক ঐ কারণেই এক ব্যক্তির প্রবণতাও অন্য আর এক ব্যক্তির প্রবণতার মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়। কারুর প্রবণতা বস্তুর রঙ আর রূপের দিকে। যেহেতু এক্ষেত্রে রঙকে রঙ হিসেবেই গুরুত্ব দেওয়া হয়, গঠনের খাতিরেই গঠন সমাদৃত হয়, এবং যেহেতু এইসব ক্ষেত্রে শিল্পীর আপন প্রয়োজনের চিন্তাকে বড় না করে রঙ ও গঠনকে তাদের নিজের জন্যই সমাদর করা হয়, বস্তুর বর্ণ ও গঠনের মাধ্যমে তাদের আভ্যন্তর স্বরূপকে শিল্পী প্রত্যক্ষ করতে পারেন। ক্রমশ দর্শকচেতনাতেও শিল্পী নিজের অনুভূত সত্যকে সঞ্চারিত করতে থাকেন—আমাদের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়াতে বিহ্বলতা বা উপলব্ধির দুর্বলতা পরিলক্ষিত হওয়া সত্বেও। বস্তুর বর্ণ ও আকৃতি সম্বন্ধে যে সংস্কারাচ্ছন্ন ধারণা দৃঢ়মূল থেকে আমাদের দৃষ্টি ও প্রকৃত জগতের মধ্যে আড়াল তৈরি করে অন্তত সাময়িকভাবে সে আড়ালটি শিল্পী আমাদের দৃষ্টিপথ থেকে সরিয়ে দেন। এইভাবে শিল্পী শিল্পের মহত্তম আদর্শকে রূপ দেন, প্রকৃতির যথার্থ রূপ আমাদের কাছে মেলে ধরেন। কেউ আবার নিজের মধ্যেই আত্মগোপন করেন। অনুভূতি বা আবেগ যে সব অগণ্য ঘটনা ও ক্রিয়াকলাপের মধ্যে

অনুভূতি বা আবেগ-এর বিদ্যুৎশক্তি। মানুষ যদি সব সময়ে তার স্বাভাবিক আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ করত, যদি সামাজিক বা নৈতিক কোন নিয়ম তাকে নিয়ন্ত্রণে না রাখত, তাহলে মানুষ ও মানুষের মধ্যে অহরহ নানা আবেগের স্ফুরণ আর বিস্ফোরণ ঘটতে থাকত। কিন্তু সামাজিক উপযোগিতার তাগিদে আগে থেকেই ঐ সব বিস্ফোরণের আশঙ্কা করে তাদের সংযত রাখতে হয়। সমাজে থাকতে হলে মানুষকে কিছু বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হয়। আমাদের ঐহিক স্বার্থ আমাদের যা নির্দেশ দেয়, আমাদের যুক্তিবোধ তাকেই আদেশের রূপ দেয়। কর্তব্যের আহ্বান আসে, সেই আহ্বান আমাদের মানতে হয়। এই দ্বৈতশক্তির প্রভাবে আমাদের জীবনে অনিবার্যভাবে একটা নতুন অনুভূতি আর সংবেদনশীলতার বহিরাবরণ তৈরি হয় যেটা বেশির ভাগ মানুষের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। যদি ব্যক্তি-চরিত্রে এই আবরণকে সরিয়ে ফেলার শক্তি না থাকে, তা হলে তা তার আভ্যন্তরীণ আবেগের উত্তাপকে নিস্তেজ করে দেয়। উত্তরোত্তর শান্ত ও স্থির সামাজিক পরিস্থিতির দিকে মানুষের মন্থর অথচ নিশ্চিত অগ্রগতি এই বাহ্য আবরণকে ক্রমশ কঠিন আর স্থায়ী করে তুলেছে—ঠিক যেমন আমাদের এই পৃথিবী একটা ঠাণ্ডা আর কঠিন আবরণ দিয়ে তার অগ্নিময়, তরল, ধাতব অভ্যন্তরকে আবৃত করার প্রয়াসে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছে। কিন্তু তবুও এখনও আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ আর অগ্ন্যুৎপাত ঘটে। আর পৌরাণিক নানা কাহিনী অনুসারে পৃথিবীর যদি প্রাণ থাকত, খুব সম্ভব ঘুমন্ত অবস্থায় অতীতের আকস্মিক বিস্ফোরণগুলোর স্মৃতি রোমন্থন করে আর স্বপ্ন দেখে সে আনন্দ পেত, কারণ ঐ বিস্ফোরণগুলির মাধ্যমেই সে তার সুপ্ত আভ্যন্তরীণ সত্তাকে মাঝে মাঝে ফিরে পেয়ে তার আস্বাদ পেত। নাটকও আমাদের ঠিক অনুরূপ আনন্দের আস্বাদনে সাহায্য করে। যুক্তিবোধ আর সাধারণ সামাজিক প্রয়োজনের দ্বারা তৈরি শান্ত আর গতানুগতিক জীবন-ধারার আবরণের নিচে আমাদের ভেতরে এমন একটা জিনিস অবদমিত হয়ে আছে যা সৌভাগ্যবশত সব সময়ে বিস্ফোরণে ফেটে না পড়লেও তার ঊর্ধ্বমুখী আভ্যন্তরীণ চাপ মাঝে মাঝে আমাদের অনুভব করতে হয়। নাটক

তাই ঐ অবদমিত প্রকৃতিকে মাঝে মাঝে সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার সুযোগ দেয়। কখনও নাটক সোজাসুজি তার অতীতের দিকে এগোয়, মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে তার বাইরের শান্ত আবরণকে উৎক্ষিপ্ত করে তোলার মতো ক্ষমতাসম্পন্ন কোন আবেগ সেখানে একটা সাধারণ উর্দ্ধমুখী চাপ সৃষ্টি করে। এই চাপ কখনও আবার পাশের দিকে অনুভূত হয়—সমসাময়িক নাটকে যেটা প্রায়ই দেখা যায়। এই জাতীয় নাটকে শিক্ষা দেবার এক ধরনের দক্ষতা বেশ চোখে পড়ে। সেখানে সমাজের নানা অসঙ্গতিকে প্রকট করে, সামাজিক বিধিনিষেধ আর নিয়ম-কানুনের পেছনে সক্রিয় কাপট্য আর রক্ষণশীল মূল্যবোধকে অতিরঞ্জিত করে দেখানো হয়; এইভাবে শুধু বাইরের শক্ত আস্তরণটাকে খুলে ফেলে পরোক্ষভাবে এই সব নাটক 'আভ্যন্তরীণ বাস্তবতার' কাছাকাছি আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু, সামাজিক রীতিনীতিকে দুর্বল করে, কিংবা মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতাগুলিকে উজ্জীবিত করে নাটক যে একটিমাত্র উদ্দেশ্যকে পূরণ করতে চায় তাহোল মানুষের সত্তার একটা গোপন বা সুপ্ত অংশের মুক্তি আর উন্মীলন। এ হোল সেই গোপন অংশ যাকে চরিত্রের ট্র্যাজিক উপাদান বলা চলে। বাস্তবিক, রোমাঞ্চপূর্ণ কোন নাটকের অভিনয় দেখার পর আমাদের এই রকমের উপলব্ধিই হয়ে থাকে। নাটক সম্বন্ধে আমাদের আগ্রহ ও উদ্দীপনার কারণ হোল তা অন্য মানুষদের সম্বন্ধে আমাদের যা বলে তার থেকে বেশি অন্তর্দৃষ্টি দেয় আমাদের নিজেদের সত্তা সম্বন্ধে। আমাদের মনের কন্দরে লুকিয়ে থাকা অজস্র আবেগ আর অনুভূতি, বাস্তবায়িত হবার জন্য উন্মুখ নানা কাজের অতৃপ্ত বাসনা নাটকের মাধ্যমে আমাদের মনে মুদ্রিত হয়। কখনও কখনও মনে হয় সুদূর অতীত থেকে নেমে আসা আমাদের হৃদয়ে সুপ্ত সনাতন বা আদি কোন স্মৃতি নাটকের দৃশ্য আবার জীবন্ত করে তুলেছে—এইসব স্মৃতি আমাদের চেতনার মাটিতে এত দৃঢ়মূল অথচ আমাদের বর্তমান জীবনধারণ পদ্ধতি থেকে এতই বিযুক্ত যে নাটক দেখার সময় আমাদের প্রাত্যহিক বাস্তবজীবনকে কিছুক্ষণের জন্য অবাস্তব, অপরিচিত আর প্রথাসর্বস্ব

বলে মনে হয়—মনে হয় এই জীবনে অভ্যস্ত হবার জন্যে নতুন করে আমাদের শিক্ষানবীশি করতে হবে। তাই, আমাদের আপাত আর বাস্তবপ্রয়োজন-ভিত্তিক ক্রিয়াকাণ্ডের স্তর ভেদ করে নাটক আমাদের সত্তার গভীরতম স্তর থেকে একটা চরম বাস্তবতাবোধকে জাগিয়ে তোলে, এবং এক্ষেত্রে নাটকের উদ্দেশ্য আর অন্য যে-কোন শিল্পের চরম উদ্দেশ্য অভিন্ন।

এর থেকেই প্রমাণিত হয় যে সব সময়েই শিল্পের লক্ষ্য 'বিশেষ' বা 'ব্যক্তি'র রূপায়ণ। চিত্রশিল্পী কোন বিশেষ স্থানে, বিশেষ মুহূর্তে, বিশেষ দিনে আর বিশেষ রঙে যা দেখেছেন এবং আর কোনদিন যা দেখার আশা না রাখেন তাকেই মূর্ত করে তোলার চেষ্টা করেন। কবিও তাঁর একান্ত নিজের এমন একটা মানসিক প্রতিক্রিয়া নিয়ে গীতিকবিতা লেখেন যা হয়তো আর কোনদিন তাঁর সৃজনীবাসনাকে উদ্বেলিত করবে না। নাট্যকারও তেমনি আমাদের সামনে উদ্ঘাটিত করেন কোন বিশেষ ব্যক্তির আত্মার ইতিহাস—অনুভূতি আর ঘটনার সুতো দিয়ে বোনা এমন একটা জীবন্ত পট, যা একবার মাত্র ঘটেছে, দ্বিতীয়বার ঘটার কোন সম্ভাবনা যার নেই। অবশ্যই এইসব মনোভাব আর অনুভূতির সাধারণ নামকরণ হতে পারে, কিন্তু অন্য কোন চরিত্র বা সত্তার আধারে তারা একেবারে অবিকল একই রূপ কোনমতেই নিতে পারবে না। তারা 'ব্যক্তি' বা 'চরিত্রবিশেষে' রূপায়িত হয়েছে। শুধুমাত্র এই অনন্যতার ভিত্তিতেই নাটক শিল্প হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে সামান্যতা (généralité), প্রতীকধর্মিতা এবং শ্রেণী-বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি ধর্ম আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক চেতনার অংশ, জীবনপথের অপরিহার্য পাথেয়। তাই, এ-ব্যাপারে ভ্রান্তি, প্রমাদ বা ভুলবোঝাবুঝির অবকাশ কোথায়?

ভ্রান্তির কারণ হোল দুটো একেবারে আলাদা জিনিসের একটিকে অপরটির বিকল্প বলে ধরার প্রবণতা: বস্তুর সামান্যতা এবং বস্তু সম্বন্ধে আমাদের গতানুগতিক ধারণা। কোন মানসিক ভাবকে সাধারণত সত্য বলে ধরা হলেই প্রমাণ হয় না যে সেই ভাবটি কোন সর্বজনীন অনুভূতি। হ্যামলেটের চেয়ে অনন্ত আর কোন বিশেষ চরিত্র কল্পনা করা কঠিন। কোন কোন ব্যাপারে

অন্য অনেক চরিত্রের সঙ্গে তার সাদৃশ্য থাকলেও শুধু ঐ সাদৃশ্যগুলোর জন্য হ্যামলেটের চরিত্র আমাদের আগ্রহ বা ঔৎসুক্যের উদ্রেক করে না। তবুও সকলে চরিত্রটিকে জীবন্ত বলে সমাদর করেছে। অন্যান্য অনেক শিল্পকীর্তি সম্বন্ধেও ঐ একই কথা বলা যায়। প্রতিটি শিল্পকীর্তি অনন্য, কিন্তু তাতে প্রতিভার স্পর্শ থাকলে তা সারা মানবসমাজের দ্বারা স্বীকৃত আর সমাদৃত হবেই। কিন্তু কেন লোকে এইসব শিল্পকর্মকে এত আদরের সঙ্গে গ্রহণ করে? আর আপন শ্রেণীর মধ্যে কোন শিল্পকীর্তি যদি অনন্য বা একান্ত হয়, কোন্ লক্ষণ তার সত্যতা সূচিত করে? আমার বিশ্বাস সাধারণ জাগতিক ও সামাজিক সংস্কার থেকে মনকে যতটা মুক্ত রেখে যতটা আন্তরিকতার সঙ্গে আমরা চেষ্টা করব শিল্পের সততা আমরা ঠিক ততটাই উপলব্ধি করতে পারব। এই আন্তরিকতা সংক্রামক (communicatif)। শিল্পী নিজে যা দেখেছেন আর উপলব্ধি করেছেন আমরা কখনই ঠিক তা দেখতে বা উপলব্ধি করতে পারব না, অবিকল সেই রূপে তো নয়ই। কিন্তু শিল্পী নিজে যদি আভ্যন্তরীণ সত্যকে দেখে থাকেন, তাহলে সংস্কার আর গতানুগতিকতার আবরণ সরিয়ে দৃষ্ট সত্যকে তুলে ধরার জন্য তিনি তাঁর কাজে যে প্রয়াস দেখিয়েছেন তা আমাদের মনকে আকৃষ্ট আর প্রভাবিত করবেই। শিল্পীর কীর্তি আদর্শ হিসেবে আমাদের নতুন শিক্ষা দেয়। শিল্প থেকে পাওয়া শিক্ষার উপযোগিতা শিল্পসৃষ্টির পেছনে সক্রিয় আন্তরিকতা ও অনুপ্রেরণার সঠিক মান নির্ণয় করে। তাই সত্যের ভেতরে একটা সুদৃঢ় প্রত্যয়ের শক্তি সব সময়ে কাজ করে। এই সত্য শুধু শিল্পীর নিজের দৃঢ় বিশ্বাসকে জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা নয়, অপরকে সেই বিশ্বাসে দীক্ষিত করার ক্ষমতাও রাখে এবং শিল্পের সততা উপলব্ধি করতে এই গুণটি আমাদের সাহায্য করে। সৃজনীয় শিল্প যত বেশি মহৎ, তার মধ্যে নিহিত শিল্পীর দ্বারা উপলব্ধ সত্য যত বেশি গভীর, সেই শিল্পকে রূপ দেওয়া যেমন তত বেশি সময়সাপেক্ষ, দর্শকচেতনার ওপর তার প্রভাবও তত ব্যাপক, স্থায়ী ও সর্বজনীন হবার সম্ভাবনা। তাই যে কোন শিল্পকীর্তির সর্বজনীনতা নির্ভর করে রসিকমনে তার প্রভাবের ওপর।

কৌতুকহাস্যের লক্ষ্য কিন্তু একেবারে আলাদা। এখানে শিল্পের বৈশিষ্ট্য সামান্য বা সাধারণ মানুষী-ধর্মের প্রতিফলন। কৌতুকনাটক বা প্রহসনে তুলে ধরা চরিত্রগুলোর সঙ্গে আগে থেকেই আমাদের জানাশোনা, ভবিষ্যতেও তাদের সঙ্গে আবার আমাদের দেখা হবে। মানুষে মানুষে সাদৃশ্যকে ঘিরেই প্রহসন গড়ে ওঠে। প্রহসনের একটা লক্ষ্য বিভিন্ন মানুষের শ্রেণী-বৈশিষ্ট্যকে দর্শকদের সামনে তুলে ধরা। অবশ্য দরকার হলে সম্পূর্ণ নতুন ধাঁচের চরিত্রসৃষ্টিতেও প্রহসন অক্ষম নয়; এ ব্যাপারে অন্যসব শিল্প থেকে প্রহসন আর কৌতুকনাটক আলাদা, প্রায় বিপরীতধর্মী।

কিছু কিছু কালজয়ী কৌতুকনাটকের নামগুলি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। *Le Misanthrope* (মানববিদ্বেষী),[৪১] *L'Avare* (কৃপণ বা লোভী), *Le Joueur* (জুয়াড়ি), *Le Distrait*[৪২] (আনমনা) ইত্যাদি। এগুলির কোনটাই ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়, সবগুলিই মানুষের স্বভাববোধক বা শ্রেণীসূচক। কোন চরিত্রের সংজ্ঞাসূচক নামও যদি কোন প্রহসন বা কৌতুকনাটকের শিরোনামা হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তা অবিলম্বে বিষয়বস্তুর ভারে গৌণ হয়ে ঢাকা পড়ে যায়—সাধারণ ও সমানধর্মী বিশেষ্যের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। আমরা তখন বলি 'একটা তারতুফ্'; কখনও কিন্তু বলি না 'একজন অইদিপুস্', 'এক হ্যামলেট', কিংবা 'জনৈকা ফেড্রা'।

উল্লেখ করতে হয়, বিয়োগান্ত বা ট্র্যাজিক নাটকের রচয়িতার মনে কখনও নাটকের প্রধান চরিত্রকে ঘিরে থাকা এমন সব গৌণ চরিত্রের কথা মনে আসে না যাদের ঐ নায়কের চরিত্রের সরলীকৃত সংস্করণ বলে মনে হতে পারে। ট্র্যাজিক নাটকের নায়ক তাঁর জগতে অনন্য ও অদ্বিতীয়। হয়তো তাঁকে অনুসরণ করা যেতে পারে, কিন্তু তা করলে জ্ঞানত বা আমাদের অজ্ঞাতেই আমরা ট্র্যাজেডির জগৎ থেকে প্রহসনের চৌহদ্দিতে ঢুকে পড়ব। বিয়োগান্ত নাটকে অন্য আর কেউ তার নায়কের মতো নয়, কারণ নায়ক নিজে অন্য আর কারুর মতো নন। বিপরীত পক্ষে, এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে একটা সহজ বাসনা প্রহসন রচয়িতাকে তাঁর নাটকের মুখ্য

চরিত্রকে ঘিরে এমন সব গৌণ চরিত্রের আবর্তন দেখাতে প্রবৃত্ত করে যাদের মধ্যে একই জাতের কতকগুলি সাধারণ ধর্ম বা বৈশিষ্ট্যের প্রভাব কার্যকর। অনেক কৌতুকনাটকের শিরোনামা হিসেবে কোন বিশেষ্যের বহুবচন বা কোন সমষ্টিবাচক বিশেষ্যকে ব্যবহৃত হতে দেখা যায় : *Les Femmes Savantes* (বিদুষী মহিলাবৃন্দ) *Precieuses Ridicules* (হাস্যকর পণ্ডিতম্মন্যার দল) ইত্যাদি নাটক মঞ্চের ওপর বিভিন্ন গোষ্ঠীর হলেও মূলত একই শ্রেণীর একাধিক চরিত্রকে বিচিত্র সব পরিস্থিতির মধ্যে উপস্থাপিত করে। কৌতুকনাটকের এই প্রবণতা খুঁটিয়ে দেখার মতো। সম্ভবত নাট্যকাররা মানসিক রোগের চিকিৎসকদের দ্বারা সম্প্রতি আবিষ্কৃত একটা তত্ত্বের কথা জেনেছেন—এই তত্ত্ব বলে যে কোন বিশেষ শ্রেণীর বাতিকগ্রস্ত মানুষ একটা অদৃশ্য আকর্ষণের ফলে পরস্পরের সান্নিধ্য কামনা করে। এর আগে আমরা দেখিয়েছি যে ঠিক মানসিক রোগগ্রস্ত হয়েও কৌতুককর চরিত্রগুলো কোন কোন ব্যাপারে ভীষণ অন্যমনস্ক এবং তাদের এই অন্যমনস্কতা ক্রমশ বেড়ে উঠে সহজেই মনোবিকারে পরিণত হতে পারে। তা ছাড়াও অন্য আর একটা ব্যাপার আছে। যে সব চরিত্রের কাজকর্মে একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি ঘটে তাদের সৃষ্টি করাই যদি কৌতুকহাস্য রচয়িতার উদ্দেশ্য হয়, তা হলে ঐ ধরনের অনেক চরিত্র সৃষ্টি না করে তিনি আর কোন্ উপায়ে ঐ উদ্দেশ্য পূর্ণ করবেন ? প্রকৃতিবিজ্ঞানী (le naturaliste) প্রজাতির (de l'espèce) লক্ষণ বোঝাবার জন্য ঠিক ঐ পদ্ধতি ব্যবহার করেন। তিনি প্রতিটি প্রজাতির বিভিন্ন গোষ্ঠীর গণনা আর বর্ণনা করেন।

ট্র্যাজেডি আর প্রহসনের মধ্যে এই মূল পার্থক্য—অর্থাৎ প্রথমটি ব্যক্তিবিশেষকেন্দ্রিক আর দ্বিতীয়টি শ্রেণীভিত্তিক—অন্য আর এক পদ্ধতিতে রূপ পায়। কোন নাটকের প্রথম খসড়াতেই এর সূচনা দেখা যায়। প্রথম থেকেই দুটো একেবারে বিপরীতধর্মী চরিত্রায়ণ-পদ্ধতির ব্যবহারেই এই পার্থক্য প্রকট হয়ে ওঠে।

শুনতে স্ববিরোধী হলেও বলতে হয় যে ট্র্যাজেডির স্রষ্টার কাজে নায়ক

ছাড়া অন্য চরিত্রগুলির মধ্যে গভীর বিশ্লেষণ বা অনুশীলনের দরকার করে না। সত্যিই, অনেক প্রতিভাধর কবিকে আমরা খুব শান্তিপূর্ণ অবকাশ ও নিরুদ্বেগ জীবন কাটাতে দেখেছি; তাঁদের রচিত কাব্যে তাঁরা যে প্রলয়ঙ্কর আবেগ-অনুভূতির বিস্ফোরণ জীবন্ত ভাবে এঁকেছেন তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে তার অভিজ্ঞতাই হয়তো নেই। কিন্তু যদি ধরে নেওয়া যায় যে ঐসব অভিজ্ঞতা তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে যথার্থই এসেছিল, সেই সঙ্গে একথা মনে করা যায় না যে তাঁরা তাঁদের সৃষ্টিকর্মে ঐ অভিজ্ঞতাগুলোকে কাজে লাগাতে পারতেন। কবির লেখায় যে গভীর অনুভূতি প্রকাশ পায় বা তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের মধ্যে যে মানসিক দ্বন্দ্বের ছবি আমরা দেখি তাই আসলে আমাদের আগ্রহ ও কৌতূহল জাগায়। ঐ অন্তর্দৃষ্টি শুধু বাহ্য ঘটনার অভিজ্ঞতা থেকে আহরণ করা যায় না। আমাদের মধ্যে কারুর মনের গভীরে কি আছে তা অন্যের পক্ষে জানা বেশ কঠিন। কতকগুলো আবেগ অনুভূতি ছাড়া বাইরে থেকে আর কিছু আমরা দেখতে পাই না। বহিঃপ্রকাশিত এই সব আবেগের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমরা আখছার আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সাহায্য নিই এবং সব সময়েই এই সব ব্যাখ্যার মধ্যে খুঁত থেকে যায়। তাই সেখানে আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাটাই প্রাধান্য পায়, আমাদের আপন সত্তা ছাড়া অন্য আর কিছুর সঙ্গে আমরা প্রকৃতপক্ষে একাত্ম হতে পারি না, এমন কি তাও করতে পারি কিনা সেটাও তর্কসাপেক্ষ। এর দ্বারা কি প্রমাণিত হয় যে কবি যা কিছুর ছবি আঁকেন তার সবই তিনি আপন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে পেয়েছেন এবং তাঁর সৃষ্ট প্রতিটি চরিত্রের আন্তর জীবন তিনি নিজের অন্তরের মধ্যে দেখেছেন? কবির জীবনকাহিনী কিন্তু এ-ধরনের সিদ্ধান্তের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেয়। একই মানুষ কিভাবে ম্যাকবেথ, হ্যামলেট, ওথেলো, রাজা লিয়র এবং আরও বহু চরিত্র হতে পারেন? আমরা প্রত্যেকে যে-ব্যক্তিত্বের অধিকারী এবং অন্য যে-সব ব্যক্তিত্ব বা সত্তা আমরা পেলেও পেতে পারতাম তার মধ্যে তফাৎটা কোথায় তা বোঝা দরকার। আমাদের প্রত্যেকের চরিত্র এমন একটা মনোনয়নের (choix) ফল যেটাকে সব সময়

আমরা নবীকরণ করতে বাধ্য হচ্ছি। মনে হয় আমাদের জীবনধারণের পথে নানা সন্ধিপর্ব আছে, যেখানে পৌঁছে আমরা নতুন কোন পথ ধরতে পারতাম, যদিও মনোনীত পথটি ছাড়া অন্য কোন পথ ধরে চলা আমাদের কারুর পক্ষেই আর সম্ভব নয়, তবুও চলার পথে অন্য অনেক বিকল্প পথের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা সচেতন হই। কবিপ্রতিভার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হোল জীবনের মনোনীত পথে চলতে চলতে অস্পষ্টভাবে বা অসম্পূর্ণ দেখা, কিংবা পেছনে ফেলে আসা পথে মনে মনে ফিরে গিয়ে কল্পনার সাহায্যে সেই পথের শেষ পর্যন্ত যাওয়ার ক্ষমতা। নিশ্চয়ই শেক্সপীয়র নিজে হ্যামলেট, ম্যাকবেথ বা ওথেলো—এঁদের কারুর মতোই ছিলেন না, তবুও এই চরিত্রগুলির মধ্যে যে কোন একজনের জীবনের অভিজ্ঞতা আর পরিস্থিতির তিনি যদি মুখোমুখি হতেন তা হলে তাঁর জীবনেও পরিস্থিতি ও তাঁর মানসিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংঘাতের ফলে অনুরূপ বিস্ফোরণসদৃশ ঘটনার সৃষ্টি হতে পারত। কারণ, কবির নিজের অনুভূতি ও প্রতিক্রিয়ার সমর্থন ছাড়া ঐ ধরনের নানা আবেগময় পরিস্থিতি নাটকে সৃষ্টি হতে পারত না। নাটকের 'fool' বা বিদূষকের পোষাক যেমন নানা রঙের কাপড়ের টুকরো জুড়ে তৈরি হয়, তেমনি ট্র্যাজেডির নায়কের চরিত্র সৃষ্টি করতে গিয়ে নাট্যকার যদি জীবনপথের ডাইনে আর বাঁয়ে দেখা বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত ঘটনাকে জোড়া-তালি দেওয়ার শৈলী অনুসরণ করেন বলে আমরা ভাবি, তা হলে কবি-প্রতিভা সম্বন্ধে আমাদের ভুল ধারণা হবে। জীবনকে নতুন করে গড়া যায় না; তাকে ভালো করে লক্ষ করে, অনুশীলন করে, নতুন করে সৃষ্টি করতে হয়। সাধারণ মানুষের চেয়ে প্রতিভাধর কবি জীবন সম্বন্ধে পূর্ণতর ধারণার অধিকারী। কবির তৈরি চরিত্রগুলি যে জীবন সম্বন্ধে আমাদের জীবন্ত ধারণা দেয় তার কারণ কবি নিজেকে নানা রূপে, বিচিত্র সব পরিস্থিতির মধ্যে ব্যাপ্ত করতে পারেন, আপন সত্তাকে বিভিন্ন পরিস্থিতির অংশীদার করেন এবং নিজের অন্তরের গভীরতম প্রদেশ থেকে সাধারণ মানুষের অগোচর নানা মণিমাণিক্য তুলে আনেন, এবং এই কাজ করতে তিনি এমন এক শক্তিশালী অন্তর্দৃষ্টি ব্যবহার করেন যার সাহায্যে বাস্তব জগৎ

থেকেও তিনি সম্ভাবনাপূর্ণ ঘটনা ও চরিত্রকে চিনে বের করতে সক্ষম হন এবং প্রকৃতি তাঁর মনে যে-ব্যাপারের শুধু একটা বহির্রেখ বা খসড়া এঁকে দিয়েছে তাকে তিনি একটা নিখুঁত আর সম্পূর্ণ শিল্পকর্মের রূপ দেন।

কিন্তু প্রহসন বা কৌতুকনাট্যের উদ্ভব এর একেবারে বিপরীতধর্মী পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি থেকে। বস্তুর বহিরঙ্গের রূপায়ণের উদ্দেশ্যে প্রহসন স্রষ্টার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা প্রযুক্ত হয়। মানবচরিত্রের কৌতুককর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কোন নাট্যকার যত কৌতূহলীই হোন্ না কেন, আমার ধারণা সেখানে তিনি নিজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অনুরূপ গুণগুলি খুঁজতে সচেষ্ট হবেন না। তা ছাড়া, চেষ্টা করেও আপন চরিত্রের হাস্যকর দিকগুলি বা খুঁতগুলো তিনি ধরতে পারবেন না, কারণ আমাদের প্রত্যেকের চরিত্রের যে বিশেষত্বগুলো আমাদের নিজের চেতনার বা জ্ঞানের বাইরে থেকে যায় একমাত্র সেইগুলিই অপরের চোখে আমাদের হাস্যাস্পদ করে তোলে। তাই কৌতুকনাটকের স্রষ্টার পর্যবেক্ষণ শক্তি অপরের চরিত্রের ত্রুটিনিরূপণে প্রযুক্ত হতে বাধ্য। আবার এই কারণেই এই পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার দ্বারা পাওয়া তথ্য একটা সামান্যতা বা সর্বজনীনতা পায়, কিন্তু নিজের প্রতি প্রযুক্ত হলে যেটা আর থাকে না। মানুষের সমাজজীবনের আপাত ব্যবহারিক জগৎ নিয়ে ব্যস্ত থাকার ফলে, কৌতুকনাট্যকারের পর্যবেক্ষণক্ষমতা মানুষের সত্তার অন্তঃস্থলে ঢুকতে পারে না, কারণ পরস্পরের সান্নিধ্যে আসার ফলে মানুষ মানুষের চরিত্রের যে সাদৃশ্যগুলি দেখতে পায় সেগুলিকে উপাদান হিসেবে ব্যবহার করেই এই সৃষ্টিক্ষমতা প্রহসন সৃষ্টির কাজে লিপ্ত হয়। তার চেয়ে বেশি গভীরে প্রহসন ঢুকতে পারে না। আরও গভীরে যেতে পারলেও সে যেতে চাইবে না, কারণ তাতে তার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে না। মানুষের সত্তার অতি গভীরে প্রবেশ করে তার বাইরের আচরণ ও ব্যবহারবিধির পেছনে নিহিত কারণগুলির অনুসন্ধান করার মানেই হবে তার আচরণের মধ্যে যাবতীয় হাস্যকর ব্যাপারকে বিপদে ফেলা এবং শেষ পর্যন্ত তাদের বিসর্জন দেওয়া। আমাদের হাসির স্রোতকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে আমাদের সত্তার মাঝামাঝি কোথাও তার উৎস খুঁজতে হয়। এর দ্বারা পাওয়া প্রতিক্রিয়ার

মধ্যে একটা সর্বজনীন গড় (moyen) বা সর্বগ্রাহ্য সূত্র পাওয়া যায়। তার ফলে সাধারণ মানুষের কতকগুলো ধর্ম আমাদের সামনে তুলে ধরা হয়। যাবতীয় গড় নির্ণয়ের মতো এখানেও বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ছড়ানো তথ্যের (donnés esparses) সাহায্য নিয়ে, সমগোত্রীয় বিভিন্ন ঘটনাকে তুলনা করে তার থেকে সার সংগ্রহ করতে হয়—এক কথায় যে সমীকরণ (généralisation) এবং আবেশন (abstraction) পদ্ধতির সাহায্যে পদার্থবিজ্ঞানী নানা তথ্যের বিশ্লেষণ করে তাদের বিভিন্ন শ্রেণীতে সাজান তারই অনুরূপ একটা পদ্ধতি কৌতুকনাটকের লেখককেও অনুসরণ করতে হয়। মূলত বিভিন্ন আরোহী (inductif) প্রথাভিত্তিক বিজ্ঞানে ব্যবহৃত পদ্ধতি এবং তাদের উদ্দেশ্যের সঙ্গে হাস্যকৌতুকের বিশেষ মিল লক্ষ করার মতো। এখানেও ঘটনা ও চরিত্রের পর্যবেক্ষণ এবং অনুশীলনের কাজ তাদের বহিরঙ্গেই সীমিত, এবং তার থেকে পাওয়া ফল সবক্ষেত্রেই সাধারণ বা গড়।

স্তরাং অনুসন্ধানের পথে আমরা যে দ্বৈত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলাম, একটু ঘোরা পথে (par un long détour) আমরা সেইখানেই ফিরে এসেছি। একদিকে, অন্যমনস্কতা বা অনবধানতার সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত একটা মানসিক অবস্থায় না থাকলে কোন লোকই হাস্যকর নন—এই অন্যমনস্কতা তাঁর সত্তা বা অবয়বের অংশ না হয়েও কোন পরাশ্রয়ী কীট বা জীবের মতো তাঁর ওপর ভর করে থাকে, এবং এই কারণেই এই মানসিক ত্রুটি বাইরে থেকে লক্ষণীয় এবং শেষ পর্যন্ত সংশোধনীয়ও বটে। অন্য পক্ষে, যেহেতু কৌতুকহাস্যের চরম উদ্দেশ্য মনুষ্যচরিত্র কিংবা সমাজদেহের বিভিন্ন ত্রুটির সংশোধন করা, এই শোধনমূলক শিক্ষা যত বেশিসংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় ততই তার সার্থকতা। এই কারণেই কৌতুকহাস্য 'সামান্য' বা 'গড়'-এর ভিত্তিতে ব্যক্তি বা সমাজের ত্রুটিগুলি পর্যবেক্ষণ করে। মানুষের চরিত্রের এমন কতকগুলি মুদ্রাদোষ কৌতুকহাস্য বেছে নেয় যেগুলির নানাভাবে পুনরাবৃত্তি হতে পারে, এবং সেইজন্যই ঐ দোষগুলি কোন ব্যক্তি বা চরিত্রবিশেষের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত থাকে না, বলা যেতে পারে সেগুলির মধ্যে একরকমের "সাধারণ অসাধারণত্ব" (singularités com-

বাঁচিয়ে রাখার জন্ত যে যত্ন ও চেষ্টা করা হয় তা সবচেয়ে অবাস্তব চরিত্রের, অথচ সেই যত্নকেই সবচেয়ে স্থায়ী কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মানুষ গ্রহণ করে। এই আত্মশ্লাঘা ঠিক কোন অপরাধ বা পাপ নয়, কিন্তু যাবতীয় দোষ আর পাপ এরই পরিমণ্ডলে আকৃষ্ট হয়, আর সেগুলি যত বেশি সূক্ষ্ম আর কৃত্রিম রূপ নেয় ততই কেন্দ্রীয় দোষটিকে অর্থাৎ আত্মশ্লাঘাকে তুষ্ট করার উপায় হয়ে দাঁড়ায়। আত্মশ্লাঘা জিনিসটি আত্মকেন্দ্রিকতার চেয়ে ব্যাপকতর ভাবে আমাদের চরিত্রের মধ্যে নিহিত কারণ তা 'অন্তের-হৃদয়ে-আমি-শ্রদ্ধা-জাগাচ্ছি' এই মনোভাবের ওপর প্রতিষ্ঠিত আত্মবিশ্বাসের একটা সামাজিক ফল। আত্মকেন্দ্রিকতারূপ দোষটি অনেক সময় চরিত্র বা স্বভাবের দ্বারা সংশোধিত হতে পারে, কিন্তু আত্মাভিমান জয় করতে গেলে দরকার হয় আত্মসমীক্ষার। যদি বিনয়রূপ গুণটিকে আমরা কাপুরুষতার নামান্তর বলে না ভাবি, তা হলে দেখা যাবে যে এই গুণটি আয়ত্ত করা মানুষের পক্ষে সহজ নয়। কাপুরুষতা যে আত্মশ্লাঘারই সমগোত্রীয় কোন বৈশিষ্ট্য আমরা সাধারণত তা বুঝি না। কিন্তু যথার্থ বিনয় আত্মাভিমান সম্বন্ধে আত্ম-বিশ্লেষণ ছাড়া অন্ত কিছু নয়। বিনয় গুণটির জন্ম হয় যখন কোন লোকের নিজের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা আমরা লক্ষ করি এবং নিজেও আমরা যখন নিজের সম্বন্ধে অনুরূপ ভ্রান্ত ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনার কথা ভেবে ভয় পাই। নিজেদের সম্বন্ধে আমরা কি ভাবব এবং বলব তা নিয়ে যুক্তিপূর্ণ সতর্কতাই হোল বিনয়। নিজের চরিত্রসংশোধন ও ত্রুটি-বিমোচনের প্রয়াস থেকেই বিনয়ের জন্ম। অল্প কথায় বললে, বিনয় হোল জীবন-দর্শন ও জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া গুণ।

জীবনের ঠিক কোন্ সন্ধিক্ষণে উপহসিত হওয়ার ভয় শেষ হয়ে বিনয়ী হওয়ার যথার্থ দুশ্চিন্তা শুরু হয় তা ঠিক করে বলা কঠিন। কিন্তু এটা নিশ্চিত যে এই ভীতি আর দুশ্চিন্তা প্রথমে এক এবং অভিন্ন জিনিস থাকে। আত্মাভিমান এবং তাকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত বিদ্রূপের চরিত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুশীলন ও বিশ্লেষণ হয়তো কোনদিন কৌতুকহাস্যের পুরো রহস্যটির ওপর কোন নতুন আর অপ্রত্যাশিত আলোক ফেলবে। হয়তো আমরা দেখতে

পাব যে প্রায় গাণিতিক নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে কৌতুকহাস্য তার এক প্রধান দায়িত্ব পালন করছে, মানুষের সহজ আত্মপ্রীতি সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন করছে এবং তার দ্বারা মানুষের মনে সুস্থ সমাজবোধের উদয় হচ্ছে। হয়তো দেখতে পাব, সমাজজীবনের একটা স্বাভাবিক ফল হওয়া সত্ত্বেও আত্মাভিমান বস্তুটি সমাজের নিজের পক্ষেও ক্ষতিকর, ঠিক যেমন মানব-শরীরে নিঃসৃত খুব মৃদুশক্তির বিষও পরিণামে শরীরের পক্ষে মারাত্মক হতে পারে যদি না অন্যান্য শারীরিক নিঃসরণ তার ক্ষতিকারক শক্তিকে অকেজো করে দেয়। কৌতুকহাস্য ক্রমাগত এই ধরনের একটা শোধন কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তাই বলা চলে, আত্মাভিমানের উপযুক্ত ওষুধ হোল কৌতুকহাস্য এবং বিপরীতপক্ষে আত্মাভিমান হোল মানুষী চরিত্রের একমাত্র অবিমিশ্র উপহসনীয় দুর্বলতা।

রূপগত (de formes) এবং গতিভিত্তিক (de mouvements) কৌতুক-হাস্যের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়েছি হাস্যোদ্দীপক একটা সরল দৃশ্য কিভাবে জটিলতর অন্য দৃশ্যনিচয়ের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে তাদের মধ্যে হাস্যরস সঞ্চার করতে পারে। একই ভাবে উচ্চতম মানের কৌতুকহাস্যকেও কখনও কখনও তার নিম্নতম মানের দৃষ্টান্তের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। অপরপক্ষে ঠিক বিপরীত শ্রেণীর একটি পদ্ধতি আরও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চোখে পড়ে; অর্থাৎ অনেক স্থূল শ্রেণীর কৌতুকহাস্যের পেছনে অনেক সূক্ষ্ম আর উঁচু মানের কৌতুকের উপাদান সক্রিয় থাকতে পারে। যেমন, মানুষের সমস্ত কাজকর্মের পেছনে মানুষের নিজের অগোচরেই আত্মাভি-মানের মতো উচ্চশ্রেণীর কৌতুককর উপাদান লুকিয়ে থাকে। শুধু কৌতুক উপভোগের জন্যই আমরা আত্মাভিমানের অস্তিত্ব খুঁজি। বাস্তবিক, আমাদের কল্পনা এই আত্মাভিমানকে এমন সব জায়গায় খুঁজে পায় যেখানে তার অস্তিত্বের কোন অবকাশই নেই। হয়তো কোন কোন ক্ষেত্রে একেবারে মোটা দাগের কৌতুককর পরিস্থিতির পেছনে আত্মাভিমানকেই কারণ হিসেবে দেখা যাবে। এই ধরনের পরিস্থিতিকে মনস্তাত্ত্বিকরা বিপরীতধর্মের এক তুলনার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন; একটা বেশ বড় আর চওড়া দরজা

দিয়ে যাবার সময় বেঁটে চেহারার এক ভদ্রলোক মাথা নামাচ্ছেন; দুজন লোক হাতধরাধরি করে চলেছেন, তাঁদের মধ্যে একজন যেমন লম্বা আর রোগা, অন্যজন তেমনি বেঁটে আর মোটা—এই ধরনের নানা পরিস্থিতি। দ্বিতীয় দৃশ্যটিকে খুঁটিয়ে বিচার করলে আমরা সম্ভবত দেখব যে খর্বাকৃতি লোকটি যেন নিজেকে লম্বা লোকটির সমান উচ্চতায় তুলে ধরবার চেষ্টা করছে—যেমন কথামালার ব্যাঙ নিজেকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে একটা ষাঁড়ের মতো অতিকায় হবার বৃথা চেষ্টা করেছিল।

। তিন।

চরিত্রের অন্ত যেসব বিদ্‌ঘুটে বৈশিষ্ট্য আত্মাভিমানের সঙ্গে মিশে বা তার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে আমাদের দৃষ্টিপথে আসতে চায় তাদের প্রত্যেকটির বিশদ আলোচনা প্রায় অসম্ভব। আমরা দেখিয়েছি যে মানুষের চরিত্রের যাবতীয় দুর্বলতা, এমনকি কখনও কখনও মানুষের অনেক গুণও হাস্যকর হয়ে উঠতে পারে। যে সব অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আমাদের কাছে হাসির ঠেকেছে যদি সেগুলির তালিকা করা হয় কৌতুকহাস্য তাতে আরও বৈশিষ্ট্য যোগ করবে এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলিও আমাদের কাছে কৃত্রিম মনে হবে না, উল্টে আমরা স্বীকার করে নেব যে আজ পর্যন্ত অনেক অলক্ষিত কৌতুককর বৈশিষ্ট্য ও পরিস্থিতি সেগুলির দ্বারা আমাদের গোচরে এসেছে। কল্পনা যেমন জটিল আর জমকালো নক্‌শা ও কারুকার্য শোভিত কোন প্রাচীর-চিত্রে অদৃষ্টপূর্ব নতুন রূপরেখা ও নক্‌শাকে আলাদা করে আবিষ্কার করে, এও অনেকটা সেই রকম। অবশ্য আমরা জানি যে প্রয়োজনীয় শর্ত হোল এই যে লক্ষিত বৈশিষ্ট্যগুলি এমন কোন শ্রেণীর হবে যা বেশ কিছু মানুষের মধ্যে দেখা যায়।

কিন্তু সমাজের মধ্যে আগে থেকেই তৈরি হওয়া কতকগুলো মানবশ্রেণী (des cadres tout faits) আমরা দেখতে পাই, যে শ্রেণীগুলি শ্রম-বিভাজনের (division du travail) ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে সমাজের পক্ষে দরকার। যেমন বিভিন্ন পেশা ও নানা সরকারী বিভাগের

কর্মী। প্রতিটি বৃত্তির লোক তার পেশার এমন কতকগুলো লক্ষণ মন ও চরিত্রের ওপর বয়ে বেড়ায় যার মধ্যে কতকগুলো সাদৃশ্য আমাদের চোখে না পড়ে পারে না। ঐ লক্ষণগুলো অন্য আর এক বৃত্তির মানুষদের থেকে তাদের আলাদা করে। এইভাবে সমগ্র বৃহত্তর সমাজের মধ্যেই পেশা-ভিত্তিক ছোট ছোট সামাজিক গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। নিঃসন্দেহে, ঐ বৃহত্তর সমাজের গঠন আর বিন্যাস থেকেই এই ক্ষুদ্রতর গোষ্ঠীগুলির জন্ম। কিন্তু তবুও ঐ ক্ষুদ্রতর শ্রেণীগুলির পরস্পরের থেকে অতিমাত্রায় বিচ্ছিন্নতা তাদের সামাজিক প্রয়োজনের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। তাই কৌতুকহাস্যের একটা দায়িত্ব হোল বিচ্ছিন্নতার প্রবণতাকে দমন বা সংযত করা। তার দায়িত্ব অনমনীয়তাকে নমনীয় করে তোলা, ব্যষ্টিকে সমষ্টির সঙ্গে যুক্ত করা—এক কথায়, যেখানেই খাঁজ, কোণ আর কর্কশতা আছে তাকে ঘষে, মেজে মসৃণ আর সুডৌল করে তোলা। সুতরাং এখন আমরা এমন এক জাতের কৌতুকহাস্যের দেখা পাব যার বিভিন্নরূপ আর প্রকাশভঙ্গী আগে থেকেই কল্পনা আর অনুমান করা যায়। একে আমরা বৃত্তি বা পেশাজনিত কৌতুকহাস্য বলতে পারি।

বিচিত্র সব পেশা বা বৃত্তির থেকে উদ্ভূত নানা রকমের কৌতুকহাস্যের পুঙ্খাণুপুঙ্খ বিচার বা বর্ণনার কাজে আমরা এগোতে চাই না। শুধু তাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির ওপরেই আমরা জোর দেব। প্রথম সারিতেই আমাদের চোখে পড়ে 'বৃত্তিগত অহঙ্কার' (la vanité professionelle), যেমন মঃ জুর্দ্যাঁর প্রত্যেক শিক্ষক নিজের বিষয়কে অন্য সব বিষয়ের ওপরে বসাতে চান। লাবিশের লেখা একটি নাটকে কোন এক চরিত্র কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না মানুষ কিভাবে কাঠের ব্যবসায়ী ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে। বোঝাই যায় সে নিজে কাঠের ব্যবসায় করে। লক্ষণীয় যে এই সব ক্ষেত্রে আত্মাভিমানের মধ্যে শ্রদ্ধা-সম্ভ্রম পাবার একটা প্রবণতা আছে, আর যে বৃত্তিতে যত বেশি ভণ্ডামি থাকে তার মধ্যে আত্মসম্ভ্রম সৃষ্টি বা দাবী করার চেষ্টাও তত বেশি হয়। অদ্ভুত ব্যাপার হোল, যে শিল্প, বিজ্ঞান বা বৃত্তি যত বেশি সন্দেহজনক সেই বৃত্তির লোক নিজেকে তত

বেশি ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্ত বা ঐশ্বরিক ক্ষমতাসম্পন্ন বলে জাহির করেন, আর দাবী করেন যে অন্ত সকলে তাঁর বৃত্তির অলৌকিক রহস্তের কাছে মাথা নোয়াবেন। ব্যবহারিক জীবনের যাবতীয় পেশা স্পষ্টতঃই সাধারণের প্রয়োজন সিদ্ধির উদ্দেশ্তে প্রযুক্ত, কিন্তু যে বৃত্তিগুলির সামাজিক উপযোগিতা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে সেগুলি নিজ নিজ অস্তিত্বের সাফাই গাইতে গিয়ে দাবী করে যে তাদের জন্তই জনগণের অস্তিত্ব। দৈবরহস্ত দাবী করার পেছনেও এই মানসিকতা কাজ করে। মোলিয়েরের সৃষ্ট প্রায় সমস্ত চিকিৎসকচরিত্রের কৌতুকতার উৎস এইখানে। রোগীদের সঙ্গে তাঁদের ব্যবহার দেখলে মনে হয় ডাক্তারদের জন্ত তাদের সৃষ্টি হয়েছে, এবং প্রকৃতিদেবী নিজেও যেন তাঁদের দাক্ষিণ্যে বেঁচে আছেন।

এই কৌতুককর অনমনীয়তার আর একটা প্রকাশ 'বৃত্তিগত অন্তমনস্কতা বা সংবেদনহীনতা বা নির্মমতা'। হাস্তকর চরিত্রগুলি তাদের পেশাগত ব্যবহার বিধির সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে এমন বন্দী যে তারা অন্ত পাঁচজনের মতো স্বচ্ছন্দভাবে চলাফেরা করতেও অক্ষম, চেষ্টা করেও তাদের সেই স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে ইসাবেল (Isabelle) যখন বিচারপতি পেরাঁ দাঁদ্যাকে (Perrin Dandin) প্রশ্ন করে তিনি কিভাবে নির্লিপ্তভাবে বেচারা আসামীদের দৈহিক নির্যাতন দেখেন, তিনি জবাব দেন, "কেন? ঐ নির্যাতন দেখে দু'এক ঘণ্টা তো ভালোভাবেই কাটানো যায়!"

(Bah! cela fait toujours passer une heure ou deux)

তারতুফ, আর এক ধরনের বৃত্তিগত নির্মমতার পরিচয় দেয় যখন ওরগোঁর মুখ দিয়ে ও বলে, "ভাই, ছেলেমেয়ে, বউ, মা সব মরুক, আমার তাতে কি আসে যায়?" (Et je verrais mourir frère, enfants, femme et mère,/Que je m'en soucierais autant que de cela!)

কিন্তু কোন বৃত্তি বা পেশাকে হাস্তকর করে তোলার জন্ত যে পদ্ধতি সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় তা হোল চরিত্রটিকে তার পেশাগত বাগ্-বিধির চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দী করে রাখা। বিচারক, চিকিৎসক আর

পেশাদারী লৈঙ্গকে দিয়ে জীবনের সাদামাটা আটপৌরে ব্যাপার প্রকাশের জন্যও আইন, চিকিৎসাশাস্ত্র আর রণকৌশলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভাষা ব্যবহার করানো হয়। ফলে মনে হয় সমাজের অধিকাংশ মানুষের মতো স্বাভাবিক ও সহজ ভাষায় কথা বলতে তারা ভুলে গেছে। এই ধরনের ভাষাজনিত কৌতুকহাস্য অপেক্ষাকৃত স্থূল চরিত্রের হয়। কিন্তু ইতিপূর্বে আমরা লক্ষ করেছি যে এই হাস্যকর পরিস্থিতি অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম ও পরিমার্জিত হয়ে ওঠে যদি পেশাগত অভ্যাসের সঙ্গে চরিত্রটির স্বভাবগত কিছু বৈশিষ্ট্যও তার সংলাপ ও আচরণে ফুটে ওঠে। রেইনার (Regnard) রচিত জুয়াড়ি (*Le Joueur*) নাটকে নায়ক যতদূর সম্ভব অভিনবত্বের সঙ্গে জুয়োখেলার ভাষায় তার নিজের চাকরের নাম রাখে হেক্টর, তার বাগ্‌দত্তাকে বলে পাল্লাস (কারণ ইস্‌কাবনের রানীর সুবিদিত নাম হোল পাল্লাস); কিংবা মোলিয়েরের 'বিদুষী মহিলারা' (*Les Femmes Savantes*) নাটকের কৌতুক প্রধানত বেরিয়ে আসে বিজ্ঞানের নানা বিষয়ের অনুবাদে নারীসুলভ মানসিকতার দ্যোতক ভাষার ব্যবহার থেকে; যেমন, 'এপি-কিওরকে আমার খুব পছন্দ' (Epicure me plaît), আমি 'ঘূর্ণিঝড় ভালোবাসি' (J'aime les tourbillons), ইত্যাদি। নাটকের তৃতীয় অঙ্কে দেখা যায় কিভাবে আরমাঁদ্‌ (Armande), ফিলামাঁৎ (Philaminte) আর বেলিজ (Belise) সব সময়ে এই রকম মেয়েলি ঢঙে কথা বলে।

এই পথে একটু এগোলে দেখা যাবে যে 'বৃত্তিগত যুক্তি' (logique professionelle) বলে একটা জিনিস আছে; অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ বৃত্তির পরিমণ্ডলে একটা বিশেষ পদ্ধতিতে তর্ক করা হয়; কিন্তু ঐ পদ্ধতি তার নিজের পরিবেশে আদৃত হলেও, সমাজের অন্য সব ক্ষেত্রে তার কদর নেই। সর্বজনীন, আর বিশেষ কোন বৃত্তিকেন্দ্রিক—এই দুই ধরনের যুক্তিবোধের মধ্যে তুলনা করলে একটা বিশেষ জাতের কৌতুকবোধ উপলব্ধি করা যায় এবং এই কৌতুকবোধকে নিয়ে কিছুটা আলোচনা করলে আমাদের বর্তমান অনুসন্ধানে সাহায্য হতে পারে। এক্ষেত্রে কৌতুকহাস্যের তত্ত্বের একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিকের আলোচনায় আমরা তাহলে

নিজেদের ব্যাপৃত রাখতে পারব। আমার ইচ্ছা এই প্রশ্নটি নিয়ে একটু বিশদ আলোচনা করার, তার কতকগুলো বৈশিষ্ট্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার।

। চার ।

হাস্তকৌতুকের পেছনে সক্রিয় একটা গভীর কারণ খুঁজতে ব্যস্ত থাকার ফলে আমরা তার একটা উল্লেখযোগ্য প্রকাশপদ্ধতির আলোচনায় মন দিতে পারিনি। এখন আমরা কৌতুকজনক কোন চরিত্রের অদ্ভুত যুক্তিবোধের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি, কারণ এই যুক্তিবোধ কখনও কখনও বড় রকমের অযৌক্তিক মূঢ়তার পরিচয় দেয়।

তেয়োফিল গোতিয়ের (Théophile Gautier) বলেছেন, উৎকট কৌতুকহাস্ত জিনিসটাই হোল 'অযুক্তির যুক্তি' (la logique de l'absurde)। হাস্তকৌতুক সম্বন্ধে আরও অনেক দার্শনিক মতবাদ অনুরূপ বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। যাবতীয় কৌতুককর ঘটনায় কোন না কোন ক্ষেত্রে এক ধরনের অন্তর্বিরোধ সক্রিয়। বলা হয় যে যুক্তিহীনতা যখন দৃশ্যমান বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ নেয় তখনই তা আমাদের কৌতুকবোধকে জাগিয়ে তোলে। প্রথমে সাময়িকভাবে গ্রহণ করলেও পরমুহূর্তেই আমরা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে সরাসরি তাকে ত্যাগ করি, অথবা ভাবি যে ব্যাপারটা কোন এক দিক থেকে অযৌক্তিক হলেও অন্য আর একটা দিক থেকে বোধহয় স্বাভাবিক ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। এই-সব চিন্তার মধ্যে নিশ্চয় কিছুটা সত্যের সন্ধান মেলে; কিন্তু এই জাতীয় পরিস্থিতি শুধু কিছু স্থূল কৌতুকহাস্ত সৃষ্টি করার জন্যে ব্যবহার করা যায়, আর যেখানে সেই যুক্তিগুলি প্রযুক্ত হতে পারে সেখানেও তারা হাস্যকর কোন ঘটনা ও চরিত্রের অপরিহার্য কোন বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত দেয় না। অর্থাৎ, যখন কৌতুকপ্রদ কোন ঘটনায় কোন অযুক্তির অস্তিত্ব চোখে পড়ে তখন সেই অযুক্তির শ্রেণীচরিত্র সম্বন্ধে কোন ধারণা তার থেকে পাওয়া যায় না। এই সিদ্ধান্তের অকাট্য দৃষ্টান্ত দেওয়ার এখনই কোন দরকার নেই। নিচের

সংজ্ঞা বা লক্ষণগুলির মধ্যে যে কোন একটিকে বেছে নিয়ে তার দ্বারা কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তা দেখা যেতে পারে। প্রতি তিনটি ক্ষেত্রের মধ্যে দুটিতে দেখা যাবে যে সঞ্চারিত প্রতিক্রিয়ার মধ্যে হাস্যকর কোন ব্যাপারই নেই। তাই দেখা যাচ্ছে যে কৌতুককর কোন পরিস্থিতিতে যখন কোন অযৌক্তিক ব্যাপার থাকে তা আসলে নির্বিকল্প বা সামান্য অযুক্তি নয়। আসলে তা কোন বিশেষ শ্রেণী বা ধরনের অযুক্তি। শুধু তার থেকেই হাস্যকৌতুকের উৎপত্তি হয় না। বরঞ্চ বলা যায়, হাস্যকৌতুকই ঐ অযুক্তির মধ্যে একটা বিশেষ গুণ আরোপ করে। অযুক্তি নিজে এখানে হাস্যরসের কারণ নয়, তা হাস্যরসের প্রতিক্রিয়া মাত্র, নিশ্চয়ই একটা বিশেষ ধরনের প্রতিক্রিয়া, যার মাধ্যমে তার পেছনে ক্রিয়াশীল কারণটির সঠিক চরিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই কারণ আমাদের জানা থাকার ফলে তার থেকে উদ্ভূত প্রতিক্রিয়ার চরিত্র বুঝতে আমাদের কোন অসুবিধা হয় না।

ধরুন, গ্রামের পথে বেড়াতে বেরিয়ে দূরে পাহাড়ের চূড়োর কাছে ঘূর্ণ্যমান হাত সমেত আপনি একটা বড় কিছু দেখতে পেলেন। দেখলেন অতিকায় কোন মানুষের চেহারার সঙ্গে বস্তুটার কিছুটা মিল আছে। এতক্ষণ আপনি জিনিসটা ঠিক কি তা বুঝতে পারেননি। কিন্তু ধারণা আর স্মৃতির জগতে ইতিমধ্যেই আপনি হাতড়াতে শুরু করেছেন যাতে তার মধ্য থেকে এমন কোন চিত্রকল্প উদ্ধার করতে পারেন যেটা ঐ দ্রব্যটির সঙ্গে মিলে যায়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের দ্বারা ঘূর্ণিত একটা চাকার (wind mill / moulin) ছবি আপনার মনে জেগে ওঠে; আপনি বুঝতে পারেন আপনার চোখের সামনে ঘূর্ণ্যমান বস্তুটি একটি বাতচক্র (moulin à vent)। বাড়ি থেকে বেরোবার ঠিক আগে বড় বড় হাতওয়ালা দৈত্যের আজগুবি রূপকথা পড়ে থাকলেও কিছু আসে যায় না। কারণ আমরা জানি যে আমাদের সাধারণ জ্ঞান মূলতঃ আমাদের স্মৃতিশক্তিকে শক্ত করার জন্যেই দরকার, তবুও তার অন্য একটা বড় কাজ হোল আমাদের মন থেকে অনেক ভুল ধারণা মুছে দেওয়া। আমাদের মন যে অনুক্ষণ নতুন নতুন অবস্থার

সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে এবং চলমান বস্তুর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধারণারও পরিবর্তন ঘটাচ্ছে তার কারণ সমস্ত কিছুর পেছনে আছে আমাদের সাধারণ জ্ঞান (le bon sens)। বাস্তবিক, সাধারণ জ্ঞান হোল বস্তুর পরিবর্তনের সঙ্গে নির্খুঁতভাবে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকেও সম্বন্ধ করে তোলার ক্ষমতারই অপর নাম। তা হলো জীবনের দিকে আমাদের মনকে সংযুক্ত করার অবিরাম চেষ্টাপ্রবাহ।

এখন দেখা যাক ডন কিহোটে যুদ্ধযাত্রা করছেন। ভদ্রলোক রূপকথায় পড়েছেন কিভাবে বীর অশ্বারোহী যোদ্ধারা তাঁদের যাত্রাপথে বিরাটকায় সব দৈত্যদানব আর শত্রুর মোকাবিলা করেন। অতএব তাঁকেও একটা দৈত্যের মুখোমুখি হতে হয়। দৈত্যের চেহারা সম্বন্ধে একটা কাল্পনিক ধারণা তাঁর মনে একটা অত্যন্ত মূল্যবান্ স্মৃতি হিসেবে স্থায়ী আসন করে নিয়েছে, আর অপেক্ষা করে আছে কখন ডন কিহোটের যুদ্ধযাত্রার সময় সুযোগমত কোন একটা জিনিসকে অবলম্বন করে মূর্ত হয়ে উঠবে। রূপকথায় পড়া দানবের স্মৃতি মূর্ত হয়ে উঠতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আর সেই জন্তই সামান্ত হলেও দানবের সঙ্গে কিছুটা সাদৃশ্যবিশিষ্ট কোন জিনিস যখন কিহোটের চোখে পড়ে তাকেই তিনি দানব বলে ধরে নেন। তাই আমরা সাধারণ মানুষ যেখানে শুধু একটা বাতচক্র (moulin de vent) দেখি, ডন কিহোটের চোখে তা একটা দানবের মূর্তি ধরে। ব্যাপারটা যেমন হাস্যকর, তেমনি অযৌক্তিক। কিন্তু এটা কি শুধুই অযৌক্তিকতার দৃষ্টান্ত? এই অযৌক্তিকতার কি কোন বিশেষ শ্রেণী নেই?

ব্যাপারটা সাধারণ জ্ঞানের বিপর্যয়ের একটা উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। ধারণাকে বস্তুর সঙ্গে খাপ না খাইয়ে বস্তুকে ধারণা অনুযায়ী কল্পনা করাই এই বিপর্যয়ের ধর্ম। আমরা যা ভাবি চোখের সামনে তাই দেখি, অথচ দরকার হোল যা দেখি তারই সঙ্গে আমাদের ভাবনা আর কল্পনাকে সম্বন্ধ করা। সাধারণ জ্ঞান (le sens commun) আমাদের বলে যে যাবতীয় স্মৃতিকে তাদের নিজ নিজ জায়গায় সাজিয়ে রাখতে হয়; পরিস্থিতি অনুসারে যথাযথ স্মৃতি তার স্থান থেকে বেরিয়ে আমাদের উপলব্ধি আর

বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে সামঞ্জস্য এনে দেয়। কিন্তু ডন কিহোটের বেলায় একটা বিশেষ ধরনের স্মৃতি তার অন্য যাবতীয় স্মৃতির ওপর শুধু প্রাধান্যই পায় নি, তার ব্যক্তিসত্তাকেও আচ্ছন্ন করেছে। এখানে বাস্তব সত্যকে কল্পনার কাছে নতি স্বীকার করতে হচ্ছে, কিহোটের যুক্তিবোধের একমাত্র দায়িত্ব হচ্ছে অলীক কল্পনাকে অনুসরণ করে তার একটা বাস্তবরূপ খুঁজে বের করা। যখন অবাস্তব কল্পনা একটা আপাত সত্য রূপ নেয়, ডন কিহোটে তার নানা পরিণতিকে এক ধরনের উৎকট যুক্তির সাহায্যে পল্লবিত করে তোলে। সে একজন স্বপ্নচারীর (d'un somnabule) নিশ্চয়তা আর নিষ্ঠা নিয়ে কল্পনাকে সত্য ভেবে তদনুযায়ী কাজ করতে থাকে। তাহলে এই হোল ভ্রান্তির উৎস যেখানে একটা বিশেষ ধরনের যুক্তিবোধ একটা অযৌক্তিক আর অলীক পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রিত করে আর তাকে কেন্দ্র করে আবর্তন করতে থাকে। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, এই জাতীয় যুক্তি কি শুধু ডন কিহোটের জীবনেই দেখা যায়?

আমরা দেখিয়েছি যে কৌতুককর কোন চরিত্র হয় তার একগুঁয়েমি নয়তো অন্যমনস্কতার প্রবণতায়—এককথায়, তার স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিকতায়, ফলে যাবতীয় প্রমাদ ঘটায়। সমস্ত কৌতুকহাস্যের আড়ালে একধরনের অনমনীয়তা থাকে যা চরিত্রকে একটি মাত্র পথে চালিত করে। কান বন্ধ রেখে অন্য কোন সদুপদেশ শুনতে না দিয়ে একটি পথ ধরে চলতে বাধ্য করে। মোলিয়েরের লেখা নাটকগুলিতে বহু হাসির দৃশ্যকে এই সরল সূত্রে বেঁধে ফেলা যায়। কোন চরিত্র গোঁ ধরে তার আপন ধারণামত এগিয়ে চলেছে আর বারবার বাধা পাওয়া সত্ত্বেও সেই একটি ধারণা অনুযায়ী কাজ করে চলেছে। যে চরিত্র অন্য কারোর কথা শোনে না সে নিজের অজ্ঞাতেই এমন একটি ব্যক্তিত্বে রূপান্তরিত হয় যে কিছুই দেখে না এবং নিজে যা দেখতে চায় তা ছাড়া আর কিছুই যার চোখে পড়ে না। তার একদেশদর্শী মানসিকতা শেষ পর্যন্ত সমস্ত কিছুকে নিজের ধারণা বা বিশ্বাস অনুযায়ী দেখে; ধারণাকে বস্তুর সঙ্গে সঙ্গত না করে, বস্তুকে ধারণার সঙ্গে মিলিয়ে ফেলে। তাই সমস্ত হাস্যকর চরিত্র ভ্রান্তির রাজপথে

সকরমান ; ডন কিহোটের চরিত্রও অযৌক্তিকতার সাধারণ কতকগুলি বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমাদের অবহিত করে।

সাধারণ জ্ঞানের এই বিপর্যয়ের কি বিশেষ কোন নাম বা সংজ্ঞা আছে? কোন কোন মানসিক বিকৃতির ক্ষেত্রে জটিল (aigue) অথবা দীর্ঘস্থায়ী (chronique) রূপে এই বিপর্যয় অবশ্যই চোখে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে এই বিপর্যয় দৃঢ়মূল কোন ধারণার (une idée fixée) রূপ নেয়। কিন্তু মানসিক বিকার বা দৃঢ়মূল ধারণা—এই দুটির কোনটাই আলাদা করে আমাদের কাছে হাস্তকর মনে হয় না। বরঞ্চ রোগ হিসেবে তারা চরিত্রগুলির প্রতি আমাদের করুণা জাগায়। আমরা আগেই দেখেছি যে কৌতুকহাস্তের সঙ্গে আবেগ বা অনুভূতির কোন সম্পর্ক নেই। যদি কোন মত্ততা আমাদের কাছে হাসির মনে হয় তাহলে তা সুস্থ মানসিক অবস্থার সঙ্গেই থাকবে—তাকে একধরনের সুস্থ মনের পাগলামি বলে ভাবা যাবে।

কিন্তু সুস্থ মনেরও এক এক অবস্থা আছে যা সবদিক থেকেই বিকৃত মানসিকতার অনুরূপ। বিকৃত মস্তিষ্ক মানুষের মধ্যে ঠিক যে ধরনের চিন্তা ও ধারণার অনুষঙ্গ দেখা যায়, এসব ক্ষেত্রেও ঠিক তাই চোখে পড়ে। যে ধরনের যুক্তিবোধ কোন দৃঢ়মূল ধারণাবিশিষ্ট চরিত্রে দেখা যায় এখানেও ঠিক তাই লক্ষ করা যায়। এ-হোল কোন স্বপ্নাবিষ্ট চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। তাই, হয় আমাদের পুরো বিশ্লেষণটাই ভুল, নয়তো এই সূত্রটির মধ্যে তাকে ধরা যাবে: "হাস্তকর ব্যাপারের অযৌক্তিকতা ও স্বপ্নের জগতের যুক্তিহীনতা মূলতঃ একই শ্রেণীর।"

স্বপ্নের জগতে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির আচরণ ঠিক ওপরে বর্ণিত জিনিস-গুলির মতই। আমাদের আত্মতুষ্টিতে মগ্ন মন বাইরের জগতে নিজের কল্পনাকে মূর্ত দেখার অভিলাষ চেয়ে বেশি কিছু চায় না। নানা শব্দমিশ্রিত অস্ফুট ধ্বনি অবশ্য তখনও শোনা যায়, দৃশ্যজগতের নানা রঙ্-এর ছটা তখনও চক্ষুপটে প্রতিফলিত হয়—অর্থাৎ তখনও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নানা অনুভূতি একেবারে রুদ্ধ বা স্তব্ধ হয়ে যায় না। কিন্তু স্বপ্নাবিষ্ট মানুষ বিভিন্ন ইন্দ্রিয়

দিয়ে পাওয়া নানা অনুভূতি আর অভিজ্ঞতার মূল্যায়নের জন্ত তার যাবতীয় স্মৃতির সাহায্য না নিয়ে, অনুভূতিগুলিকে শুধু তার মনের মত বিশেষ কিছু স্মৃতির রোমন্থনে ব্যবহার করেন বা তাদের সাহায্য নেন। তাই যে সময়ে যে বিশেষ ধারণা বা স্বপ্ন তাঁর মনকে দখল করে থাকে তদনুসারে তিনি সেই সময়কার ইন্দ্রিয়গত অনুভূতির ব্যাখ্যা করে থাকেন—চিমনির মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝোড়ো হাওয়ার শব্দ তাঁর কাছে হয় কোন বন্য পশুর ক্ষুধার্ত চীৎকার, নয়তো কোন মোহময় সুরলহরী বলে মনে হয়। স্বপ্নের যে মনোমুগ্ধকর ছবি আমাদের 'চোখে' ভাসে তার পেছনেও অনুরূপ কারণ থাকে।

কিন্তু কৌতুকহাস্যের পেছনে সক্রিয় ভ্রান্তি যদি স্বপ্নসদৃশ মোহ হয়, যদি যে যুক্তি কৌতুকহাস্যকে সৃষ্টি করে তা কল্পনাজগতের যুক্তি হয় তা হলে আমরা কৌতুকহাস্যের পেছনে সক্রিয় যুক্তির মধ্যে স্বপ্নের জগতে ক্রিয়াশীল যুক্তির যাবতীয় বৈশিষ্ট্য দেখতে পাব। এখানে আমরা আবার একটা নিয়মের দৃষ্টান্ত দেখব যার সঙ্গে আমরা সকলেই বিশেষভাবে অন্তরঙ্গ। এক জাতের হাস্যোদ্দীপক পরিস্থিতির সঙ্গে অন্য আর এক শ্রেণীর হাস্যকর ঘটনার চরিত্রগত পার্থক্য সত্ত্বেও তাদের বাহ্য সাদৃশ্য একই ধরনের কৌতুক-হাস্যের উদ্রেক করতে পারে। একথা বোঝা কঠিন নয় যে যাবতীয় দৃঢ়মূল ধারণা ও বিশ্বাসের খেলাই আমাদের কৌতুকবোধ জাগাতে পারে যদি মোটামুটি তারা আমাদের মনে স্বপ্নজগতের খেলার পরিষ্কার ধারণা এনে দেয়।

প্রথমে আমি যুক্তিশাস্ত্রের নিয়মগুলির সাধারণ ব্যতিক্রমের উল্লেখ করতে চাই। যে ধরনের যুক্তিপদ্ধতি আমরা ভুল বলে জানি সেগুলিই আমাদের মনে কৌতুক জাগায়, অথচ স্বপ্নের জগতে ঐগুলিকেই আমরা অভ্রান্ত বলে মেনে নিই। অসতর্ক মনকে প্রতারিত করার পক্ষে যথেষ্ট একটা আপাতযৌক্তিক বহিরঙ্গ তারা বজায় রাখে। যদি ধরাও যায় যে তাদের মধ্যে একধরনের যুক্তি আছে, তবু দেখা যাবে তার মধ্যে সত্যের টানা-পোড়েন বা বন্ধ নেই; তার ফলে বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রয়োগ করার পরিশ্রম থেকে

সেখানে একরকম মোহাই পাওয়া যায়। অনেক 'রসোত্তীর্ণ' উক্তির (mots d'esprit) মধ্যে এই ধরনের আপাত যুক্তি থাকে : আমরা উক্তিটির শুরু আর শেষ অংশ মনে রাখি, মাঝের অংশের দিকে মন দিই না। চিন্তা ও ধারণার এই মজার খেলা ক্রমশঃ শব্দের খেলায় বিবর্তিত হয় আর বিভিন্ন চিন্তার মধ্যে সম্বন্ধ যত বাহ্য বা আপাত হয়ে আসে এই কথার খেলা ততই মজাদার হয়ে ওঠে। ক্রমশঃ আমরা এমন একটা মঞ্জিলে পৌঁছই যেখানে উচ্চারিত পদ বা শব্দের মানে নিয়ে চিন্তা না করে আমরা শুধু তাদের ধ্বনিকেই প্রাধান্য বা বেশি গুরুত্ব দিই। কয়েকটি নাটকের বিশেষ কিছু দৃশ্যের সঙ্গে স্বপ্নের জগতের তুলনা বেশ শিক্ষামূলক হতে পারে। ধরা যাক্ কোন এক চরিত্র বেশ গুছিয়ে কিন্তু স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মত কতকগুলো কথা আউড়ে যায়—যে কথাগুলি অন্য আর একটা চরিত্র ফিস্‌ফিস্ করে তার কানে বলে। ধরুন আপনার চারপাশে নানা রকমের কথা হচ্ছে ; এই অবস্থায় আপনি যদি আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়েন, দেখবেন কথাগুলো ক্রমশঃ আপনার কানে কতকগুলি নিরর্থক শব্দে পরিণত হচ্ছে—ক্রমশ বিকৃত হতে হতে শব্দগুলো পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে আর আপনার মনে অদ্ভুত অদ্ভুত অর্থের সৃষ্টি করছে। আর যে লোকগুলি কথা বলছে আপনি তাদের সঙ্গে রাসিন (Racine) এর লেখা *Les Plaideur* (আইনজীবীরা) নাটকে Petit Jean et du souffleur এর মধ্যে অভিনীত দৃশ্যটির নিজের মনে আবার অভিনয় করছেন।

এ ছাড়াও এমন কতকগুলো হাস্যকর মোহাচ্ছন্নতা (des obsessions comiques) আছে যেগুলোর সঙ্গে স্বপ্নে দেখা মোহাচ্ছন্নতার বেশ গভীর মিল থাকে। একের পর এক অনেকগুলো স্বপ্নে একই দৃশ্য দেখার অভিজ্ঞতা কার নেই ? প্রতিটি স্বপ্নেই দৃশ্যটির আপাতযুক্তিপূর্ণ একটা তাৎপর্য থাকে, যদিও স্বপ্নগুলোর মধ্যে অন্য কোন সামঞ্জস্য বা সাদৃশ্য দেখা যায় না। নাটকে বা উপন্যাসে কোন কোন ঘটনার পুনরাবৃত্তিও এই রকম চেহারা নেয়। তাদের কোন কোন দৃশ্য আমাদের স্বপ্নের কথা মনে করিয়ে দেয়। অনেক সময় একাধিক গানের বিষয়বস্তুর মধ্যেও এই জিনিস ঘটে। প্রত্যেকটি

পংক্তির শেষে একটি পদ ঘুরে ফিরে আসে, প্রতিবারেই অবশ্য কোন নতুন অর্থ নিয়ে।

স্বপ্নের জগতে একটা বিশেষ ধরনের 'আরোহ' (crescendo) দেখাটাও খুব বিরল অভিজ্ঞতা নয়। আমরা যতই এগোই তার অদ্ভুত প্রভাব ততই বাড়তে থাকে। আমাদের যুক্তিবোধের কাছে প্রথম শৈথিল্য আদায় করে নেবার ফলে যুক্তির দ্বিতীয় স্তরে শিথিলতা অনুভূত হয়; এই দ্বিতীয় যুক্তির স্তরটি আবার আদায় করে নেয় আরও গুরুতর চরিত্রের যুক্তিগত দুর্বলতা এবং যতক্ষণ না চরমতম অযৌক্তিকতার অবতারণা ঘটে এই প্রক্রিয়া ক্রমশঃ বেড়ে চলে। যুক্তিহীনতার জগতের এই অগ্রগতি স্বপ্নাবিষ্ট মানুষটিকে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা দেয়। আমার ধারণা এই উপলব্ধির সঙ্গে মদ্যপের মনের অবস্থার একটা মিল আছে: মাতাল যেমন নেশার ঘোরে বুঝতে পারে যে সে এমন একটা মানসিক অবস্থায় পৌঁছয় যেখানে যুক্তি, ধর্মবোধ বা অন্য কোন বিশ্বাসেরই কোন তাৎপর্য নেই তার কাছে, স্বপ্নাবিষ্ট মানুষের মনের অবস্থাও খানিকটা সেই রকম হয়। কতকগুলো নাটকে মোলিয়েরও এই ধরনের মানসিক অবস্থা দর্শকদের দেন কিনা তা দেখা যেতে পারে। মঃ দ্য পুরসোন্যাক নাটকটি খুব সংযত আর যুক্তিনিষ্ঠ ভাবে শুরু হলেও পরের দিকে সেখানে যত রকমের উদ্ভট পরিস্থিতি একটার পর একটা ঘটতে থাকে। বুর্জোয়া জাঁতিলোম (Bourgeois Gentilhomme) নাটকটির কথাও ভাবুন—নাটকটির প্লট যত বেশি উন্মোচিত হতে থাকে ততই মনে হয় বিভিন্ন চরিত্র যেন জেনে শুনে পাগলামির তুফানের মধ্যে নিজেদের সঁপে দিয়েছে। "এর চেয়ে আরও পুরোপুরি মাথাখারাপ কোন লোককে যদি পাওয়া যায় আমি তা হলে রোম শহরে গিয়ে বইটি প্রকাশ করব" মঃ জুরদাঁর (M. Jourdain) এই কথাগুলো যেমন আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে নাটকটিতে যবনিকা পড়ল; তেমনি মঃ জুঁরদ্যার সঙ্গে আমরাও এতক্ষণ যে নিছক কল্পনার জগতে ঘুরছিলাম সেখান থেকেও আমাদের বাস্তব জগতে ফিরিয়ে আনে।

কিন্তু সর্বোপরি এক বিশেষ ধরনের পাগলামি আছে যেটা শুধু স্বপ্নের

মধ্যেই দেখা যায়। কতকগুলি বিশেষ ধরনের স্ববিরোধিতা স্বপ্নবিলাসী মানুষের কাছে এতই স্বাভাবিক, আর যুক্তিবাদী আর বাস্তবতা সম্বন্ধে সচেতন মানুষের কাছে এতই হাস্তকর যে সেগুলি সম্বন্ধে যাঁদের কোন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নেই তাঁদের সম্পূর্ণ ধারণা দেওয়া যায় না বললেই চলে। স্বপ্ন অনেক সময় দুটি সম্পূর্ণ আলাদা লোককে মিশিয়ে ফেলে এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যেখানে ব্যক্তি দুটি একক চরিত্রে রূপান্তরিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখেন। এই অদ্ভুত ব্যাপারটার দিকে আমরা পাঠকদের নজর দিতে বলছি। সাধারণতঃ দেখা যায় এই দুই ব্যক্তির মধ্যে যিনি স্বপ্ন দেখছেন তিনি নিজেই একজন। তিনি বুঝতে পারেন যে তাঁর নিজের সত্তা না হারিয়েও, তিনি আর একটা নতুন সত্তা পেয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি নিজে, আবার তা ননও। তিনি আপনাকে কথা বলতে শোনেন, নানা কাজ করতে দেখেন, কিন্তু কেমন যেন তাঁর মনে হয় অন্য কেউ তাঁর দেহকে আশ্রয় করেছে, তাঁর গলায় কথা বলছে। কিংবা তাঁর বোধ হয় যে যদিও তিনি তাঁর স্বাভাবিক সত্তাতেই কথা বলছেন কিংবা কাজ করছেন, তবুও তাঁর কথাবার্তার ধরন থেকে তাঁর বোধ হয় যেন তিনি একজন নতুন লোক, যাঁর সঙ্গে তাঁর স্বাভাবিক আর পরিচিত সত্তার কোন মিল নেই। তিনি যেন নিজের প্রকৃত সত্তার বাইরে চলে গেছেন। ঠিক এই ধরনের অদ্ভুত উপলব্ধির বিপর্যয় কি অনেক কৌতুকনাটকে দেখা যায় না? আমি এখানে আমপিত্রিয়ঁ। (*Amphitryon*) নাটকের কথা বলতে চাই না কারণ এখানে নিঃসন্দেহে দর্শকমানসে বিভ্রান্তি সৃষ্টির সচেতন প্রয়াস আছে। কিন্তু যেখানে বেশির ভাগ কৌতুকজনক পরিস্থিতির উৎপত্তি হয় দুটো আলাদা ঘটনা ও চরিত্রের মধ্যে পারস্পরিক ব্যতিচার বা সংঘাত থেকে আমি সেই ধরনের বিশৃঙ্খল আর হাস্যোদ্দীপক তথাকথিত যুক্তিতর্কের অবিমিশ্র দৃষ্টান্তের দিকে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি। উদাহরণ হিসেবে কোন সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে মার্ক টোয়েন যা বলেছিলেন তা উল্লেখ করা যেতে পারে।

সাংবাদিক: আপনার তো এক ভাই আছে, তাই না?

টৌয়েন : হাঁ, হাঁ, আপনার কথায় মনে পড়ে গেল, আমার এক ভাই ছিল বটে। ওর নাম ছিল উইলিয়াম—ওকে আমরা বিল বলে ডাকতাম। বেচারা বিল!

প্রশ্ন : বেচারা কেন? তা হলে সে কি আর বেঁচে নেই?

উত্তর : বোধ হয় তাই। আমরা ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। সমস্ত ব্যাপারটাই যেন কেমন গোলমেলে।

প্রশ্ন : খুবই দুঃখের কথা। বলা চলে শোচনীয়। ও কি তা হলে অদৃশ্য হয়ে গেল?

উত্তর : এক রকম তাই তো বলা হয়েছিল। আমরা তো ওকে কবর দিলাম।

প্রশ্ন : কি বললেন? ওকে কবর দিলেন? ও মরল কিনা ঠিক জানতে পারলেন না, অথচ কবর দিলেন? বলেন কি?

উত্তর : না, ঠিক তা নয়। মরে ও ঠিকই গিয়েছিল।

প্রশ্ন : নাঃ, আমাকে স্বীকার করতে হচ্ছে যে আমি ব্যাপারটার বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারছি না। আপনি যদি ওকে কবর দিয়ে থাকেন, আর আপনি যদি জানেন যে ও সত্যিই মারা গেছে—

উত্তর : আরে, না, না; আমাদের শুধু মনে হয়েছিল যে ও বুঝি মারা গেছে।

প্রশ্ন ; ও, বুঝেছি। ও আবার বেঁচে উঠেছিল।

উত্তর : আমি হলফ করে বলতে পারি যে ও বেঁচে ওঠেনি।

প্রশ্ন : সে কি? এমন ব্যাপার তো আমি জীবনে শুনিনি। কোন একজন তা হলে নিশ্চিত মারা গিয়েছিল। একজনকে তো গোর দেওয়াও হয়েছিল বললেন। তা হলে আর রহস্যটা কোথায়?

উত্তর : সেই কথাই তো বলছি। মজাটাই তো ঐখানে। ব্যাপারটা কি জানেন? আমরা দু'জনে, অর্থাৎ যে মারা গিয়েছে আর আমি নিজে ছিলাম যমজ ভাই। যখন আমাদের মাত্র দু'সপ্তাহ বয়স স্নানের গামলায় আমরা গুলিয়ে গিয়েছিলাম আর দু'জনের মধ্যে একজন ডুবে গিয়েছিলাম। কিন্তু দু'টির মধ্যে ঠিক কোন যমজটি ডুবে গেল সেটা

আমরা কেউই বুঝে উঠতে পারিনি। কেউ কেউ মনে করেন বিলই ডুবে গেছে। আবার কিছু লোকের বিশ্বাস আসলে আমিই ডুবে মরেছি।

প্রশ্ন : ও বাবা, এ তো সত্যিই তাজ্জব ব্যাপার! আপনার নিজের কি মনে হয়?

উত্তর : ভগবান্-ই জানেন। ঠিক কি ঘটেছিল তা জানবার জন্যে আমি তো সারা পৃথিবীটাই দিয়ে দিতে পারি। এই বিষাদময় ঘটনা তো আমার জীবনটাকেই অন্ধকার করে দিয়েছে। কিন্তু আপনাকে একটা গোপন কথা বলব, যে কথা আর কাউকে আমি ঘুণাক্ষরেও জানাই নি। আমাদের মধ্যে একজনের শরীরে একটা বিশেষ চিহ্ন ছিল: হ্যাঁ, বাঁ হাতের বাইরের দিকে একটা বড় সাইজের তিল: আর তিলটা ছিল আমার; আর যে শিশুটা ডুবে মারা যায় তারই হাতে ছিল ঐ তিলটা…

এখন, ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায় যে এই সংলাপাংশের হাস্যকর অযৌক্তিকতা সাধারণ শ্রেণীর নয়। যদি বক্তা নিজে ঐ যমজ ভাই দুটির একজন না হতেন তা হলে কথাগুলির মধ্যে কিছুই হাস্যকর বা যুক্তিহীন হোত না। সমস্ত কৌতুকের উদ্ভব হয়েছে মার্ক টোয়েনের এই বক্তব্য থেকে যে তিনি নিজে যমজ দুটির একজন। অথচ সারাক্ষণ তিনি বাইরের তৃতীয় কোন জন হিসেবে গল্প বললেন। অনেক স্বপ্নের মধ্যেও আমরা অবিকল এই পদ্ধতিকে সক্রিয় দেখি।

।পাঁচ।

এই শেষোক্ত দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখলে মনে হয় কিছুক্ষণ আগে আমরা কৌতুকহাস্যের যে প্রকাশভঙ্গীর উল্লেখ করেছি তার থেকে কিছুটা আলাদা রূপ নিয়ে কৌতুকহাস্যের স্ফুরণ হয়। এতক্ষণ পর্যন্ত কৌতুকহাস্যের পেছনে আমরা লক্ষ্য করেছি মানুষের দোষ বা ত্রুটি সংশোধনের প্রয়াস বা বাসনা। যদি বিভিন্ন শ্রেণীর কৌতুকহাস্যের বেশ কিছু উদাহরণ পরীক্ষা করে তাদের

মধ্যে প্রধান প্রধান শ্রেণীগুলোর মাঝে কিছুটা ব্যবধান রেখে সেগুলিকে পরপর সাজানো যায়. দেখা যাবে যে ঐ শ্রেণীগুলির অন্তর্বর্তী কৌতুকহাস্যের অনুল্লিখিত শ্রেণীগুলির হাস্যরসের বৈশিষ্ট্য আসে উল্লিখিত প্রধান শ্রেণীগুলির সঙ্গে সাদৃশ্য থেকেই। আবার এও দেখা যাবে যে ঐ প্রধান শ্রেণীগুলি সমাজের প্রতি অশ্রদ্ধা ও সমাজ সম্বন্ধে বেপরোয়া মনোভাবের সূচনা করে। সমাজও অবশ্য হেসে ঐ ঔদ্ধত্যের জবাব দেয় এবং সেই হাসিও আরও চড়া সুরের ঔদ্ধত্যকেই প্রকাশ করে। তাই স্পষ্টই বোঝা যায় যে কৌতুকহাস্যের মধ্যে সহৃদয়তার কোন স্থান নেই। বরঞ্চ মন্দের জবাবে আরও মন্দ দেওয়াই কৌতুকহাস্যের স্বাভাবিক প্রবণতা।

কিন্তু মজার ব্যাপার হোল, কৌতুকহাস্য সম্বন্ধে চিন্তা করতে গিয়ে এই ব্যাপারটি প্রথমে আমাদের মনে আসে না। হাস্যকর চরিত্রগুলি এমনই সব মানুষ যাদের সঙ্গে প্রথম পরিচয়েই আমরা অন্তত বাহ্যত তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়ি। আমি বলতে চাইছি যে অন্তত খুব কম সময়ের জন্য হলেও আমরা তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাই। তাদের হাব-ভাব, কথাবার্তা আর কাজকর্ম আমাদের খুব নিজের বলে বোধ হয়। তাদের মধ্যে কিছু জিনিস আমাদের কাছে যদি হাসির বলে মনে হয়, তাহলেও আমরা মনে মনে চরিত্রগুলোকে আমাদের সঙ্গে মজায় অংশ নিতে আমন্ত্রণ জানাই। আসলে প্রথম প্রথম ঐ হাস্যকর চরিত্রগুলিকেও আমরা আমাদের খেলার সাথী বলে ধরে নিই। সুতরাং, অন্তত শুরুতে যে দর্শক হাসেন তাঁর মধ্যে আপাতরূপে একটা বন্ধুসুলভ সহৃদয়তা, একটা দিলদরিয়া মেজাজ আমাদের মুগ্ধ করে, আর এই সত্যটা স্বীকার না করলে অন্যায় হবে। এটা লক্ষণীয় যে হাসি জিনিসটা আমাদের দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগ থেকে অব্যাহতি দেয়। আমাদের দরকার এই মনোভাবের আড়ালে সক্রিয় কারণটি খুঁজে বের করায়। আমাদের দেখানো শেষ কয়েকটি দৃষ্টান্তে এই সত্য এমনভাবে উপলব্ধি করা যায় যা অন্য কোথাও সম্ভবপর হয় না। আর ঐ দৃষ্টান্তগুলোর মধ্যেই আমাদের অভিষ্ট ব্যাখ্যাটিও পাওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

কোন হাস্যকর চরিত্র যখন নিজের থেকেই যন্ত্রচালিত পুতুলের মত তার

ধারণার পেছনে ছুটতে থাকে, সে তখন তার স্বপ্ন অনুযায়ী ভাবনা-চিন্তা করে, কথা বলে আর কাণ্ডকারখানা বাঁধায়। অর্থাৎ স্বপ্ন জিনিসটাই হোল মানসিক অশান্তি ও উদ্বেগ থেকে এক ধরনের মুক্তি বা অব্যাহতি। জাগতিক নানা ঘটনা ও সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখা, যা প্রকৃত ও বাস্তব শুধু তাই লক্ষ্য করা, এবং শুধু যা যুক্তিপূর্ণ আর সঙ্গত তাই নিয়ে ব্যাপৃত থাকার জন্য দরকার আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির অবিরাম চেষ্টা। এই অতন্দ্র প্রয়াসকেই আমরা বলি সাধারণ জ্ঞান (le sens commun)। যুক্তিবাদী ও বিচক্ষণ হওয়া মানে মনের দিক থেকে অনুক্ষণ সজাগ ও সক্রিয় থাকা। কিন্তু বাস্তব জগৎ থেকে পালিয়ে গিয়েও স্বপ্ন দেখতে থাকা, যুক্তির জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও নানা রকম অলীক ধারণার মালা গাঁথা মানে এক ধরনের খেলার সামিল হওয়া। কিংবা বলা চলে এক ধরনের কুঁড়েমির আশ্রয় নেওয়া। তাই কৌতুকপ্রদ অযৌক্তিকতা প্রথম থেকেই আমাদের নানা রকমের উদ্ভট চিন্তা নিয়ে খেলার অনুভূতি দেয়। প্রথমে আমাদেরও ঐ খেলায় যোগ দেবার ইচ্ছে হয়। আর ঐ খেলার যে প্রাথমিক প্রবণতা তা আমাদেরও চিন্তা করার জন্য যে মানসিক প্রয়াস অপরিহার্য, তার থেকে অব্যাহতি দেয়।

অন্য অনেক হাসির ব্যাপার সম্বন্ধেও এই কথাই বলা চলে। আমরা বলেছি যে হাস্যকর যে-কোন ব্যাপারের ভেতরে সবচেয়ে সহজ ও বাধাশূন্য পথ বেছে নেবার একটা প্রবণতা আছে, আর আমাদের স্বভাবের মধ্যেই এই প্রবণতা ওতপ্রোত। সমাজের একজন হয়েও কৌতুককর কোন চরিত্র অবিরাম সমাজের বিধিনিষেধ আর নিয়মকানুন অনুযায়ী সংশোধিত হবার জন্য তৈরি থাকে না। সমাজ ও জীবনকে যতটা মন দেওয়া দরকার, ততটা দিতে সে যত্ন নেয় না। স্বীকার করতে হয় যে এসব ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তির অসাবধানতা ও অনবধানতার চেয়ে ইচ্ছাশক্তির অবসন্নতাই প্রবলতর। তবুও আমরা একে অন্যমনস্কতাই বলব এবং এই অন্যমনস্কতা থেকে আসে আলস্য। এ-ধরনের চরিত্র সামাজিক রীতিনীতিকে অবহেলা করে, যুক্তির সঙ্গে নিজের সম্বন্ধকে ছিন্ন করে। এরকমের পরিস্থিতিতে দর্শক হিসাবেও

আমাদেরও মননের দায়িত্ব বা প্রয়াস ছেড়ে সমস্ত ব্যাপারকে লঘু করে দেখার প্রবণতা জাগে। খুব কম সময়ের জন্ম হলেও আমরা ঐ খেলায় যোগ দিই। আর তখনই জীবনসংগ্রামের পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি থেকে আমরা সাময়িক বিশ্রাম পাই।

কিন্তু ঐ বিশ্রাম সামান্ত কয়েক মুহূর্তের বেশি আমরা উপভোগ করতে পারি না। কৌতুককর চরিত্র বা ঘটনার সঙ্গে আমরা যে একাত্মতা বোধ করি তা ক্ষণস্থায়ী। তাও সম্ভবপর হয় আমাদের মনঃসংযোগের শৈথিল্য থেকে। যেমন, কড়া মেজাজের কোন বাবা কিছুক্ষণের জন্মে তাঁর স্বাভাবিক কঠোরতা ভুলে তাঁর দুষ্টু ছেলের উচ্ছলতায় অংশ নেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজেকে সংযত করে নিয়ে তিনি ছেলেকে শাসন করতে এগোন।

সর্বোপরি হাস্যকৌতুক একধরনের সংশোধনী প্রক্রিয়া। বিপথগামীকে অপদস্থ করার উদ্দেশ্তে পরিকল্পিত হওয়ার ফলে কৌতুকহাস্য যাকে উদ্দেশ্ত করে নিক্ষিপ্ত হয় তার মনে যন্ত্রণা দেবার ক্ষমতা ও উপায় কৌতুকহাস্যের অবশ্তই থাকা দরকার। কেউ যখন সমাজের বিধি-নিষেধ বা রীতিনীতিকে উপেক্ষা করে, সমাজ হাস্যকৌতুকের সাহায্যে তার ওপর প্রতিশোধ নেয়। হাস্যকৌতুকের মধ্যে সহৃদয়তা বা সহানুভূতির স্পর্শ থাকলে সে তার এই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হোত।

আমরা কি বলতে পারি না যে আপাতভাবে নিষ্ঠুর হলেও কৌতুকহাস্য পরিণামে সদুদ্দেশ্ত নিয়ে পরিকল্পিত, কারণ আমরা শাস্তি দিই শিষ্টকে স্নেহ করি বলে; মানুষের আচরণ ও ব্যবহারের কিছু কিছু অসঙ্গতি এবং ত্রুটিকে নিয়ন্ত্রিত ও সংযত করে হাস্যকৌতুক মানুষকে এই সব ত্রুটি থেকে মুক্ত হতে এবং তার ফলে আত্মিক উন্নতি সাধন করতে সাহায্য করে।

এই বিষয়টি নিয়ে আরও দু'চার কথা বলা যেতে পারে। মোট কথা, সাধারণত কৌতুকহাস্য একটা প্রয়োজনীয় সামাজিক দায়িত্ব পালন করে। বাস্তবিক, আমাদের পুরো বিশ্লেষণটাই এই সত্যটির সঙ্কেত দেয়। কিন্তু তার থেকে এ-কথা প্রমাণিত হয় না যে কৌতুকহাস্য সবক্ষেত্রেই তার

অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছয় বা ক্ষেত্র নির্বিশেষে সজ্জনতা বা স্থায়বিচারের বাসনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়।

সব ক্ষেত্রেই কৌতুকহাস্যকে তার লক্ষ্য ভেদ করতে হয়, তাকে গভীর মননের সাহায্য নিয়ে কাজ শুরু করতে হয়। কিন্তু কৌতুকহাস্য জিনিসটাই আমাদের ভেতরে প্রকৃতির দ্বারা স্থাপিত একটা কার্যসাধনের বন্দোবস্ত বিশেষ (mécanisme); কিংবা একটু অন্যভাবে বললে, সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির দীর্ঘ অন্তরঙ্গতার ফল বিশেষ। এই যন্ত্রটি স্বয়ংক্রিয়, প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করার সহজ উপায়। নিক্ষিপ্ত শর কোন্ লক্ষ্য বিদ্ধ করবে প্রত্যেক ক্ষেত্রে তা বিবেচনা করার অবসর তার নেই। রোগ যেমন শরীরের কোন বিশেষ উপাদানের আধিক্যকে ধ্বংস করে, কৌতুকহাস্যও তেমনি বিশেষ কোন দোষকে বিকৃত ও তিরস্কৃত করে, এবং তার ফলে কিছু কিছু নির্দোষ চরিত্রও তার আঘাতের শিকার হয়, অন্যপক্ষে যেমন কিছু কিছু দোষীও অনাহত থেকে গিয়ে শাস্তি থেকে রেহাই পায়। হাস্যকৌতুকের লক্ষ্য একটা সাধারণ ও সর্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা করা। তাই, প্রত্যেক ব্যক্তির দোষকে আলাদাভাবে বিচার করে তার শাস্তিবিধানের সামর্থ্য তার নেই। যা কিছুই সুচিন্তিত ভাবনার দ্বারা উদ্ভাবিত না হয়ে স্বাভাবিক আর স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে তাতেই এই ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। পুরো ফল বিচার করলে গড়পড়তা এক ধরনের স্থায়বিচার পাওয়া গেলেও, আলাদা করে যদি খুঁটিনাটি বিচার করা হয় তাহলে কৌতুকহাস্য সব সময়েই স্থায়বিচারে সফল হয় এ দাবী করা ঠিক হবে না।

এই অর্থে কৌতুকহাস্য পুরোপুরি সুবিচার করতে পারে না। আমি আবার বলছি, কৌতুকহাস্যের পক্ষে দয়ায় নরম হয়ে যাওয়াও চলবে না। তার কাজই হোল মানুষকে অপদস্থ করে শঙ্কিত করে তোলা। মহত্তর মানুষদের মধ্যেও প্রকৃতিদেবী যদি একটু ঈর্ষার বীজ বা বিদ্বেষের স্ফুলিঙ্গ না রাখতেন কৌতুকহাস্যের পক্ষে তার উদ্দেশ্য সাধন করা অসম্ভব হোত। এই বিষয়টি নিয়ে বেশি গভীর আলোচনায় না যাওয়াই সমীচীন হবে। করলে মানুষ হিসেবে আমাদের স্বভাব সম্বন্ধে খুব গৌরবজনক বা আত্ম-

প্রসাদকর কিছু পাওয়া যাবে না। আমরা দেখব যে মানসিক তৎপরতা থেকে সাময়িক ক্লান্তি, কিংবা কৌতুকজনক কোন চরিত্রের প্রতি সহৃদয়তা আসলে কৌতুকহাস্যের জন্য প্রস্তুতি ছাড়া অন্য কিছুই নয়; দেখব যে কৌতুকহাস্য জিনিষটাই কিছুক্ষণের জন্য নিজেকে গুটিয়ে ফেলে, তারপর নিজের শক্তি আর প্রভাব বিস্তারের জন্য আরও বেশি তৎপর আর দর্পিত রূপ নিয়ে ফিরে আসে এবং নিজেকে পুতুলনাচের নিয়ন্তা বিবেচনা করে হাতের সুতো দিয়ে মানুষকে পুতুলের মত নাচাবার জন্যে উঠে পড়ে লাগে। এই স্বেচ্ছারোপিত কর্তৃত্বের পেছনে স্বতঃস্ফূর্ততার চেয়ে বিদ্বেষই বেশি মাত্রায় সক্রিয় থাকে বলে মনে হয়, যার মূলে আবার এক ধরনের নৈরাশ্য বা অনাস্থার প্রভাব অনুভব করা যায়। ক্রমশ এই নৈরাশ্য তীব্র হয়ে ওঠে, বিশেষ করে যখন কৌতুকহাস্য স্রষ্টার শিল্পকে খুঁটিয়ে বোঝার আর বিশ্লেষণ করার জন্য দর্শকদের মনন প্রক্রিয়াও বেশিমাত্রায় প্রয়াসী হয়।

যেমন অন্য সব জায়গায় তেমনি এখানেও প্রকৃতিদেবী মন্দকে কল্যাণ-কর কাজের জন্য ব্যবহার করেন। আমাদের এই অনুসন্ধানের আদ্যন্ত বিশেষ করে কল্যাণকর পরিণতির দিকেই আমাদের মন আর চোখ নিবিষ্ট আছে। আমরা দেখেছি যে সমাজ যত উন্নত হয় সমাজের মানুষ তত বেশি সাবলীলতার সঙ্গে সামাজিক অবস্থার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেন; সমাজের ভিতকে যত বেশি মজবুত করার চেষ্টা চলে, সমাজের ক্রমবর্ধমান আয়তন থেকে অবিচ্ছেদ্য অথচ শান্তিবিঘ্নকারী অংশকে ততই সমাজের ওপর তলায় ওঠবার উপযুক্ত করে তুলতে হয়। এই তাৎপর্যপূর্ণ উত্থানপতনের রূপটাকে প্রকট করে তুলে কৌতুকহাস্য একটা গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দায়িত্ব পালন করে।

ঠিক এইভাবে সমুদ্রের বুকে ঢেউয়ের সঙ্গে ঢেউয়ের দ্বন্দ্ব চলা সত্ত্বেও তার গভীরে শান্তি অব্যাহত থাকে। তরঙ্গ আর তরঙ্গের সংঘাতে সমুদ্রবক্ষ যতই অশান্ত হয়ে ওঠে, ততই একটা সাধারণ তল খুঁজে পাবার জন্য তারা অনন্ত প্রয়াস চালিয়ে যায়। তাদের সতত পরিবর্তনশীল সীমারেখাকে অনু-

সরণ করে তুষারের মত সাদা আর পালকের মত হাল্‌কা সজীব ফেনার রেখা। কখনও পেছনে অপসৃয়মান তরঙ্গমালা বালুকাতটে ফেনা ও অবশেষ রেখা রেখে যায়। কাছেই খেলায় বিভোর কোন শিশু সেই ফেনার এক মুঠো তুলে নেয়, কিন্তু পরমুহূর্তেই সে অবাক হয়ে দেখে যে কয়েক ফোঁটা জল ছাড়া তার মুঠোতে আর কিছু নেই—আর এই জল বড় বড় ঢেউয়ের জলের চেয়ে অনেক বেশি নোনতা আর বিস্বাদ। হাস্যকৌতুকের ঢেউও আমাদের দিকে ধেয়ে আসে। সমাজের ওপরতলায় ছোটখাট একটা বিপ্লব শুরু করে দেয় কৌতুকহাস্য। এই অশান্ত 'বিপ্লবের' রূপ অনুযায়ী সেই কৌতুকহাস্যের চরিত্র নিরূপিত হয়। এও একধরনের ফেনা যার পেছনে থাকে লবণাক্ত উপাদান। এও সূর্যকিরণে ফেনার মত জল জল করে ওঠে। হাস্যকৌতুক উজ্জ্বল আনন্দেরই বিকল্প এক রূপ। কিন্তু দার্শনিক যখন এই আনন্দের এক মুঠো তুলে নিয়ে আস্বাদ করতে যান, তিনি বুঝতে পারেন যে তার ভেতরে সারবস্তু খুবই সামান্য আর তার স্বাদ তেতো।

আরিস্তত্‌ল্ : খ্রীস্টপূর্ব ৩২২-৩৮৪

গ্রীক দার্শনিক ও সাহিত্যবিশেষজ্ঞ ও অধ্যাপক। তাঁর বহুপঠিত ও আলোচিত *Poetics* মূলত প্রাচীন গ্রীক ট্র্যাজিক নাটকের আলোচনা, সেখানে কৌতুকনাট্য বা কমেডি সম্বন্ধে কোনো দীর্ঘ আলোচনা নেই। তবে সেখানে এই দুই জাতীয় নাটকের আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'This difference it is that distinguishes tragedy and comedy also ; the one would make its personages worse ; and the other better, than the men of the present day.' (Bywater's translation of *Poetics*, chapter I)

Edward G. Ballard *Dictionary of History of Ideas* Vol. I, page 467-এ বলেছেন : An ancient tradition ascribes to Aristotle an essay on comedy paralleling the *Poetics.* The *Tractatus Coisilinanus* (ca 100 B. C.) may have been drawn upon such an essay, for it formulates a definition of comedy closely analogous to the famous definition of tragedy in *Poetics VI*, only it remarks that comedy effects the catharsis of "pleasure and laughter."

লা ব্রুইয়ের : Jean de La Bruyère (১৬৪৫-১৬৯৬) মানবিতা-বাদী ফরাসি সাহিত্যিক, সমাজতাত্ত্বিক এবং ব্যঙ্গাত্মক রচনাশিল্পী। ১৬৮৮ সালে তাঁর একমাত্র রচনা *The characters from Theophrāstus, translated from Greek, together with the Characters and Manners of this Age* প্রকাশিত হয়। বইটিতে বিভিন্নশ্রেণীর মানুষের বৈশিষ্ট্য এবং সমাজ ও নৈতিকতা সম্বন্ধে লেখকের মন্তব্য পাঠকের চিন্তা ও কৌতুকবোধের উদ্রেক করে।

৩. ডন কিহোটে : *Don Quixote* স্পেনদেশীয় ঔপন্তাসিক Miguel de Cervantes Saavedra (১৫৪৭-১৬১৬) রচিত বিখ্যাত কাহিনী। বইটির সম্পূর্ণ নাম *El Ingenioso Don Quijote dela Mancha.* বইটির প্রথম অংশ ১৬০৫ এবং দ্বিতীয় অংশ ১৬১৫ সালে রচিত হয়। মধ্যযুগের খ্রীস্টান বীরদের বীরত্বের নানা অতিরঞ্জিত কাহিনীর বিদ্রূপ হিসেবে রচনাটি শুরু হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বইটির ব্যঙ্গাত্মক উদ্দেশ্য গৌণ হয়ে যায়। বইটির প্রথম খণ্ড শেষ হবার আগেই নায়ক ডন কিহোটের নানা উদ্ভট্ কার্যকলাপ সত্ত্বেও আমরা তাকে শ্রদ্ধা করতে শুরু করি। তার আদর্শের অবাস্তবতা সত্ত্বেও তার চারিত্রিক মহত্ব ঐহিক কামনাক্লিষ্ট মানুষের ক্ষুদ্রত্বকে আমাদের কাছে স্পষ্ট করে তোলে।

৪. সগ্‌নারেল : Sganarelle—ফরাসি কৌতুকনাট্যকার মোলিয়েরের (Molière) রচিত একাধিক নাটকে এই নামের চরিত্র পাওয়া যায়। যেমন *Le Festin de Pierre*-এ *Don Juan*-এর ভয়কাতর চাকরের চরিত্র ; *Le Médecin Malgré Lui* নাটকে নায়কের চরিত্র, ইত্যাদি।

৫. জর্জ দাঁদ্যা *(Georges Dandin)* ১৬৬৮ সালে Molière-রচিত কৌতুকনাটক ও তার প্রধান চরিত্র।

৬. আরপাগোঁ Harpagon মোলিয়েরের *L'Avare* বা 'কৃপণ' নাটকের মূল চরিত্র। তার কার্পণ্যের প্রতিশোধ নেবার জন্ত নাটকের অন্ত চরিত্রগুলি তাকে বিভিন্নভাবে প্রতারিত করে। এই নাটকটি বিখ্যাত রোমক নাট্যকার প্লটাসের (Plautus) *Aulularia (Pot of Gold)*-এর ছায়া অবলম্বনে রচিত বলে অনেকে মনে করেন।

৭. পাসকাল : Blaise Pascal (১৬২৩-১৬৬২) বিখ্যাত ফরাসি গণিতবিদ্ ও ধর্মতত্ত্ববিদ্। Jansenism নামে ধর্ম আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর নাম জড়িত। রোমান ক্যাথলিক প্রতিষ্ঠানের সংশোধনের উদ্দেশ্তে এই আন্দোলন আরম্ভ হয়। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত রচনা

Thoughts of Monsieur Pascal on Religion and Several other Subjects found Among his Papers after His Death. এই রচনাটি ফরাসিতে *Les Pensées de Pascal* বা পাসকালের চিন্তাবলী নামে বিখ্যাত। আসলে এই গ্রন্থে লেখক মুক্তমনা বুদ্ধিজীবীদের উদ্দেশে খ্রীস্টধর্মের সমর্থনে আবেদন রেখেছেন। বিজ্ঞান ও দর্শনের ভিত্তিতে ধর্মবিরোধী বিভিন্ন যুক্তির খণ্ডন করে তিনি দেখাতে চেয়েছেন মানুষের যুক্তিধারা দুর্বল; যাবতীয় দার্শনিক মতবাদও মূল্যহীন। তাঁর বিশ্বাস যিশুর আত্মবলির দ্বারা পাপপঙ্ক থেকে মানুষের উদ্ধারের মধ্য দিয়েই মনুষ্যজীবনের সার্থকতা প্রমাণিত হতে পারে।

৮. *Pensées* : ওপরে দেখুন।

৯. ফোঁত্যান্‌ব্লো : Foutainbleau। ফ্রান্সের পারী নগরীর ৩৫ মাইল দূরে দক্ষিণপূর্ব উপকণ্ঠে সেইন (Seine) নদীর তীরে সুরম্য কানন এবং সেখানে ৪২,৫০০ একর জমির মধ্যে নির্মিত ফরাসি রাষ্ট্রপতির গ্রীষ্মাবাস।

১০. Hecker, Isaac Thomas (১৮১৯-১৮৮৮) উনিশ শতকে রোমান ক্যাথলিক গির্জের আধুনিকীকরণের যে আন্দোলন Modernism বলে পরিচিত তার একজন সদস্য।

১১. Kraeplin, Emile (১৮৫৬-১৯২৬) জার্মান মনস্তত্ত্ববিদ্। ১৮৯১ থেকে ১৯২২ পর্যন্ত হাইডেলবার্গ ও মুনিখ্ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন।

১২. Lipps, Theodor (১৮৫১-১৯১৪) Experimental Psychology বা পরীক্ষামূলক মনস্তাত্ত্বিকদের অগ্রণী। তাঁর বিখ্যাত বই *Aesthetik* (২ খণ্ড, ১৯০৩-১৯০৬ সালে লাইপৎসিগ্ ও হামবুর্গ থেকে প্রকাশিত)।

১৩. জেরোম কে জেরোম : Jerome Klapka Jerome (১৮৫৯-১৯২৭) ইংরেজ ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ও হাস্যরসিক। তাঁর দুটি বিখ্যাত ও

বহুপঠিত বই *Idle Thoughts of an Idle Fellow* ও *Three Men in a Boat*. ১৮৯২ সালে তিনি আর তাঁর কয়েকজন রসিক বন্ধু *The Idler* নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।

১৪. গোদিনে : Godinet

১৫. মঃ দ্য পুরশোনাক—মোলিয়েরের রচিত কৌতুকনাটক।

১৬. লাবিশ : Ernest Labiche (১৮১৫-৮৮) ফরাসি কৌতুকনাটক রচয়িতা। উল্লেখযোগ্য রচনা : *Le Voyage de M. Perrichon* (১৮৬০) এবং *Un Chapeau de paille d'Italie.*

১৭. ব্যারণ গুরগো : Baron Gurgaud : অষ্টাদশ শতকের ফরাসি অভিজাতবংশীয় লেখক যাঁর 'অপ্রকাশিত পত্রাবলী' অনেক স্মরণীয় উক্তির জন্য প্রসিদ্ধ।

১৮. সাঙ্কো পাঞ্জা : (Sancho Panza) স্প্যানিশ ঔপন্যাসিক থেরভান-তেজ-এর ডন কিহোটে উপন্যাসে নায়ক কিহোটের সঙ্গী। তার কথাবার্তা খুবই বুদ্ধিদীপ্ত আর উপভোগ্য।

১৯. ব্যারণ মুন্‌খাউজেন : Baron Munchausen (১৭২০-১৭৯৭) বিখ্যাত জার্মান যোদ্ধা, শিকারী আর নানা উদ্ভট আর অতিরঞ্জন-দুষ্ট কাহিনীর লেখক হিসেবে খ্যাত।

২০. জাঁ ফ্রাঁসোয়া রনিয়া (Jean François Regnard-১৬৫৫-১৭০৯) এর রচিত কৌতুকনাটকগুলির মধ্যে *Le Joueur* (১৬৯৬) তদানীন্তন ফ্রান্সে জুয়োখেলার জনপ্রিয়তার পটভূমিতে রচিত। তাঁর আর একটি উপভোগ্য নাটক *Les Folies Amoureuses.*

২১. আবু—Edmond François Valentine About (১৮২৮-১৮৮৫) ফরাসি সাংবাদিক, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার। তাঁর বিখ্যাত নাটক *L'Homme à l'oreille Cassée.*

২২. আলসেস্ত্ : Alceste মোলিয়েরের-রচিত *Le Misanthrope* নাটকের মূল চরিত্র। মানুষের ভণ্ডামি আর প্রবঞ্চনার অভিজ্ঞতা তাকে মানববিদ্বেষী করে তুলেছে।

২৩. প্লেদর : *Les Plaideurs* (মামলাবাজ) সপ্তদশ শতকের ফরাসি ট্র্যাজেডি-রচয়িতা রাসিন (Racine)-এর একমাত্র কৌতুক নাটক।

২৪. রাসিন : Jean Racine (১৬৩৯-৯৯) ফরাসি নাটকের আলোচনায় করনেই (Corneille) এবং রাসিনের (Racine) নাম একই সঙ্গে উচ্চারিত হয়। তাঁর একমাত্র কৌতুকনাটক *Les Plaideurs.*

২৫. হার্বার্ট স্পেন্সার : Herbert Spencer—ইংরাজ দার্শনিক ও সমাজতত্ত্ববিদ্ (১৮২০-১৯০৩)

২৬. কান্ট্—Immanuel Kant (১৭২৫-১৮০৪) বিশ্লেষণধর্মী (Critical) দর্শনের প্রবক্তা। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত রচনা *Critique of Pure Reason.*

২৭. *Depit Amoureux*—১৬৫৬ সালে মোলিয়েরের রচিত কৌতুক নাটক। নাটকটির নামের অর্থ 'প্রেমিকদের ঝগড়া'।

২৮. *Amphitryon*—মোলিয়েরের রচিত কৌতুক নাটক। রোমান নাট্যকার Plautus-এর ঐ একই শিরোনামার নাটকের ছায়া অবলম্বনে রচিত।

২৯. Benedix, Roderich (১৮১১-৭৩) জার্মান নাট্যকার ও পরিচালক। বহু কৌতুক নাটকের লেখক। এখন প্রায় বিস্মৃত।

৩০. বনিভার—Francois de Bonnivard জেনেভার কাছে সেন্ট ভিক্টর মঠের অধ্যক্ষ হন এবং ঐ অঞ্চলের দেশপ্রেমিকদের সহযোগিতায় জেনেভা শহরকে ডিউক অব স্যাভয়ের অত্যাচারী শাসন থেকে মুক্ত করার জন্য উদ্যোগী হন। এই অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তিনি দুবার কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। দ্বিতীয়বার তাঁকে Chillon'র দুর্গে বন্দী রাখা হয়। কবি বায়রন এই ঘটনার স্মৃতিতে তাঁর *Castle of Chillon* নামক সনেটটি রচনা করেন।

৩১. আলফোঁস্ দোদে—Alphonse Daudet (১৮৪০-১৮৯৭)। ফরাসি ঔপন্যাসিক। তাঁর বিখ্যাত রচনা *Lettres de mon Moulin* ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত হয়।

৩২. মাদাম দ্য সেভিনিয়ে—Madame de Sevigné (১৬২৬-১৬৯৬) কন্যা মাদাম ফ্রাঁসোয়াজ দ্য গ্রিনিয়াঁ-কে লেখা তাঁর চিঠিগুলি থেকে আমরা চতুর্দশ লুই-এর রাজসভার সভাসদ্‌দের জীবন ও চরিত্রের জীবন্ত আলেখ্য পাই।

৩৩. Proudhomme বা Proudhon, Pierre Joseph (১৮০৯-১৮৬৫) ফরাসি সমাজতত্ত্ববিদ্। *Le Respresentant du Peuple* (জন প্রতিনিধি) পত্রিকার মাধ্যমে তিনি তাঁর সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ প্রচার শুরু করেন। পরে পত্রিকাটি যথাক্রমে *Le Peuple* এবং *La Voix du peuple* (জনরব) এই শিরোনামায় প্রকাশিত হয়। ১৮৪৯ সালে তদানীন্তন রাষ্ট্রনেতাকে সরাসরি নিন্দা করার জন্য তিনি কারাবন্দী হন।

৩৪. বুফ্‌লে—Boufflers, Stanislas Jean (১৭৩৮-১৮১৫) ফরাসি রাজনীতিবিদ্ ও সাহিত্যিক।

৩৫. Orange blossom—ইউরোপে নববিবাহিতদের কমলা ফুল দিয়ে অভিনন্দিত করার রীতি আছে।

৩৬. জাঁ পল রিখ্‌টার—Jean Paul Richter (১৭৬৩-১৮২৫) জার্মান ঔপন্যাসিক, বিদ্রূপাত্মক রচনার জন্য প্রসিদ্ধ।

৩৭. আলেকজাণ্ডার বেইন—Alexander Bain (১৮১৮-১৯০৩) স্কটল্যাণ্ডের মনস্তত্ত্ববিদ্। Associationist এবং Physiological Psychology-এর প্রবক্তা হিসেবে পরিচিত। এবারডিন বিশ্ববিদ্যালয়ে Logic এবং Rhetoric বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। তাঁর রচনার মধ্যে *The Senses and the Intellect* (১৮৫৫) এবং *Emotions and the Will* (১৮৫৯) সম্যক্ পরিচিত।

৩৮. তারতুফ্—Tertuffe. মোলিয়েরের ১৬৬৪ সালে রচিত ঐ নামের নাটকের প্রধান চরিত্র। নাটকটি বকধার্মিকদের ভণ্ডামি উদ্‌ঘাটনের উদ্দেশ্যে লেখা।

৩৯. মঃ জুর্দাঁ—M. Jourdain, মোলিয়েরের *Le Bourgeois*

Gentilhomme নাটকের প্রধান চরিত্র। এক ধনী ব্যবসায়ী নিজেকে অভিজাত শ্রেণীর বলে চালাতে সচেষ্ট—এই হোল নাটকটির বিষয়।

৪০. ভাদিউস্।

৪১. Le Misanthrope—২২নং টীকায় 'আলসেস্ত্' দেখুন।

৪২. Le Distrait.